রামপ্রসাদ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিমিটেড্

কলিকাতা

প্রকাশক :

শ্রীতরুণ কুমার বাক্‌চি

পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

১৯, গুলু ওস্তাগর লেন,

কলিকাতা—৭০০০০৬

২৪, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা—৭০০০০১

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক :

শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি

পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

১৯, গুলু ওস্তাগর লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

চকদীঘির বদান্যবর জমিদার গুণিগণাগ্রগণ্য
শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় ললিতমোহন সিংহ
রায়বাহাদুর মহোদয় সমীপে।

মহাত্মন্!

অধুনা ভাব-সঙ্গীত রচনায় আপনার যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে, ইহাতে আপনি একজন সুপ্রসিদ্ধ সাধক বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় আজ সঙ্গীত-রস-রসিক, কলির প্রাতঃস্মরণীয় তান্ত্রিক সাধক "রামপ্রসাদকে" আপনার পবিত্র করকমলে অর্পণ করিলাম। দরিদ্রের এই যৎসামান্য উপহারে পরিতৃপ্তি লাভ করিলে কৃতকৃতার্থ হইব। নিবেদন ইতি—

হাওড়া,
১০৮ পঞ্চাননতলা রোড,
২৫শে ভাদ্র, ১৩২৪ সাল।

বিনীত—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

ভূমিকা।

আমাদের এই কাননকুন্তলা, সমুদ্রমেখলা, শস্যশ্যামলা ভারত-জননী সকল দেশের মুকুট-মণি। ইহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বিশ্ববিশ্রুত। জগতে এমন দেশ আর কোথাও নাই, যাহা কোন অংশে ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে। ইহার গগন-পবন, বন-উপবন, প্রান্তর-প্রাঙ্গণ, ইহার ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার ব্যবহার, ইহার শিক্ষা দীক্ষা সকলের আদর্শ; জগতের কুত্রাপি কোন দেশে ঠিক এমনটী আর দৃষ্টিগোচর হয় না—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। এখন না হউক, এমন একদিন ছিল, যখন ষড়ঋতু এখানে সমান ভাবে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া লোকের স্বাস্থ্য বিধান করিত। পর্জ্জন্যদেব যথা সময়ে বারি বর্ষণ করিয়া ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতেন, ফলে-শস্যে ভারত-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া লোকের অভাব মোচন করিত। দেশে অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি স্থান পাইত না। সুখ-সৌভাগ্যের পূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত থাকিয়া একদিন ইহাকে স্বর্গের সুষমায় সুশোভিত করিয়াছিল। ত্রিদিববাসী অমরগণও অমরার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পার্থিব-স্বর্গ ভারতের সুখাস্বাদনে লালায়িত হইতেন। ভারতের যশগৌরব তখন সর্ব্বতোমুখী হইয়া মর্ত্ত্যে আপন প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, ভারতের বিজয়-কেতন অনুকূল পবনে প্রোড্ডীয়মান হইয়া জগতের নিকট আপন প্রভাব বিঘোষিত করিত।

কেন ভারতের যশোমান—সৌভাগ্যসম্মান—সভ্যতাভিমান হিমালয় হইতে কুমারিকা, এমন কি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জীবজগতের শিক্ষা ও দীক্ষার নিদান ভূমি হইয়াছিল? কেন ভারত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়া গর্ব্বোন্নত মস্তকে, গগন-শোভিততারকা মধ্যে স্নিগ্ধোজ্জ্বলদীপ্তি চন্দ্রমার ন্যায় সুশোভিত হইয়া আপন মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছিল? ভারত এত বড় হইয়াছিল কিসে? ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্বের মূল তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে সকলেরই একবাক্যে বলিতে হইবে—ধর্ম্মে ও কর্ম্মে একাধিপত্য লাভ করিয়াই তাহার এত সৌভাগ্যোদয়—তাই সে জগতের সকল দেশ অপেক্ষা পূজনীয় ও বরণীয় হইয়া আপন কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতে পারিয়াছিল। আর সেই ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিনায়ক, তাহার একনিষ্ঠ কর্ত্তা, সাধকশ্রেষ্ঠগণকে অঙ্কে ধারণ করিয়াই ভারত জগতীতলে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য। পূজনীয় সাধক ও ধার্ম্মিকের জন্ম কেবল এই পুণ্যভূমি ভারত মাতারই গর্ভে হইয়াছিল, ইঁহারই পবিত্র ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া

তাঁহারা ভুবন উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন—পুত্রের খ্যাতি প্রতিপত্তিতেই মায়ের এত মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধক পুত্রগণের জন্যই ভুবন-বিদিতা, জগৎ-পূজ্যা, আদর্শ দেশ বলিয়া পরিগণিত। এই রত্নগর্ভ ভারতে যত সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত-সাধক, ধর্ম্মী ও কর্ম্মী জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তত আর কোথাও, জগতের কোন দেশে জন্মিয়াছে কি? বোধ হয়—ইহার শতাংশের একাংশ লইয়াও জগতের কোন দেশ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের দাবী করিতে পারে না। এই জন্যই জন্মভূমি মা আমার সকল দেশের শ্রেষ্ঠ, ঐ সকল মহাত্মাগণের পদস্পর্শে এদেশের রেণু স্বর্ণরেণু অপেক্ষাও মূল্যবান—পবিত্রাদপি-পবিত্র এবং তজ্জন্যই ইহার সুখসম্ভোগের ইচ্ছা অমরগণ স্বর্গের সুখ ছাড়িয়াও বাঞ্ছা করিতেন।

এ দেশ পবিত্র দেশ—সাধকের দেশ। যত পুণ্যাত্মা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্ম-জন্মান্তরের বহু পুণ্যবলে ভগবদ্ভক্ত সাধকরূপে কেবল এই সুপবিত্র দেশে জন্মলাভ করিয়া, আপনি ধন্য হইয়াছেন এবং দেশকেও ধন্য করিয়াছেন। এদেশের সাধকের সংখ্যা করিতে গেলে একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয় এবং তাহারও অভাব নাই, সুপ্রসিদ্ধ "ভক্তমালা" গ্রন্থই তাহার নিদর্শন; কিন্তু তাহা বহুপূর্ব্বে রচিত হওয়ায় তৎপরবর্ত্তী সাধকগণের নাম—তাহার শ্রেণীভুক্ত হয় নাই। এই দুরন্ত কলিকালে ধর্ম্মকর্ম্মের লোপ হইতে বসিয়াছে, এ যুগে মাত্র একপদ পরিমিত ধর্ম্ম—কেবল সত্যরূপে মাথা তুলিয়া আছেন—কিন্তু তাহাও কেহ মানে না। এসময়েও, এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিনেও ভারতের নিভৃত পল্লীভূমি পবিত্র করিয়া কত ধার্ম্মিক, কত সাধক যে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা কে করে?

আজ আমরা অপরাপর সকলের কথা ছাড়িয়া দিয়া কলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক-সাধক, ক্ষেমঙ্করীর খাস-তালুকের প্রজা স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জনের পবিত্র জীবন-চরিত্র সাধ্যানুসারে সাধারণে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইতেছি। যাঁর গান প্রতিদিন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গীত হইয়া প্রাণে অপার আনন্দ প্রদান করে, যাঁহার অমিয়-মধুর সঙ্গীতের একটী না একটী বাঙ্গালীর স্ত্রী-পুরুষ, এমন কি নিরক্ষর প্রাণেও সুধা বর্ষণ করে; বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালী নাই, যিনি সাধক কবি রামপ্রসাদের সঙ্গীতের একটী মাত্র কলিও অনবগত আছেন। যিনি নিজস্ব সুর লয়ে সঙ্গীত রচনা করিয়া অসীম শক্তির পরিচয় প্রদান করত জগতের আদ্যাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছেন; যাঁহার মধুময় সঙ্গীত যাত্রায়, পাঁচালিতে, চণ্ডীর গানে, এমন কি দীন-ভিখারী ভিক্ষুকগণের কণ্ঠোচ্চারিত হইয়া শ্রোতার

প্রাণে সুধাবর্ষণ করে—তাঁহার জীবন-কাহিনী, তাঁহার সাধন-ভজনের শিক্ষা-প্রণালী, ধর্ম্মময় চরিত্রাবলী, বাঙ্গালার কোনও পাঠকের নিকট অনাদৃত হইবে না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কারণ, সাধন-ভজনের অপরিপক্ক অবস্থায় যত মতভেদ, যত দ্বেষাদ্বেষীভাব কিন্তু পরিপক্কাবস্থায় আর তাহা থাকে না—সকলেই এক লক্ষ্যে সেই অবাঙ্‌মনসগোচরম্, একমেবাদ্বিতীয়ম্, পরম পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়। স্রোতস্বতী যেমন রাজ্যের সমস্ত অপবিত্র আবর্জ্জনা বিধৌত করিয়া, সুপ্রশস্ত-হৃদয়ে অন্তহীন, নির্ব্বিকার সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া এক হইয়া মিশিয়া যায়, তখন যেমন তাহার নিজের কোন অস্তিত্বই থাকে না—যেমন সমস্ত একাকার ভাব ধারণ করে, সেইরূপ সাধন যখন সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিবার জন্য সোপানাবলী আরোহণ করিতে থাকে, তখনই তাহার ভেদজ্ঞান, তখনই তাহার শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ। নদী যে দিক দিয়া, যেমন ভাবেই গিয়া সাগরে মিলিত হউক না কেন—পরিণাম যেমন একাকার হওয়া ব্যতীত আর কিছু নহে, সাধকও সেইরূপ যিনি যে মতে পরিচালিত হইয়া, যে দিক দিয়াই অগ্রসর হউন না কেন—সেই মহা-সাগরে পড়িলে তাঁহারা যে সকলেই এক হইয়া অস্তিত্ব হারাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কলির মুক্তযোগী স্বনামধন্য সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন তান্ত্রিক সাধনার প্রভাবে নিজের প্রগাঢ় ভক্তিবলে ভক্তবৎসলা ভগবতীকে কিরূপ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, জীবনের উষাকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত কিরূপভাবে সাধন-ভজন করিয়া, মহামায়ার পরম প্রিয়-পাত্র হইয়াছিলেন—এই পুস্তকে তাহাই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন—সেই সকল সঙ্গীত যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব বিশ্লেষণ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করত এই গ্রন্থের অবতরণিকা করিলাম—শক্তি আমার নহে। ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মভাব পরি-পূরিত আখ্যান নিশ্চয়ই সমাদরে আদৃত হইবে, বিশেষতঃ রামপ্রসাদ সকলেরই নিকট সমানভাবে সমাদৃত। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ শক্তিসাধক, মাতৃমন্ত্রে উন্মাদ, ত্যাগী যোগী পুরুষ ভারতের এই দারুণ পাপ-তাপ-কলুষিত কলিকালে আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবন চরিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন এবং কোনরূপ ত্রুটি হইলেও যে ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন—তাহার আর বিচিত্র কি? তখন আমাদের দেশে কোন প্রকার ইতিহাস লেখার নিয়ম ছিল না বা কোন আখ্যায়িকায়ও তাঁহার সম্বন্ধে বেশী কিছু পাওয়া যায় না। তবে লোক মুখে এবং কিংবদন্তির দ্বারা যাহা সংগ্রহ করা যায়, আমি তাহার

পক্ষে কিছুমাত্র ক্রটি করি নাই। আর সাধকের সাধনতত্ত্ব বিবৃত করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করি—ক্ষুদ্র আমি—এমন সাধ্য আমার কোথায়? তবে যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয়—পঙ্গু দুরারোহ-গিরি অতিক্রম করিতে পারে—যাঁহার কৃপায় শুষ্ক কাষ্ঠ মঞ্জুরিত হয়—অসম্ভবও যাঁহার করুণা-বলে সম্ভব হইতে দেখা যায়, আমার ভরসা কেবল তাঁহার। সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার পাদপদ্ম ভরসা করিয়াই আমি এই প্রাতঃস্মরণীয় সাধক চরিত্র বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি—মায়ের কৃপা হইলে জগতে জীবের অসাধ্য কিছুই থাকিতে পারে না।

হাওড়া
১৩২৪ সাল

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বংশতালিকা।

- রামপ্রসাদ সেন
  - পরমেশ্বরী
  - রামদুলাল
    - রামচন্দ্র সেন
      - কালাচাঁদ সেন
  - রামমোহন
    - জয়নারায়ণ সেন
      - গোপালকৃষ্ণ সেন
        - শ্রীকালীপদ সেন
      - দুর্গাদাস সেন
        - শ্রীঅমরনাথ সেন
      - গোরাচাঁদ সেন
  - জগদীশ্বরী

বালক তাহা শুনিয়া নিদ্রিত হইল এবং প্রাতঃকালে পণ্ডিতগণের প্রাক্কালে উঠিয়া পূর্ব্বরাত্রের শিক্ষামত বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল।

সেই চীৎকারে পণ্ডিতগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কোন বিপদ হইল নাকি, ভাবিয়া তাঁহারা শয্যাত্যাগ করিলেন এবং বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের রক্ষিতা দাসীর পুত্রটী মাতৃতাড়নায় চীৎকার করিতেছে। পণ্ডিতগণকে দেখিয়া দাসী বলিল—"ঐ যা, উঁহাদের নিকট যা, উঁহারা মহাপণ্ডিত, কাকগুলি ডাকিতেছে কেন উঁহারা বলিয়া দিবেন," এই বলিয়া ঝি পুনরায় গৃহকর্ম্মে মন দিল। বালক আস্তে আস্তে পণ্ডিতগণের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাকগুলো ডাকৃছে কেন, বলে দাও।" তখনও পণ্ডিতগণের নিদ্রোত্থিত অবসাদ তিরোহিত হয় নাই—তাঁহারা বালকের কথা শুনিয়া বলিলেন—"কাকগুলো ডাকৃছে কেন, তা আমরা কি করে জান্‌বো, সকাল হয়েছে—তাই ডাকৃছে। রাত্রে ত' বাসার বাহির হইতে পাবে নাই।"

সে কথায় বালকের মনস্তুষ্টি হইল না। পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট আসিল এবং বলিল—"মা, পণ্ডিতেরা কিছু জানে না, তুই বলে দে, কেন কাকগুলো ডাকৃছে।"

রমণীবেশী কুম্ভকার বলিল—"ওরে হতচ্ছাড়া! তুই ছেলে মানুষ কি বুঝিবি, তুই কি সংস্কৃত জানিস্?"

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"না তুই বল।"

বালকের আগ্রহ দেখিয়া রমণীবেশী কুম্ভকার বলিল, তবে শোন :—

"তিমিরারি স্তমো হন্তি শঙ্কাকুলিতমানসাঃ
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ ॥"

"ওরে বোকা ঐ দেখছিস্ পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠ্‌ছে, সূর্য্য উঠ্‌লে জগতে আর অন্ধকার বা কালো কিছুই থাকে না, সূর্য্য-কিরণে সমস্তই পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু কাকগুলো নাকি কালো চেহারা, অন্ধকারের মত কালো, তাই তাহাদের ভয় হয়েছে, পাছে সূর্য্যদেব তাদেরও বিনাশ করেন, এই জন্য ভয়ে ভয়ে তাহারা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিতেছে—"হে দেব! আমরা কাল নহি, আমরা কাক", এই জন্য কলরব করত উড়িয়া পলাইতেছে।" বালক মায়ের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং আপন মনে খেলাইতে লাগিল। পণ্ডিতগণ হীনজাতীয়া স্ত্রীলোকের মুখে অলঙ্কার-শাস্ত্রের এইরূপ সুন্দর শ্লোক শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"মা! তুমি এই সকল শ্লোক কোথায় শিখিলে?" রমণী বলিল—"বাবা! আমরা কুমোর-হাটের কুমোরের মেয়ে,

সেখানে যে যে সব পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের আশে-পাশে আমাদের বাস। তাঁহাদের মুখেই শুনেছি।”

পণ্ডিতগণ স্তম্ভিত হইলেন। এ গ্রামের নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের বিদ্যাবুদ্ধি যদি এরূপ প্রখর হয়—না জানি পণ্ডিতগণ বিদ্যাবুদ্ধিতে কিরূপ উচ্চপদস্থ! এই কথা শুনিয়া তাঁহারা চিন্তাযুক্ত চিত্তে সেই দিন আহারাদি করিয়া রমণীকে বিদায় করিলেন এবং অপরাহ্নে তাঁহারাও তথাকার পণ্ডিতগণের সহিত বিচার-তর্কের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

কুম্ভকারের বুদ্ধিবলে অপদস্থ হইয়া পণ্ডিতগণ পলায়ন করিলেন, এই ঘটনা যখন তত্রত্য পণ্ডিতগণের কর্ণে প্রবেশ করিল—তখন তাঁহারা কুম্ভকারের উপস্থিত বুদ্ধির কথা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং একজন নীচজাতীয় কুম্ভকার তাঁহাদের মান রক্ষা করিয়াছে দেখিয়া, সেইদিন হইতে পণ্ডিতগণ ঐ গ্রামের "কুমারহট্ট" নামকরণ করিলেন।

এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও হালিসহর যে এককালে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল—তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। তথাকার ভগ্নোন্মুখ দেবমন্দির, অত্যুন্নত প্রাকার-পরিখা, ভূলুণ্ঠিত হর্ম্মাবলী এখনও তাহার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শুনা যায় ১৮৬০ সালে দুরন্ত কৃতান্ত সহচর ম্যালেরিয়া এই সুদৃশ্য গ্রামখানিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, তাই আজ হালিসহর কুমারহট্ট একপ্রকার জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার অবস্থা দেখিয়া বিচার করিলে, ইহা যে এককালে সমুন্নত অবস্থাপন্ন নগরী ছিল, এরূপ বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তবে অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ ইহার ভগ্নাবশেষ লোকের মনে প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়।

এই কুমারহট্টের সেন-বংশ বড়ই প্রসিদ্ধ। ইহার আদি পুরুষ কীর্ত্তিবাস সেন দয়া-দাক্ষিণ্য এবং অমায়িকতা গুণে বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, বদান্যতাও তাঁহার তেমনি চরিত্রগত গুণ ছিল। এই সেন-বংশ তান্ত্রিক কুলাচারী ছিলেন, বংশ-পরম্পরায় ইহারা দরিদ্র-সেবায় মুক্তহস্ত। তন্ত্রোক্ত কোন একটি সামান্য ধর্ম্মকর্ম্মের অছিলা করিয়া কীর্ত্তিবাস অজস্র অর্থ দান করিতেন—তাঁহার বদান্যতায় নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে অভুক্ত কেহই থাকিত না। হঠাৎ কেহ থাকিলে, কীর্ত্তিবাসের কর্ণগোচর হইবামাত্র, তাহার অভাব দূর হইত। কীর্ত্তিবাসের কীর্ত্তি এইরূপ কত লোককে যে ভীষণ দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এই কীর্ত্তিবাস হইতেই সেন-বংশের দানশক্তি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জনে জনে

বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার মৃত্যুর পর রামেশ্বর সেনও পিতৃপথানুবর্ত্তী হইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জন তাদৃশ ছিল না এবং তিনি অকালে মৃত্যুর অঙ্কে শায়িত হইয়া বেশী কিছু কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার সম্মানেই তাঁহার সম্মান, হালিসহরে, কুমারহট্টে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে বেশ অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান ছিল।

তাঁহার পুত্র রামরাম সেন। পিতার জীবিতাবস্থাতেই রামরাম পরিণীত হয়েন। রামরাম সেন সেই সময়কার শিক্ষায় বেশ শিক্ষিত হইয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার উপর পিতার যৎসামান্য সম্পত্তির আয়ও ছিল; তাহার দ্বারা তখনকার দিনে অতিসুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। রামেশ্বর অল্পবয়সেই নানারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার একটি পৌত্র-মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলেই তাঁহার মৃত্যুতে সুখ হয়, তিনি মনের আনন্দে ইহলোক ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু রামরামের পত্নী যেরূপ স্থূলকায় হইয়াছেন—তাহাতে সকলেই বলিতেছে—তাঁহার আর পুত্রাদি হইবার আশা নাই। প্রতিবাসী রমণীগণ এইরূপ জল্পনা কল্পনা করায় রামেশ্বর পুত্রের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং বংশ মর্য্যাদা হেতু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বেশী বিলম্ব হইল না। রামরামের দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ কার্য্য অল্প দিনের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে—ভগবান্ তাহা সফল হইতে দেন না; পুত্রের দুইটী বিবাহ দিলেন বটে, কিন্তু পৌত্র-মুখ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না—তিনি অকালে কালকবলে পতিত হইয়া সকল আশার পরিসমাপ্তি করিলেন। রামরাম পিতার মৃত্যুতে প্রমাদ গণিলেন। বাটীতে লোকাভাব, দুইটী অল্পবয়স্কা স্ত্রী গৃহে রাখিয়া তিনি কোথাও যাইতে পারেন না, এই জন্য অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ—লোকাভাবই তাঁহার উন্নতির অন্তরায় রূপে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। বংশের যশোমান বজায় রাখিবেন, সকলের মধ্যে গণনীয় হইবেন—এরূপ ইচ্ছা কাহার অন্তরে না জাগরিত হয়; কে না আপন বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে? রামরাম মূর্খও ছিলেন না, চেষ্টা করিলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব—তাহাও নহে। তবে এসব ফেলিয়া তিনি কেমন করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন কাজেই তাঁহার মনের বাসনা মনেই রহিল—তিনি পিতৃপ্রদত্ত সামান্য সম্পত্তি দ্বারাই এক প্রকার দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বাটীতে বসিয়া কৃষি কার্য্যদ্বারা তিনি ধনাগমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে একপ্রকার কৃতকার্য্যও হইলেন।

কিছুদিন পরে, চাষাবাদে তাঁহার দুই পয়সা আয় হইতে লাগিল। রামরাম ধর্ম্মকর্ম্মে বিশেষ মতিমান্ ছিলেন; তান্ত্রিকের ক্রিয়া-কলাপ তিনি যথাবিধি প্রত্যহ সমাধা করিতেন, এ সকল কার্য্যে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। ইহাতে উপার্জ্জনের ক্ষতি হইলেও তিনি তত ক্ষতি বোধ করিতেন না, কিন্তু দৈনিক ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত হইলে তিনি মরমে মরিয়া যাইতেন; কোনরূপ ত্রুটি হইলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। রামরামের পত্নীদ্বয়ও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী; স্বপত্নী বিদ্বেষ তাঁহাদের মধ্যে ছিল না, ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহারাও স্বামীর সহায়তা করিতেন, স্বামীর উপদেশানুসারে দিবাভাগের অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মসেবায় অতিবাহিত করিতেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী কাত্যায়নী, কনিষ্ঠা সিদ্ধেশ্বরীকে ঠিক ছোট ভগ্নীর মত দেখিতেন; সিদ্ধেশ্বরীও কাত্যায়নীকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় মান্য করিতেন—কখন তাঁহার কথার অবাধ্য হইতেন না। এই দুইটী লক্ষ্মীস্বরূপা পত্নীর গুণে রামরামের সংসার অল্প আয়েও বেশ সুখে চলিয়া যাইত, দরিদ্র-সেবায়ও তাঁহারা যথাসাধ্য মুক্তহস্ত ছিলেন, কেহ অভুক্ত আসিলে ফিরিয়া যাইত না, উদর পূরিয়া আহার করিয়া আশীর্ব্বাদ করিত—"মা! তোমরা সুসন্তান লাভ কর, তোমাদের মনের মতন ধন হ'ক। তোমরা সুখী হও। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক।" অতিথি সেবার ফল কখন ব্যর্থ হয় না। বৎসরান্তে রামরামের দুইটী স্ত্রীই গর্ভবতী হইলেন। প্রথমা স্ত্রী কাত্যায়নীর গর্ভে একমাত্র নিধিরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী সে সময়ে একটী কন্যারত্ন প্রসব করেন—তাঁহার নাম অম্বিকা। তৎপরে প্রথমা স্ত্রীর কোন সন্তানাদি হয় নাই; দ্বিতীয়া স্ত্রী ক্রমান্বয়ে আরও এক কন্যা ও দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে আমাদের গ্রন্থোক্ত সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ তৃতীয় পুত্র, তিনি মুসলমান রাজত্ব সময়ে অনুমান ১৮২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং চতুর্থ পুত্র বিশ্বনাথ। পুত্র কন্যাগণ দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, পিতামাতার আনন্দের সীমা রহিল না। রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম, জ্যেষ্ঠা ভগিনী অম্বিকা ও সর্ব্বকনিষ্ঠ বিশ্বনাথের সম্বন্ধে কোন প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করা সুকঠিন—কেহই তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। তবে রামরাম সেনের দ্বিতীয়া কন্যা ভবানীর সহিত কলিকাতা নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের শুভ পরিণয় সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার গর্ভে জগন্নাথ ও কৃপারাম নামক দুই পুত্র হইয়াছিল, সংবাদ পাওয়া যায়।

পিতামাতার অকৃত্রিম যত্নে প্রতিপালিত রামপ্রসাদের জীবনের উষাকাল বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতে লাগিল। রামপ্রসাদ বাল্যকালে পিতামাতার বড়

আব্দারে ছেলে ছিলেন, তিনি যে আব্দার ধরিতেন—তাহা সহজে ছাড়িতেন না, তবে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার মন বড়ই লিপ্ত হইয়াছিল। পিতা যখন ইষ্টসেবায় রত থাকিতেন, প্রসাদও সেই সময় পিতার নিকট চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া থাকিত। জানি না, সেই অল্প বয়স্ক বালক জীবনের সেই উষাকালে, প্রভাতোদয় হইতে না হইতে কি ধ্যান করিত, কি জপ করিত। ধার্ম্মিক পিতামাতা কিন্তু পুত্রের এই ধর্ম্মভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন, হৃদয়ে প্রভূত আনন্দানুভব করিতেন। তান্ত্রিক রামরাম পুত্রকন্যাগণের হিতার্থে প্রতি বৎসর তন্ত্রোক্ত কালী পূজা বিশেষ ভক্তিভাবে সমাহিত করিতেন। ইহার দ্বারা তাঁহার বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে—ইহাই বাসনা। এইরূপে ধর্ম্মের সংসার বেশ সুখে চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু অর্থের প্রাচুর্য্য হইল না, কোন প্রকারে সুখে দুঃখে কাল কাটিতে লাগিল। রামরাম জানিতেন—বেশী অর্থের চেষ্টা করিলেই পাপ কার্য্য, মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইতে হইবে—কাজেই তিনি সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যৌবন-কাহিনী

পিতামাতার শিক্ষাগুণেই পুত্র-কন্যার চরিত্র গঠন হইয়া থাকে। যে পিতামাতা বাল্যকালে এই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন, তাঁহাদের পুত্রগণ প্রায়ই কুকর্ম্মান্বিত হইয়া বংশমর্য্যাদা নষ্ট করে। পূর্ব্বজন্মের নিয়তি বা সুকৃতি-দুষ্কৃতি, স্বতন্ত্র কথা। ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে ত' জানা যায় না যে, ইহার সৌরভে দিগন্ত পরিপূরিত হইবে, কি সে কীট-দষ্ট হইয়া নষ্ট হইবে, অথবা সে ভীষণ রৌদ্রতাপে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িবে। কিন্তু তা বলিয়া যত্নের ক্রটী করা কি উদ্যান-রক্ষকের উচিত? জীব নিয়তি অনুসারেই পরিচালিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু তা বলিয়া তাহার পিতামাতা কি পুত্রের উন্নতির চেষ্টা করিবে না।

রামপ্রসাদের মতিগতি ধর্ম্মের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, তথাপি ক্রমশঃ বয়স হইতেছে, বিদ্যা শিক্ষায় আর উদাস থাকিলে চলিবে না। শিশুমন নবনীত সমান, এখন ইহাতে যাহা অঙ্কিত করিবে—তাহা চিরস্থায়ী হইবে। বেশী বয়স

হইলে আর লেখাপড়া শিক্ষা হইবে না, ভাবিয়া রামরাম পুত্রের শিক্ষার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। প্রথমতঃ গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের নিকট প্রসাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন বালক অল্পদিনের মধ্যে গুরু মহাশয়ের পাঠশালা শেষ করিলেন। তখন পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিতে পারিলেই সাংসারিক জীবনে তাহার আর কিছুই আট্‌কাইত না; দৈনিক হিসাবনিকাশ, দলিলপত্র, মুহুরীগিরি প্রভৃতিতে তাহার বেশ দখল হইয়া যাইত। পুত্র পাঠশালার শিক্ষায় বেশ পারদর্শী হইয়াছে দেখিয়া রামরাম পুত্রকে বাঙ্গালা পড়াইতে লাগিলেন। বাঙ্গালা ভাল ভাল পুস্তক, প্রাচান কবিগণের পদাবলী প্রভৃতি পুত্রকে কণ্ঠস্থ করাইলেন। রামরাম পুত্রকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির উপদেশ দিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ অসীম বুদ্ধিশক্তি বলে অল্পদিনের মধ্যে সে সমস্ত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এইবার পিতার ইচ্ছা হইল, পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী করিয়া নিজ ব্যবসায় কবিরাজীতে প্রবৃত্ত করিবেন, এই মনে করিয়া তিনি কুমারহট্টে বিদ্যানিধি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় রামপ্রসাদের নম্রতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাহাকে প্রাণ খুলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় রামপ্রসাদকে যাহা একবার বুঝাইয়া দিতেন, তাহা আর দ্বিতীয়বার বুঝাইবার আবশ্যক হইত না, বালক নিজ বুদ্ধিবলে তাহা আয়ত্ত করিয়া লইত, কাব্য পাঠে প্রসাদের বড়ই অনুরক্তি ছিল। তিনি অন্ত বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া কাব্যে মনঃসংযোগ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে ব্যাকরণ ও কাব্যে তাহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ হইল। এইবার পিতা পুত্রকে নিজ ব্যবসার প্রতি মনোনিবেশ করিতে বলিলেন, কিন্তু পুত্র জ্ঞানপিপাসায় তখনও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। রামপ্রসাদের ইচ্ছা আরও কয়েকটী ভাষা আয়ত্ত করেন। রামরাম দেখিলেন—যখন মুসলমানের রাজত্বে বাস করিতে হয়, তখন যদি কখনও তাহাদের সহিত মিশিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাষা কিছু কিছু অভ্যাস করা উচিত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবং পুত্রের ইচ্ছা জানিয়া, তিনি পারস্য ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিতে পুত্রকে অনুমতি দিলেন। রামপ্রসাদ নিজের চেষ্টায় এবং কষ্টসহিষ্ণুতা গুণে তাহাও মনোযোগের সহিত শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদের বয়স যখন অষ্টাদশ বর্ষ, সেই সময় হইতেই তাহার হৃদয়ে সাধনবীজ অঙ্কুরিত হয়। রামপ্রসাদের জীবন যে কেবল জড়পিণ্ড নয়, কেবল যে সাধারণ লোকের মত সাংসারিক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্ত সৃষ্ট হয় নাই, তাহা তাঁহার জীবন প্রভাতের সময় হইতেই বেশ বুঝা গিয়াছিল, কারণ এই অল্প

বয়স হইতেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ এবং ঈশ্বরানুরক্তির বিকাশ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পিতা, পুত্রের যৌবন সমাগত দেখিয়া এবং নানাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত দেখিয়া তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জীবনের ত' স্থিরতা নাই, কবে-কোন্ দিন এ দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া প্রাণপাখী পলায়ন করিবে—এই সময় পুত্রকে সংসারী করিয়া যাইতে পারিলেই ভাল হয়। রামরাম যাহা মনঃস্থ করিলেন, কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হইল না। রামপ্রসাদের দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বিবাহ দিয়া একটী সুন্দরী বধূ গৃহে আনিলেন। কবিরাজ বংশের নিয়মানুসারে তাঁহার দ্বিজ সংস্কার পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল। মানব জীবনের প্রধান সংস্কার—বিবাহ তাহাও সম্পন্ন হইয়া গেল। রামরাম পুত্রকে অনবরত সংসার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাহার দায়িত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং তিনিও আর্য্য-শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছেন যে, সংসার আশ্রমের তুল্য আশ্রম আর নাই। এই আশ্রমে থাকিয়া ঈশ্বর সাধনার উন্নতি করিতে পারিলেই যথার্থ বীর সাধক হওয়া যায়, নতুবা চিত্ত স্থির হইল না, ব্রহ্মচর্য্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিলাম না, কেবল প্রবৃত্তির দাস হইয়া আশা মিটিল না বলিয়া, যাহারা সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়, ঈশ্বর সাধনায় এ জীবনে তাহারা কখনও উন্নতি করিতে পারে না। ধর্ম্ম বনে নহে—মনে। তুমি যেখানেই থাক, আর যাহাই কর, তোমার জগতে আসা যে কেবল ঈশ্বর সাধনার জন্য তাহা মনে থাকিলেই তোমার জীবনের কার্য্য ঠিক থাকিবে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, নতুবা মনঃস্থির না করিয়া, মনকে স্ববশে না রাখিয়া কেবল গৃহের বাহির হইলে ত সমস্তই পণ্ড হইবে!

রামপ্রসাদ পিতামাতাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া কখন কোন কার্য্য করিতেন না, বিশেষতঃ জননী সিদ্ধেশ্বরীর বাক্য তিনি স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরীর বাক্য মনে 'করিতেন এবং পিতার আদেশ তিনি দেবাদেশ বলিয়া স্বীকার করিতেন। রামপ্রসাদ বিবাহিত হইয়াছেন, জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, এইবার তাঁহার দীক্ষা লইবার ইচ্ছা হইল। পিতা পুত্রের মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন—তাঁহাদের কুলগুরু মাধবাচার্য্যকে আনাইয়া পুত্র ও পুত্রবধূর দীক্ষা কার্য্য শেষ করিলেন। তান্ত্রিক রামপ্রসাদ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রত্যহ জপতপ ও সাধনায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন কিন্তু গুরুদেবের নিকট তাঁহার উপদেশ গ্রহণ বেশী হইল না! মাধবাচার্য্য দীক্ষা প্রদানের পর দুই তিনবার রামপ্রসাদের নিকট আসিয়া কয়েকটী ক্রিয়া-কলাপ শিক্ষা প্রদান

করিয়াছিলেন। শিষ্যের আগ্রহ দেখিলে কোন্ গুরু না তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে যত্নবান হন? রামপ্রসাদ ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত গুরুদত্ত বীজমন্ত্র ও সাধনপ্রণালী সকল আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে অভীষ্টদেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ অবলোকন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য রামপ্রসাদকে বেশীদিন ভোগ করিতে হয় নাই। দীক্ষা প্রদানের একবৎসর পরেই মাধবাচার্য্য ইহলোক ত্যাগ করিলেন! প্রসাদের জ্ঞান-পিপাসার শান্তি হইতে না হইতে, ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতে ক্ষেত্ররক্ষকের তিরোধানে রামপ্রসাদ বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু মা বিশ্বেশ্বরী যাহার সহায়, তিনি যাহাকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন——তাহার কি কোনও বিষয়ের অভাব হইতে পারে? এই সময়ে সাধক-শ্রেষ্ঠ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আগমবাগীশ একবার কুমারহট্টে আসিলেন। তত্রত্য তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আনাইয়া কয়েক দিন উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদ আগমবাগীশের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া বড়ই উৎফুল্ল হইলেন। এই মহাত্মার কৃপালাভ করিতে পারিলে সাধনমার্গে তাঁহার অনেক সাহায্য হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া যখন পণ্ডিতগণ স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া রজনীযোগে আপন আবাসে গমন করিতেন, সেই সময় আনন্দময় মহাপুরুষ আগমবাগীশ আনন্দময়ীর আনন্দে বিভোর হইয়া একাকী আপন নির্দ্দিষ্ট বাস-গৃহে অবস্থান করিতেন। রামপ্রসাদ সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া আত্ম-কাহিনী জ্ঞাপন করিতেন। রজনীর সেই ভাগে আগমবাগীশের সাধন সময়ে, তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিলে সহজে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না, কিন্তু রামপ্রসাদ ত' ভয় পাইবার পাত্র নহেন! সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া লইতেন। প্রসাদের সৌভাগ্য সত্বর প্রস্ফুটিত হইবে জানিয়া, সাধকপ্রবর আগমবাগীশ তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং আশীর্ব্বাদ করিতেন,—"বৎস! তুমি সাধন সমরে জয়ী হইবে—ইহাই আমার বিশ্বাস; একদিন তোমার যশঃসৌরভে ভারত পরিপূরিত হইবে, তোমার সাধন-প্রভাবপূর্ণ সঙ্গীতে একদিন বাঙ্গালাদেশ পবিত্র হইবে।" প্রসাদ ইহাকে দেবতার আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেন এবং তিনি যে কয়দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ প্রত্যহ তথায় আসিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। মাধবাচার্য্যের নিকট তিনি অনেক বিষয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এইবার তান্ত্রিকাগ্রগণ্য আগমবাগীশের নিকট তাহার পরীক্ষা প্রদান করিলেন। তিনি

অল্প বয়সে রামপ্রসাদকে এতদূর উন্নতি করিতে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন এবং অপরাপর ক্রিয়া নির্ব্বাহের সুলভ সন্ধান সকল বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান করিলেন। কিন্তু সাধক-শ্রেষ্ঠগণ একস্থানে বেশীদিন অপেক্ষা করেন না। পাছে তাঁহাদের সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে, সাধারণ লোক আসিয়া পাছে বাজে কাজের জন্য তাঁহাদের ব্যস্ত করে, এইজন্য দুই চারিদিন অপেক্ষা করিয়াই তাঁহারা সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আগমবাগীশ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন—আর কেনইবা না হইবে, অনন্ত ভুবনের অধীশ্বরী মা যাঁর ভক্তিপাশে আবদ্ধ, এ জগতে তাঁহার অজানিত কি আছে? কুমারহট্টের পণ্ডিতগণ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই; তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল—পণ্ডিতগণের সে বোধ-শক্তি ছিল না; তাঁহারা তাঁহাকে একজন সাধারণ পণ্ডিত-সাধক মাত্র জানিয়া, সেইরূপ বাহ্য-উপদেশ লইয়াছিলেন।

কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া সাধক একদিন রজনীযোগে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, কেহ তাঁহার সন্ধান পাইল না। রামপ্রসাদ এই কয়দিন যে সকল বিষয় তাঁহার নিকট উপদেশ লইয়াছিলেন—নির্জ্জনে সেই সকলের কার্য্য করিতে লাগিলেন। পিতামাতা রামপ্রসাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ দেখিয়া বড়ই প্রীত হইতে লাগিলেন। তখনকার পিতামাতা পুত্রকে ধর্ম্মপথগামী দেখিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। এখন বালকগণ বালককালে যদি ধর্ম্মের প্রতি মতিমান্ হয়, ধর্ম্মচর্চ্চায় মন দেয়, তাহা হইলে সকলে তাহাকে "ছেলেটা বহিয়া গিয়াছে, অল্প বয়সে বড়ই জ্যেঠা হইয়াছে।" ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করে, পিতামাতা তাঁহাকে ধর্ম্ম-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন এবং বলেন, —"বাবা! বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হয়, একি ধর্ম্মোপার্জ্জনের সময়!" এখনকার শিক্ষা এইরূপ হইয়াছে; কাজেই আমাদের আর ভদ্রত্ব কোথায়? হায়! যে ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত তিল মাত্র বিচ্ছেদ ঘটিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত লোপ হয়—তাহাদের শিক্ষা যদি এইরূপ হইতে আরম্ভ হইল, তবে আর উন্নতির আশা কোথায়! উন্নতির অর্থই ত' ধর্ম্মোন্নতি; যদি চিরস্থায়ী উন্নতি অর্থাৎ আত্মার সম্যক্ উন্নতি বিধান করিতে চাও, যদি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া দেবত্বের আশা কর, তবে একমাত্র ধর্ম্মই তোমাদিগকে সে সন্ধান বলিয়া দিতে পারে,— তোমাদিগকে মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই চরমোন্নতিতে অধিষ্ঠিত করিতে পারে। জাগতিক বিষয়-বৈভব, অর্থ-সামর্থ্য কাহারও সাধ্য নাই যে তোমার সেই একমাত্র অভীপ্সিত বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ হয়।

রামপ্রসাদের পিতামাতা তখনকার লোক, তখন দেশে ধর্ম্মের এত হতাদর

হইয়া মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই ; তাই পুত্রের ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় রতি দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে যথোচিত উৎসাহিত করিতেন, আপনাদিগকেও ধন্য জ্ঞান করিতেন। কিন্তু রামপ্রসাদের এ সুখ সৌভাগ্য, এ আদর-আপ্যায়ন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কাল ত' কাহারও কথা শুনিবে না—কাহারও উন্নতি অবনতি দেখিবে না—ভাল মন্দের বিচার করিবে না। আবহমানকাল সে যেমন ভাবে চলিয়া আসিতেছে, সেই ভাবেই চলিয়া যাইবে—কোন বাধাই মানিবে না। একদিন হঠাৎ সামান্য পীড়ায় রামপ্রসাদের পিতৃবিয়োগ ঘটিল ; যে আনন্দের দুলাল আনন্দভরে—হাসিয়া খেলিয়া আপন কার্য্য-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল—সংসারের আবহাওয়া যাঁহাকে একদিনের জন্যও ব্যতিব্যস্ত করিতে পারে নাই, হঠাৎ দুরন্ত কৃতান্ত তাঁহার আনন্দের খেলা-ঘর এক ফুৎকারে লণ্ডভণ্ড করিয়া তাঁহার আশার বাতি নিবাইয়া দিল। প্রসাদ জগৎ সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। ধাম্মিক বলিয়া—কাল তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না ; তাঁহার আরাধ্য পিতৃদেবকে ইহসংসার হইতে অপসৃত করিয়া তাঁহার মস্তকে কঠোর অশনি নিক্ষেপ ক'রল। রামপ্রসাদ নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে, দুঃখভরা ভাঙ্গা প্রাণে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা করিলেন, পরে যাহা কিছু সম্বল ছিল—পিতার স্মৃতি-কল্পে তাহার দ্বারা পারত্রিক শ্রাদ্ধ-কাযা সম্পন্ন করিয়া শুচি হইলেন।

জগতে কালের এই একটি মাত্র নির্দ্দয় আঘাতে প্রসাদ হেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবকও টলিয়া পড়িলেন কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। মনে-প্রাণে মায়ের শরণাপন্ন হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সাধনভজনে তিনি অবহেলা করিলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। সংসারের মধ্যে উপায়ক্ষম ব্যক্তি আর কেহ নাই। সুতরাং পরিবার প্রতিপালনের ভার সমস্তই তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। পিতার মৃত্যুর পর, তিনি কয়েক বৎসর স্বচ্ছন্দে থাকিয়াই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জননী সিদ্ধেশ্বরী ও পত্নী সর্ব্বাণী প্রাণপণ করিয়া সংসারের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রামে অবস্থানকালীন এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পরমেশ্বরী নামে ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা এবং রামদুলাল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বিরচিত "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরে" তিনি যে বংশাবলীর পরিচয় দিয়াছেন—তাহারই সঠিক বিবরণ এখানে প্রকাশ করা হইল ; কিন্তু এতদ্ব্যতীত তাঁহার রামমোহন নামে আরও একটী পুত্র হইয়াছিল। তাহার কোন বিবরণ পুস্তকাদিতে পাওয়া যায় না। তবে রামপ্রসাদের প্রপৌত্র, এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার

বাবু কালীপদ সেন মহাশয়ের নিকট শুনা গিয়াছিল যে—সে পুত্রটী তাঁহার উক্ত পুস্তক রচনার বহুদিন পরে অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, কোন পুস্তকে তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ হয় নাই।

অনেকে বলেন—তিনি যেমন অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন—তাঁহার জননীও সেইরূপ তাঁহাকে অল্পবয়সে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু আমরা বহু সন্ধানে জানিয়াছি যে তাঁহার জননী আরও কিছুদিন জীবিতা ছিলেন। যাহা হউক, এইবার তাঁহার সংসারে বড়ই অভাব হইতে লাগিল। পিতার সঞ্চিত অর্থ কিছুই ছিল না, যৎসামান্য জমিজমা, চাষ আবাদ যাহা ছিল, তাহাতে সংসার পরিচালনের উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কাজেই অন্যত্র যাইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে বাধ্য হইলেন এবং একদিন ফাল্গুন মাসের শুভ তৃতীয়া তিথিতে রামপ্রসাদ জননীর চরণ বন্দনা করিয়া, পতিব্রতা সর্ব্বাণীর অভিমতে দুর্গানাম স্মরণ করত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভাবের প্রভাবে

সংসারীর পক্ষে সংসারের অনটন বড়ই কষ্টকর। ইহাতে মানুষের মতি স্থির থাকে না, বুদ্ধির প্রাখর্য্য নষ্ট হয়, চিত্তবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে পারে না, এক কথায় মানুষকে মনুষ্যত্ব-হীন করিয়া ফেলে। কর্ম্মঠ মানুষকে জড়-ভাবাপন্ন করিতে—হৃদয়ের যাবতীয় আনন্দ বিলুপ্ত করিতে সাংসারিক অভাব যতদূর সক্ষম, ততদূর আর কেহই নহে; আর কিছুই মানুষকে ততদূর হীনপ্রভ করিতে পারে না। রামপ্রসাদের ন্যায় সাধুপ্রকৃতি ধর্ম্মবিশ্বাসী, ধৈর্য্যশালী ব্যক্তিকেও সাংসারিক অভাবের দ্বারা বিচলিত হইয়া আজ দেশত্যাগী হইতে হইল। রামপ্রসাদ—জননী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে ছাড়িয়া এই জীবন-মধ্যাহ্নে, এই মধুরযৌবনে—অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবাসী হইলেন। এইজন্য বলিতে হয়—সংসারী হইলে, তুমি ধার্ম্মিক, সাধু বা যোগী—যাহাই হও না কেন, অভাব তোমাকে পরাজয় করিবেই করিবে। তবে ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীন ব্যক্তি অভাবের দাস হইয়া সদা সর্ব্বদা

কেবল অর্থের জন্য কাতর ভাবে ছুটাছুটী করে, ভাল কর্ম্ম মন্দ কর্ম্ম কিছুই বিচার করে না, যে কোন প্রকারে হউক, অর্থ সংগ্রহ হইলেই হইল। আর যাহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী—ধার্ম্মিক, তাহারা ভগবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহার উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া, সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ ইষ্টদেবীর পদে সমস্ত নির্ভর করত কুমারহট্ট হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ কলিকাতায় আসিলেন। রামপ্রসাদ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, কষ্টসহিষ্ণু ও মধুরভাষী ছিলেন; ধর্ম্মতেজে তাঁহার দেহখানি বেশ সুন্দর ও সুপুষ্ট ছিল; দেখিলে সকলেরই নয়ন আকৃষ্ট হইত। বাটী হইতে বাহির হইয়া রামপ্রসাদকে আর তাদৃশ কষ্ট চিন্তা-রাক্ষসীর অত্যাচার সহ্য করিতে হয় নাই; তিনি মাতৃপদে সমস্ত নিভর করিয়া মনের আনন্দে কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—অভাব হইলে তাহার পূরণ নিশ্চয়ই হইবে, মা কি কখনও সন্তানকে উপবাসী রাখিতে পারেন?

রামপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া দুই একজন ভদ্রলোককে তাঁহার অভাবের কথা বলিলেন। তখন কলিকাতা এখনকার মত সহরে পরিণত হয় নাই; তখন মুসলমান রাজত্বের শেষ। কলিকাতা তখন রাজধানী ছিল না, কাজেই এখনকার মত শোভা-সম্পদে কলিকাতা নগরী সুশোভিত ছিল না, তবে তখন এখানে অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ধনীর বাস ছিল। তখনকার লোক কাহারও দুঃখ দেখিলে তাহার সাহায্য করিতে তৎপর হইত, যাহাতে তাহার উপকার হয়, তাহার চেষ্টা করিত; মোটের উপর তখন লোক এখনকার মত ধর্ম্মহীন, স্বার্থপর ছিল না। রামপ্রসাদ কয়েকজন লোককে আপনার দুঃখকাহিনী জ্ঞাপন করিবার পর, অতি সত্বরই একটী চাকরী পাইলেন। নবরঙ্গকুলাধিপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের অধীনে তাঁহার একটী মুহুরীগিরি চাকরী হইল।* রামপ্রসাদ জননীর আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া ইহাতে আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। রামপ্রসাদ সেইদিন হইতেই তাঁহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং কর্য্যোপযোগী হিসাব নিকাশের খাতাপত্র, কাগজ কলম ইত্যাদি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বাসস্থানের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহও নির্দিষ্ট হইল।

দারুণ অভাবের কথঞ্চিৎ পূরণ হইলে, লোক স্বভাবতঃই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! বিশষতঃ দুরন্ত অভাবগ্রস্ত রামপ্রসাদ বিনায়াসে এইরূপে অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, পূর্ণানন্দময়ী ভগবতীর চরণে কোটী প্রণাম করিলেন।

* কেহ কেহ বলেন—তিনি দেওয়ান গোলকচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের ভবনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না।

এই নির্বান্ধব পুরী, অপরিচিত স্থান কলিকাতায় এত সত্বর যে তাঁহার চাকরী মিলিবে, এরূপ আশা তিনি করিতে পারেন নাই। অথবা তাঁহার আবার বন্ধুহীন স্থান কোথায়? ব্রহ্মময়ী মা যাঁহার সহায়—যাঁহার দুঃখ-দৈন্য নাশের জন্য তিনি সতত বিব্রত, তাহার আবার সামান্য দাসত্বের অভাব কি? আর তাহা সংগ্রহের জন্য বন্ধুই বা না মিলিবে কেন? যাহা হউক, রামপ্রসাদ মনের আনন্দে সে দিন সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না। রাত্রি জাগরণ করিয়া কেবল মাতৃ নামামৃত পানে বিভোর হইলেন; তাঁহার পদে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপকস্বরূপ গান করিয়া কহিলেন:—

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো-মা পেতে পারি!
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই ল'য়ে আমি মরি!
ওদের মত পদ পাইতো, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি॥

যতদূর জানা গিয়াছে—এইটীই সাধক কবি রামপ্রসাদের সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীত। তখন লোকে এখনকার মত টাকার মুখ দেখিতে পাইত না। রামপ্রসাদ একেবারে ৩০৲ টাকা বেতনের চাকরী পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার আরাধ্যা দেবী মাকেই বলিতেছেন,—"মা! আমি নিমকহারাম নহি।" তিনি জানিতেন,—এ বিষয় আশয় দুর্গাচরণ মিত্রের হউক, আর যাহারই হউক, মূলে কিন্তু আমার মায়েরই সব, তাঁহারা কেবল রক্ষক মাত্র। এই জন্য তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল—যখন অভাব হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই পূরণ হইবে। সেই জন্য তিনি অধৈর্য্য হইয়া অভাব পূরণের জন্য সাধারণ লোকের মত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার বিরহিত হন নাই। এই সঙ্গীতই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রামপ্রসাদ সেইদিন হইতে তাঁহার হিসাব নিকাশের খাতায়ই আপনার রচিত সঙ্গীতগুলি লিখিয়া রাখিতেন, সেই খাতার হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে কত কালী, দুর্গা, তারা, নাম লিখিত হইত। এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল।

একদিন তাঁহার কোন উপরিতন কর্ম্মচারী কোনও মহাজনকে টাকা দিবার গোলমাল হওয়ায়, রামপ্রসাদের খাতার সহিত মিল করিতে আসিলেন। রামপ্রসাদ তখন কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন। কর্ম্মচারী হিসাবের খাতায় প্রসাদের ব্যভিচার দেখিয়া বড়ই রুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই খাতা প্রভুর নিকট হাজির করিলেন।

জানি না, ভগবান্ কাহাকে কোন পন্থা দিয়া কোথায় লইয়া তাহার সৌভাগ্যের বিধান করেন। কোন দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যে মানব-ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? রামপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহাতে সকলেরই প্রতীতি হইল যে রামপ্রসাদের অদৃষ্ট-গগন পুনরায় কুয়াসাসমাচ্ছন্ন হইবে, প্রভুর নিকট এই অপরাধে তাঁহার চাকরী যাইবে, প্রসাদকে আবার ভাগ্যচক্রের দারুণ নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইবে। কিন্তু অঘটন-ঘটনপটীয়সী বিশ্বজননী যাহার সহায়, তাহাকে অপদস্থ, অপমানিত করে বা তাহার অনিষ্ট করে, জগতে এমন সাধ্য কার! এই ঘটনাই প্রসাদের জীবন-স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। এইদিন হইতে প্রসাদের সাংসারিক সকল চিন্তার অবসান হইল। স্বর্গীয় দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয় ধার্ম্মিক, গুণগ্রাহী এবং অমায়িক প্রকৃতিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। খাতায় প্রসাদের এই সকল লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া তিনি বুঝিলেন—প্রসাদ কিরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক, এরূপ মহাত্মাকে এই সামান্য দাসত্বে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার ইহ-জীবন নষ্ট করা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহাতে আমাকেই পতিত হইয়া ভগবানের নিকট দায়ী হইতে হইবে।

জীবের বাল্য জীবনের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার জীবনের গতি কোন দিকে ধাবিত হইবে, সে কিরূপ ভাবে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারক হইবে? রামপ্রসাদের রচিত সঙ্গীতগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াই গুণগ্রাহী মিত্র মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, রামপ্রসাদের অমূল্য জীবন-স্রোত কোন্‌দিকে একটানা বহিয়াছে। দৈনিক হিসাব নিকাশ করা বা সাংসারিক কাজকর্ম্মে জড়ীভূত থাকা অপেক্ষা ইহা মানবজীবনের কত উচ্চতর কার্য্য সাধনের উপযুক্ত। ধার্ম্মিক দুর্গাচরণ সেই দিনই প্রসাদকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার দাসত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। রামপ্রসাদ বিনয়নম্র বচনে আপনার সাংসারিক অভাবের বিষয় মিত্র মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিলেন। খাতায় তিনি হিসাবের পরিবর্ত্তে যে মাতৃ-নামে পরিপূর্ণ করিয়া খাতা নষ্ট করিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার উপরিতন

কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রভুর নিকট আনীত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়াও তিনি কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি ধীর অথচ বিনীত ভাবে সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ করিলেন। মিত্র মহাশয় আজ এক বৎসরকাল প্রসাদের ন্যায় ভক্তবীরকে প্রতিপালন করিয়া নিজকে সৌভাগ্যশালী মনে করিলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন—"রামপ্রসাদ! তোমাকে শবৃত্তিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আমার আর ইচ্ছা নাই; তোমার ন্যায় মাতৃভক্ত সাধককে আমার ন্যায় হীনব্যক্তি কখনও অধীনস্থ করিয়া রাখিতে পারে না; তোমার জীবন মানবের অধীনতার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, যাও বৎস! অনিত্য সংসার, চিন্তায় আকুল না হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ কর; আমি মাসিক তোমাকে যে ৩০৲ টাকা বেতন দিতাম, এখন হইতে ঐ ত্রিশ টাকা বেতন হিসাবে না দিয়া বৃত্তি হিসাবে প্রতিমাসেই আমি আজীবন তোমাকে প্রদান করিব। আমার এই যৎসামান্য মাসিক বৃত্তি স্বীকার করিয়া তুমি আমাকে চরিতার্থ কর। প্রসাদ! তুমি যে কাজের উপযুক্ত, যে মহৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য তোমার জন্ম, জগতে যে মহৎ পদবী লাভের জন্য তুমি উৎকণ্ঠিত, সে পদলাভ মনুষ্যমাত্রেরই লোভনীয়, তাহা হইতে তোমাকে বঞ্চিত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে—যাও বৎস! মনের আনন্দে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়া জীবন সার্থক কর।" এই বলিয়া মিত্র মহাশয় রামপ্রসাদকে বিদায় প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ বসিয়া বসিয়া মায়ের ভাবনা ভাবিতেছিলেন—এক্ষণে মিত্র মহাশয়ের সদাশয়তার কথা শুনিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। তখন তিনি দেখিতে লাগিলেন—আমার ঘরেই ত চিন্তামণি নিধি; তবে কেন অনিত্য ধনের জন্য দেশ বিদেশে ঘুরিয়া মরি; ভিতর অন্বেষণ করিলেই ত' পাওয়া যায়, এই বলিয়া গান করিলেন :—

"মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে॥

অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস নারে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও, রাখবে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা* পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি অভয় চরণ পাবার আশে।"

* যাহা জপিবার নহে অর্থাৎ অনায়াসে জপা যায়। স্বাভাবিক শ্বাস'প্রশ্বাস বহির্গমন ও প্রবেশ দ্বারা 'হং সঃ' ইত্যাকার মন্ত্র জপ।

মিত্র মহাশয় প্রসাদের এই অমৃতোপম সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং সেইদিন তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া নূতন বস্ত্রাদি দান করিলেন ও উপযুক্ত পাথেয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদ আর কালবিলম্ব না করিয়া বিবিধ প্রকারে মিত্র মহাশয়কে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সেই দিনই বিদায় হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আদ্যভাব ও সাধনারম্ভ

মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যই হয় না—ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা না হইলে জীবের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি অনুসারে তিনি যাহাকে যেরূপভাবে পরিচালিত করেন—এই কর্ম্মক্ষেত্রে সে সেইরূপ ভাবেই পরিচালিত হয়। সেইরূপ ভাবে কর্ম্ম করাইলে সুখ্যাতির অখ্যাতির ফলভাগী হইয়া থাকে। কেহ বা এই মায়াময় সংসারে চৈতন্য লাভ করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করে, আবার কেহ চৈতন্যকে মায়ামোহে আচ্ছন্ন করিয়া ক্রমশঃ নরকের অভিমুখে ধাবিত হয়, অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে মায়া তাহাকে যেমন কার্য্য করায়, সে সেইরূপ কাজ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করে। তবে এই কর্ম্মক্ষেত্রে কেহই কর্ম্মহীন হইয়া থাকিতে পারে না—কর্ম্ম ছাড়া জগতে অন্য কিছু নাই। কেহ বা বিষ্ঠা পরিষ্কার করিতেছে, কেহ বা দেব-সেবা করিতেছে। কার্য্য উভয়েই করিতেছে—তবে ভাল আর মন্দ। দেব সেবা করিয়া কেহ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছে, অপরে বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া সকলের নিকট ঘৃণিত হইতেছে। এইখানেই অদৃষ্ট, এইখানেই পূর্ব্বজন্ম—এইখানেই জীব কর্ম্মের অধীন, এই কর্ম্ম যিনি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন—জীব সম্পূর্ণ ভাবে তাহারই অধীন হইতেছে। এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল, শক্তি ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। যে যেমন কর্ম্মশক্তি লইয়া জন্মিয়াছে, মা তাহাকে সেইরূপ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া দেন।

সাধন-মার্গে অসীম শক্তিমন্ত রামপ্রসাদ মায়ার বশীভূত হইয়া কয়েকদিন নাক-ফোড়া বলদের মত তীব্র অশান্তির বশে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় চৈতন্যহীন হন নাই। মায়ার দাসানুদাস না হইয়া,

তাঁহাকে চৈতন্যের বশীভূত করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন—তাই বাসনার জলন্ত অনলে তাঁহাকে দগ্ধীভূত হইতে হয় নাই, চৈতন্যময়ীর চৈতন্যে তিনি সদাই প্রবুদ্ধ ছিলেন। মায়া ত্যাগ জীবের উদ্দেশ্য নয়, তাঁহাকে বশীভূত করাই উদ্দেশ্য এবং তাহাই যথার্থ বীরের কার্য্য। বীর সাধক রামপ্রসাদ মায়াকে জয় করিয়াছিলেন, সংসারী হইয়া যেটুকু আবশ্যক, সেইটুকু লইয়া মাতৃপদে নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়াই এত শীঘ্র তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল।

তখনকার দিনে মাসিক ত্রিশ টাকা একস্থান হইতে প্রাপ্ত হইলে কোন চিন্তাই থাকিত না। বদান্যবর দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের নিকট মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া রামপ্রসাদ সংসার-চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহার ঈশ্বর-প্রেম-পিপাসু মনচকোর অধীনতা শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে পরমানন্দে বিভোর হইল। তিনি কলিকাতা হইতে পুনরায় বাটী আসিলেন। জননীকে আপন সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। জননী ও পত্নী এই সুসংবাদ শ্রবণে যারপরনাই আনন্দলাভ করিলেন।

রামপ্রসাদ জীবনের প্রথম সোপান হইতেই সাধনানুরক্ত এবং বিষয়স্পৃহাশূন্য ছিলেন, এইজন্য সংসারের কোন কাজ কর্ম্মই তিনি ভালরূপ সম্পাদন করিতে পারিতেন না; আবশ্যক হইলে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন বটে, কিন্তু বেশ পরিপক্কের ন্যায় তাহা নির্ব্বাহিত করিতে পারিতেন না। সেইজন্য জননী সিদ্ধেশ্বরী তাঁহাকে সংসারের কোন কার্য্য করিতে দিতেন না, টাকা আসিলেই তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সংসারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। রামপ্রসাদ নিজের সাধন ভজন লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি দেশে আসিয়া পঞ্চমুণ্ডীর* আসন প্রস্তুত করিলেন। তন্ত্রের নিয়মানুসারে ঘোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে গুরুদেবের নিকট তিনি যোগের প্রণালী সকল শিক্ষা করিয়া কতক কতক অভ্যাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ সকল বিধিমতে কার্য্যের প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অনন্যকর্ম্মা হইয়া একান্ত মনে প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ কাল সাধকবীর রামপ্রসাদ বীরাচার অনুসারে সাধনা করিয়া মায়ের কৃপায়, সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহাকে অপর সকলের ন্যায় কষ্ট স্বীকার বা বিফল মনোরথ হইতে হয় নাই।

রামপ্রসাদের মহত্ত্ব এইবার চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। রামপ্রসাদ যে এখন একজন যথার্থ মহাপুরুষ তাহা তাঁহার শরীরাকৃতি ও অঙ্গ-

* সর্প, ভেক, শশ, শৃগাল ও নরমুণ্ডে রচিত হয়: কোথাও কোথাও পঞ্চ জাতীয় নৃমুণ্ডতেই রচিত হইয়া থাকে।

জ্যোতিতেই বুঝিতে পারা যায়। কি এক অব্যক্ত পূর্ণজ্যোতি, কেমন এক আনন্দময় মুখভঙ্গি দেখিলেই মন যেন স্বভাবতঃই তাঁহার নিকট নম্রতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইহা ব্যতীত যিনি তাঁহার সহিত একবার বাক্যালাপ করিয়াছেন, তিনি ত' কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে। রামপ্রসাদের বাঁহাড়ম্বর কিছুই ছিল না। যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ, যথার্থ সাধক হইলেও তাঁহার দেবদ্বিজে ভক্তি, পিতৃ মাতৃ ভক্তি, নিষ্ঠাবর্ত্তিতা, সৌম্যতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপৌরুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, সরলতা, কারুণ্য এবং প্রশান্তি প্রভৃতি গুণ বর্ত্তমান থাকিবে—এই সকল সাধকের লক্ষণ; এইরূপে চিত্ত শুদ্ধি করত শমদমাদি গুণে বিভূষিত হইয়া আত্মাশক্তির উপাসনার নামই শক্তি-সাধনা। চিত্ত শুদ্ধি করিতে হইলে উপরোক্ত গুণ সকলের সম্যক্ স্ফুরণ একান্ত আবশ্যক। আমাদের বিধি-বিধান-কর্ত্তা আর্য্য ঋষিগণ সকলেই সংসারী ছিলেন, সংসারে স্ত্রীপুত্র পরিজন লইয়া, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিলেই বীরত্ব এবং তাহাই উগ্রবীর্য্য বীর সাধকের একমাত্র করণীয়। তৈল এবং জল যেমন একত্রে থাকিয়া মিশ্রিত হয় না—সংসারে বীর সাধকগণও তদ্রূপ কামিনী-কাঞ্চনে জড়ীভূত থাকিয়াও অমিশ্রিত ভাবে আপনার গন্তব্য পথে ধাবিত হন। নবপ্রসূতা গাভী যেমন তৃণ, চনকাদি ভক্ষণ করে অথচ তাহার চিত্ত যেমন সতত বৎসের প্রতি ন্যস্ত, সংসারী সাধকগণ তদ্রূপ ভগবানে চিত্তার্পিত রাখিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন। জনকাদি রাজর্ষিগণ এইরূপে রাজ্য-পালন-রূপ মহা গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ঋষিপদ লাভ করিয়াছিলেন। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ পরম ভাগবত ভগবানের অংশাবতার শুকদেব গোস্বামীকেও তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ আত্মতত্ত্বে জাগ্রত ও সংসার কার্য্যে নিদ্রিতের ন্যায় কালাতিপাত করিতেন। রামপ্রসাদ কুলাচার অনুসারে প্রতি অমানিশায় মহাকালিকা মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহার পূজা করিতেন—পঞ্চতত্ত্বে অনুরক্ত হইয়া তিনি পরম তত্ত্বময়ী কালিকার উপাসনায় রত হইতেন। পঞ্চমকার দ্বারা অসীম শক্তিমন্ত হইয়া তিনি কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করত ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

মানুষ চিরকালই অপূর্ণ, তাই পূর্ণতা লাভের জন্য সে অনবরত শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত; রামপ্রসাদ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি অহরহঃ শক্তি আরাধনায় প্রাণপাত করিতেন, দিবা অপেক্ষা রজনীতে তাহার কার্য্য অধিক পরিমাণে সিদ্ধ হইত এবং পূজাদির সময়ে অমানিশা, মঙ্গল, শুক্রবার প্রভৃতি তান্ত্রিক তিথিতে তিনি প্রগাঢ় ভক্তিভরে অজস্র সঙ্গীত রচনা করিয়া দেবীকে প্রসন্না করিতেন।

সঙ্গীতই তাঁহার সাধন সিদ্ধির মূল। ভক্তি বই সিদ্ধিলাভের উপায় নাই। কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে জ্ঞান লাভ হইলে, তবে ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর উপলব্ধি হয়, কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান সঞ্চার হইলে, তবে তাহাতে ভক্তিভাব পরিবর্ত্তিত হয়, ভক্তি, হইলেই তাঁহাকে সম্যক প্রকারে জানা যায়, ইহাই বিজ্ঞান। ভক্তির উচ্চ ভাবই প্রেম, প্রেম ও ভক্তির চক্ষে যাহাকে একবার দেখা যায়, তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে কি অধিক কষ্ট করিতে হয়? এইজন্য ভক্তির বলে ভগবতীর আশ্রিত হইলে তাঁহার ক্রোড় অনায়াসলব্ধ, ভক্তকে—প্রেমিককে প্রেমময়ী মা আমার চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন না। প্রসাদের সাধনা ভক্তিমূলা, প্রেম তাঁহার সাধনার প্রধান অঙ্গ, এইজন্য তিনি সদাসর্ব্বদা বলিতেন—"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।" এই প্রেম-ভক্তির একনিষ্ঠ বীর রামপ্রসাদকে তাই জগজ্জননী একদণ্ড চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। অনেক কার্য্যে আবশ্যক হইলে তিনি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সাহায্য করিতেন। এরূপ সাধনবল যে বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল—তাহার আর সন্দেহ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কবিত্বের স্ফুরণ

মন সংসার-চিন্তা-বিরহিত না হইলে ধর্ম্মকর্ম্মে উন্নতি হয় না। হৃদয়ের প্রশস্ততা ও উদারতা লাভ করিতে হইলে মনকে অগ্রে স্বাধীন করা চাই, কারণ মনের প্রসন্নতাই সকল প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলীভূত কারণ। এইজন্য প্রসাদ সর্ব্বপ্রথমে মনোজয়ী হইয়া সকল কার্য্যে ও সকল বিষয়েই মায়ের অস্তিত্ব দেখিতেন। জগৎসংসার সমস্তই যে মায়ের, তিনিই যে ইহার একমাত্র কর্ত্রী, তিনি যে মায়ের হুকুমের চাকর মাত্র, তাহা প্রসাদের বেশ জানা ছিল, এইজন্য তিনি তাঁহার আজ্ঞায় কিছুদিন সংসার কার্য্যে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার উন্নতির জন্য মা এক্ষণে সেই সংসারের একপ্রকার উপায় করিয়া দিয়াছেন—তাই প্রসাদ এখন সংসারে থাকিয়াও তাহার সহিত জড়িত নহে; তাঁহার কাজকর্ম্মে, তাঁহার সুখ-দুঃখে এখন আর তিনি মুহ্যমান হন না। এখন তাঁহার চিত্ত স্বাধীনতা লাভে উৎফুল্ল। স্বাধীন মনই কবিত্বশক্তি লাভের উপযুক্ত আধার, স্বাধীন মন যে কবিতাপ্রসূ, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐশ্বরিক ভাবের

ভাবুক না হইলে, নিসর্গের ভাব হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাহার চিন্তা-প্রসূত কবিতা কখনও মধুর হইতে পারে না, এবং তাহার দ্বারা মানবচিত্ত কখনও মুগ্ধ হয় না! কষ্টসাধ্য কবিতা, কবিতাই নহে। প্রসাদের হৃদয় ঈশ্বর-প্রেমে ভরপুর; জগজ্জননীর ভাব-সাগরের ভাবুক প্রসাদের কবিতা বা সঙ্গীত যেরূপ হউক না কেন, তাহা যে সাধারণের প্রিয় হইবে তাহাতে আর সংশয় আছে কি? প্রসাদ দেশ, কাল. ভাব-নির্ব্বিশেষে অহোরাত্র সঙ্গীত রচনা করিয়া আপনি মুগ্ধ হইতেন এবং তাঁহার প্রাণময়ী মাকে মুগ্ধ করিতেন। সাধারণে তাহা দ্বারা মোহিত হইবে কি না, সাধারণের নিকট তাহার আদর হইবে কিনা—সে বিষয়ে তিনি তত গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু জগতের মনঃ-স্বরূপিণী মা যাহাতে মুগ্ধ হইতেন, জগতের মন তাহাতে আকৃষ্ট বা মোহিত হওয়ায় বিচিত্রতা কি? এইজন্য প্রসাদের গান, তাঁহার নিজস্ব সুরে সংযোজিত গীতাবলী হিন্দুর নিকট এত প্রাণারাম—এত মনোমদ।

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের ভেদজ্ঞান ছিল না। আজকাল শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি সাধকগণে যেমন দ্বেষা-দ্বেষী ভাব, প্রসাদের হৃদয় সে ভাবে পূর্ণ ছিল না। তিনি কালী-কৃষ্ণে কোন প্রভেদ দেখিতেন না। তান্ত্রিক সাধক রামপ্রসাদ অহরহঃ গাহিতেন,—"শ্যামা হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে।"

তিনি আরও গাহিতেন,—

"মন করোনা দ্বেষা-দ্বেষী।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ তালাসি।
ঐ যে কালী, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণ-বিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা যে গোকুল নিবাসী॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দৈতোর হাসী।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥"

রামপ্রসাদ প্রথমে সাকারবাদী ছিলেন, তৎপরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

কিন্তু তিনি প্রথম জড়োপাসক অবস্থায় বহুতর সঙ্গীত রচনা করিয়া সাকার-সাধনার প্রশংসা করিয়াছেন। মূর্ত্তিপূজা ও বলিদান সম্বন্ধে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট যাহা অকপট-হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পরে প্রকাশ করিব।

এই সময়ে রামপ্রসাদের নাম দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কুমারহট্টে কৃষ্ণনগরাধিপের জমীদারী ছিল; তিনি অধিকাংশ সময়ে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একজন বিশিষ্ট তান্ত্রিক ছিলেন।

তিনি প্রসাদের গুণ-গরিমা এবং সাধন-পথে উন্নতির কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার শক্তি-ভক্তি, সিদ্ধি-ঋদ্ধির বিষয় বুঝিতে পারিয়া এবং তাঁহাকে বিষয়-বাসনা-বিহীন, কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন মহা-ভাবুক বুঝিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন।

নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে অযাচিত ভাবে সাহায্য করিতেন এবং এইরূপ ব্যক্তিকে সভাসদ করিয়া ধন্য হইতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তিনিও এইরূপ ভারতচন্দ্র, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতিকে লইয়া পঞ্চরত্নের সভা করিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভা ও কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্নের সভা চির প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণচন্দ্র সাধকচূড়ামণি আগমবাগীশকে গুরু পদে বরণ করিয়া সভার প্রধান রত্ন মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার আদি-রসের কবি ভারতচন্দ্রকেও তিনি অযাচিত ভাবে তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ 'রায়গুণাকর' উপাধি ও ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া নিজ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদকেও মহারাজ ঐরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রথমে প্রকারান্তরে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদকে তিনি প্রলোভিত করিতে পারেন নাই। প্রসাদ জাগতিক সমস্ত প্রলোভনের অতীত হইয়াছিলেন। কাহার সাধ্য যে আর তাঁহাকে বিষয়-বৈভবে মুগ্ধ করিয়া অধীনতা স্বীকার করায়? প্রসাদের মন যে প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার জন্য ব্যস্ত, যাহার অধীনতা স্বীকারের জন্য যে চরণ-পদ্মের মকরন্দ পানের জন্য তাঁহার মন-ভৃঙ্গ সতত লোলুপ, সতত তৃষিত, পিপাসিত, এই নশ্বর জগতে এমন কি বস্তু আছে যে প্রসাদের সেই প্রাণের, সেই মরমের পিপাসার শান্তি করিতে পারে? যে শির তিনি ব্রহ্মময়ীর পদতলে বিক্রয় করিয়া দাসানুদাস হইয়াছেন, সে শির কি আর জগতের কাহারও নিকট নমিত করিয়া অধীনতা স্বীকার করিতে পারে? রামপ্রসাদ কিছুতেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় স্বীকৃত হইলেন না।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুণের আদর করিতে জানিতেন। কবি ও বিদ্বানের উৎসাহদাতা কৃষ্ণচন্দ্র সাধক-কবির এই প্রত্যাখ্যানে রুষ্ট না হইয়া বরং অধিকতর তুষ্ট হইলেন। তিনি রামপ্রসাদকে গুণের পুরস্কার স্বরূপ একশত নিষ্কর ভূসম্পত্তি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়া আপনার বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি নিজ-প্রদত্ত দানপত্রে—"তুমি এই সকল সম্পত্তি অদ্য হইতে সুস্থশরীরে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল করিতে থাক।" এইরূপ লিখিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে কলিকাতার সদাশয় বদান্যবর দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের মাসিক ত্রিশ টাকা এবং এক্ষণে ধার্ম্মিকের বন্ধু, মহামনা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত এক শত বিঘা নিষ্কর জমীর আয় নির্লোভ রামপ্রসাদ অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিলেন। বেশী ধনের আকাঙ্ক্ষা তিনি করেন না, তথাপি মা তাঁহাকে মিলাইয়া দিতেছেন। ইহা ছাড়া প্রসাদের আরও ধনাগমের উপায় হইয়াছিল। তাঁহার রচিত কবিতা ও সঙ্গীত অতি মধুর; কাহারও সঙ্গীত কিম্বা কবিতার আবশ্যক হইলে রামপ্রসাদের নিকট লিখিয়া লইত; প্রসাদ তাহার বিনিময়ে কিছু লইতেন না; তথাপি তাহারা কালীমায়ের প্রণামী বলিয়া অনেকেই কিছু কিছু প্রদান করিত। নিষেধ করিলেও কেহ তাহা শুনিত না। এইরূপ আয়ের আধিক্য দেখিয়া তিনিও মুক্তহস্ত হইলেন। দীন-দরিদ্রকে ডাকিয়া ডাকিয়া তিনি ঐ সকল অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জননী ও স্ত্রীপুত্রগণও তখন সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন—দরিদ্রতাই যথার্থ উন্নতির মূল। আমরা দরিদ্র ছিলাম বলিয়াই ত' মা আমাদিগকে অর্থ দিয়াছেন; তবে এ অর্থ সঞ্চয়ের আবশ্যক কি? সঞ্চয়ে সুখ নহে—সুখ ত্যাগে। ধর্ম্ম-চিন্তা ছাড়িয়া কেবল অর্থ-চিন্তা এ পবিত্র জীবনের উদ্দেশ্য নহে।

প্রসাদ জগতে এক মা ভিন্ন আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, তথাপি রাজার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর" নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। আর একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের নিকটও ঐরূপ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র কবি ও পণ্ডিত, কিন্তু মহারাজ বলিলেন—তুমি আদি রসের কিছুই বুঝ না। এই কথায় তাঁহার হৃদয় ক্লেশ অনুভব করিল—এবং সেই জন্যই "বিদ্যাসুন্দরের" সৃষ্টি। প্রবাদ আছে—ভারতচন্দ্র পুস্তকের কপিখানি রচনা করিয়া একখানি থালার উপরে করিয়া নিজ কন্যার দ্বারা মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন—"মা! রাজা যদি জিজ্ঞাসা করেন পুস্তক-

খানি থালার উপর কেন, তাহা হইলে বলিও, ইহা রস পরিপূর্ণ,—পাছে গড়াইয়া পরে তাই থালায় করিয়া আনিয়াছি।”

কবিরঞ্জনের কাব্যে ও রায় গুণাকরের কাব্যে অনেক প্রভেদ। কবিরঞ্জন এই কাব্য ভারতচন্দ্রের কিছুদিন পরে রচনা করিয়াছিলেন এবং এ রচনায় আপনার রুচি ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তিনি কেবল রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তাঁহারই তুষ্টিসম্পাদন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সাধক কবি রামপ্রসাদের কবিত্ববীণার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল—স্বর্গীয় দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে, আর এক্ষণে তাহা কল্পপাদপ রূপে পরিণত হইয়া ফল ফুলে লোকের চিত্ত রঞ্জন করিতে লাগিল—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জলসেচনে রামপ্রসাদের কবিত্ব কল্পপাদপে তাই একে একে—কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শিব সংকীর্ত্তন প্রভৃতি কাব্যপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়া সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়াছিল। এই কয়খানি পুস্তক ব্যতীত প্রসাদের কাব্য-সংগ্রহ নামে আরও একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহার সঙ্গীত কাব্য—“কালী-কীর্ত্তন”। শাক্ত ভক্তের প্রাণের এই প্রেম-ভক্তি ভাবময় সঙ্গীত যে সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? যিনি মায়ের নামে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি আজীবন কালীমার সাধনভজনকেই জীবনের সার সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছেন শ্যামাসঙ্গীতের সম্মোহন তানে যাঁহার হৃদয় ক্ষেত্র সদা ভরপুর, তাঁহার “কালীকীর্ত্তন” সকলের শ্রেষ্ঠ না হইলে আর কাহার হইবে? রামপ্রসাদ কখন কাগজে কলমে সঙ্গীত রচনা করেন নাই অর্থাৎ তিনি ইহার একটীও লিখিয়া রাখিতেন না, তবে তিনি যে অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কেবলমাত্র তাঁহার সঙ্গীতের একস্থানে আভাস পাওয়া যায়; যথা—“লাখ উকীল করেছি খাড়া” ইহাতেই বুঝা যায় তিনি এক লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার শতাংশের এক অংশও সংগ্রহ করা সুকঠিন। তিনি যশস্বী হইবার জন্য এ সকল করিতেন না। নিত্য নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি ইষ্ট সাধনা করিতেন। যেন কি ভাবে প্রাণ মাতিয়া উঠিত, হৃদয়ে যে সময়ে যে ভাবের উচ্ছ্বাস হইত, প্রসাদ সেই সময়ে সেইভাবেই সঙ্গীত রচনা করিয়া ব্রহ্মময়ীর তুষ্টি সম্পাদন করিতেন। কখনও মাতা পুত্রে কলহের ভাব, কখনও জননীর প্রতি রুক্ষ ভাব প্রদর্শন করিয়া গান বাঁধিতেন। তাঁহার সাধনার কোন স্থানে তোষামোদ বা দীনতার ভাব পরিলক্ষিত হয় না। জননীর প্রসাদ লাভে প্রসাদ বীরত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সদাই বলিতেন—“এবার আমি বুঝবো হরে, মায়ের ধরবো চরণ লব জোরে” সঙ্গীতের ভাষা ভাল

হইল কি মন্দ হইল—তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইত না।—তিনি অপরাপর বিষয়ে গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা সঙ্গীত রচনারই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন—তাই তিনি বলিতেন,—"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।" গানাৎ পরতরং নহি—প্রসাদ ইহা ভাল বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সাধনা সঙ্গীতেই সমাহিত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অঘটন ঘটনা

রামপ্রসাদের গান অতি সুরস ও সুমিষ্ট এবং ভাষা সরল হইলেও সাতিশয় কবিত্বপূর্ণ। ভাবুক সাধকের অন্তঃস্থল হইতে ভাব-সমুদ্র মথিত করিয়া যাহা উত্থিত হইবে—তাহা যে সকল গুণের আধার এবং মনোমুগ্ধকর হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! পাণ্ডিত্যাভিমান বা গায়কাগ্রগণ্য বলিয়া সাধারণে সুপরিচিত হইবার জন্য ত' আর এ সকল রচিত হইত না! ইহা যে তদ্গত-চিত্ত, মা-ময়-জীবন সাধক-প্রাণের অমিয় ধারা! বাক্যচ্ছটা বা সুরের ঝঙ্কার সমন্বিত সঙ্গীত কি ইহার সমকক্ষ হইতে পারে!

প্রসাদের এই মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পাঠে তাঁহাকে হয়ত অনেকেই একজন সুগায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর তত সুমিষ্ট ছিল না, তথাপি তিনি স্বরচিত সঙ্গীতগুলি এমন নৈপুণ্যের সহিত গাহিতে পারিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিলে মানবের ত' কথাই নাই, নিজের ইষ্টদেবীকেও তিনি তাঁহার গান শুনিবার জন্য প্রলোভিত করিতে পারিতেন।

সত্য সত্যই একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে প্রসাদ স্নান করিতে গিয়াছেন, তাঁহার জননী দাওয়ায় বসিয়া রন্ধন করিতেছেন, এমন সময় একটী অপরূপ রূপবতী কামিনী তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাগা মা! তোমার রামপ্রসাদ কোথা গা? সে-নাকি খুব ভাল গান গাহিতে পারে, বনের পশু পক্ষীও নাকি তার গান শুনে মোহিত হয়? আমি লোকের মুখে শুনে—তাই আজ তার গান শুনতে এলাম, সে কোথা মা?"

প্রসাদ-জননী এই রমণীকে দেখিয়া কোন সম্ভ্রান্ত গৃহের কুলবধূ হইবেন বিবেচনা করিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"মা! রামপ্রসাদ আমার এই এতক্ষণ ছিল, এইবার বেলা অনেক হয়েছে বলে, তাহাকে নাইতে

পাঠিয়েছি। সে এখনি আসবে, তুমি একটু বসো না মা।" এই বলিয়া দাওয়ায় পিড়ি পাতিয়া দিলেন। মরি। মরি! এই না বীর সাধকের বীরত্ব!

স্ত্রীলোকটি আর বসিলেন না, বলিলেন—"মা! আমি আর বসিব না, বেলা অনেক হয়েছে, এখন যাই, তুমি প্রসাদ আসিলে বলিও।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতগতি প্রস্থান করিলেন।

প্রসাদ স্নান করিয়া আসিলে সিদ্ধেশ্বরী সমস্ত বলিলেন। প্রসাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"মা! বেটী বড ফাঁকি দিয়েছে, চল আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। বেটীকে গান শুনাইয়া আসি।" রামপ্রসাদ আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ না করিয়া একতারা হস্তে জননী সহ কাশী গমন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—মা বিশ্বেশ্বরী তাহার গান শুনিবার জন্ত আসিয়াছিলেন, তাই :—

"আমি কবে কাশী যাব।
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব ॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী, স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বোবম্ বম্ ভোলা বলে, নৃত্য করে গাল বাজাবো।'

এই গান গাহিতে গাহিতে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন * এবং অন্নপূর্ণাকে সঙ্গীত শ্রবণ করাইলেন; সমস্ত দেবদেবীকে দর্শন, প্রণাম ও স্তবস্তুতি করিলেন কিন্তু বেণীমাধব দর্শন করিতে ভুলিয়া যাওয়ায় তিনি স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া সঙ্গীত শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তাই প্রসাদ জাগ্রত হইয়া গান করিলেন :

"কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে ॥
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী ॥
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটী, এলোচুল চূড়া বংশীধারী।
আগেতে কুটীল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারী ॥

* কাহারও মুখে শুনা যায এ যাত্রা তাহার কাশী যাওয়া হয় নাই। তিনি জননী সহ রাত্রিকালে কোন গৃহস্থের বাটীর অতিথি হইলে স্বপনে দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইলেন—আর কাশী গমনের আবশ্যক নাই। এইখানেই সঙ্গীত করিতে হইবে—তখন সেইখানেই—"আর কাজ কি আমার যেয়ে কাশী" প্রভৃতি কাশী যাওয়া বিষয়ক কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করত গান করিয়া জননী সহ বাটী প্রত্যাগত হন। প্রসাদ তীর্থাদি ভ্রমণ করিতে তাদৃশ ভালবাসিতেন না। ভ্রমণে সময় নষ্ট হয়—ইহাই তাঁহার মত ॥

এবে নিজ কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারী।
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদুহাস, ভুলে ব্রজকুমারী ॥
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥
প্রসাদ কহিছে, সরসে ভাসিছে জননী মনে বিচারি।
মহা, কাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু একই সকল বুঝিতে নারি ॥"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাম প্রসাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সহবাস অতীব সুখজনক মনে করিতেন। এই জন্য তিনি সময়ে সময়ে তাঁহাকে লইয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে যাইতেন।

তখন নবাবী আমল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সিরাজুদ্দৌলার অধীন, তাঁহাকে বাৎসরিক কর প্রদান করিতে হইত। একবার রাজা প্রসাদকে লইয়াই মুরশিদাবাদ গমন করিয়াছিলেন। তথায় একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রামপ্রসাদ নদীবক্ষে তরুণী আরোহণে পরিভ্রমণ করিতেছেন ও কালীসংকীর্ত্তনে কল্লোলিনীর জলকল্লোল মুখরিত করিতেছেন। সেই অমিয়ময় স্বর-সুধা নদীবক্ষ আপ্লুত করিয়া সমীরণ সহ দিগ্‌দিগন্তে প্রবাহিত হইতেছে। সেই দিন ঘটনাক্রমে নবাব সিরাজুদ্দৌলাও নৌকা যোগে জল-বিহারে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রসাদের ঐ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া নবাবেরও চিত্ত পুলকিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রসাদের নৌকা সমীপে আসিয়া তাঁহাদিগকে নিজ নৌকায় তুলিয়া লইলেন এবং প্রসাদকে গান গাহিতে-আজ্ঞা করিলেন। প্রসাদ নবাবের চিত্তরঞ্জনার্থ কত হিন্দী খেয়াল, ধ্রুপদ, গজল আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নবাব বলিলেন—"তোমার ও সব গান আমি শুনিতে চাই নাই, তুমি নৌকার মধ্যে যে কালী কালী বলিয়া গান করিতেছিলে—ঐ গান গাও।" তৎপরে রামপ্রসাদ চিরাভ্যস্ত শক্তি-সঙ্গীতের অবতারণা করিয়া সিরাজের ন্যায় কঠিন হৃদয় নবাবেরও মন মোহিত করিয়াছিলেন।

পরে মুরশিদাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কয়েকদিন মাত্র রামপ্রসাদ রাজধানী কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় তদীয় গুরুদেব পূজনীয় সাধক চূড়ামণি আগমবাগীশের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এক্ষণে বীরভক্ত আগমবাগীশ মহাশয়ের কিছু পরিচয় আবশ্যক। আগমবাগীশ অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ছিলেন। এ মদ তিনি মদ বলিয়া ধরিতেন না, মায়ের চরণামৃত সুধাই তিনি পান করিতেন। তিনি এ কার্য্য এত গোপনে করিতেন যে, সমাজের লোক তাহা জানিতে পারিত না, তাঁহার কথায় কোন প্রকার জড়তাও পরিলক্ষিত হইত না, মদে তাঁহাকে মাতাল করিতে পারিত না, মদের মাহাত্ম্য সেই

আশৈশব তান্ত্রিক, শ্যামা মায়ের প্রিয় পুত্র সাধক শ্রেষ্ঠ আগমবাগীশের নিকট কিছু প্রকাশ পাইত না, এমন কি তাহার গন্ধ পর্য্যন্ত কেহ অনুভব করিতে পারিত না। শোধিত সুধা তিনি এইরূপভাবে ব্যবহার করিতেন যে, তাহা স্বাস্থ্য নষ্ট না করিয়া বরং তাহার উৎকর্ষ সাধন করিত এবং সাধন পথে শক্তি সঞ্চয়ের বিশেষ সহায়তা করিত।

সে দিন অমাবস্যা, প্রাতঃকালে রাজা সভাসদ্ পরিবৃত হইয়া নানা প্রকার ধর্ম্ম কথায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। দুইজন অসীম শক্তিমন্ত্র সাধক আজ তাঁহার সভায় উপস্থিত ; এরূপ সৌভাগ্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। এমন সময় একজন আসিয়া রাজার কাণে কাণে বলিল—মহারাজ! আজ আপনার গুরু মদ্যপান করিয়াছেন। রাজা কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না—তারপর সেই দিন তিথির কথা লইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব। আজ কি তিথি? আগমবাগীশ তখন সে রাজ্যে নাই, তাহার চিত্তচকোর তখন ভাবময়ীর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছে, কাজেই হঠাৎ মহারাজের কথায় তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ কোন কিছু চিন্তা না করিয়া বলিয়া দিলেন "আজ পূর্ণিমা।" রাজা অবাক হইলেন। তাঁহার বন্ধুর কথায় তখন স্থির বিশ্বাস হইল, গুরু যে মদ্যপান করিয়াছেন—তাহা বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না, তথাপি যদি ভুলক্রমে বলিয়া থাকেন, এই জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরু! আজ কি তিথি? তখনও তিনি এক উত্তর দিলেন। রাজা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি মনের দুঃখে সে দিন তৎক্ষণাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। যে যাহার আবাসে গমন করিল। বলা বাহুল্য সাধক রামপ্রসাদ সেদিন গুরুস্থানীয় আগমবাগীশের গৃহেই অতিথি হইলেন। উভয়ে পূজাদি সমাপন করিবার পর প্রসাদ বলিলেন "প্রভু! আজ আপনি রাজার নিকট একটি ভুল করিয়া আসিয়াছেন। সে রূপ ভুল হইয়াই থাকে কিন্তু রাজা বোধ হয়, তাহার জন্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইবেন। মায়ের নিকট এইবার তাহার সংশোধনের উপায় করিয়া লউন।

আগমবাগীশ বলিলেন—"কি ভুল করিয়াছি, রামপ্রসাদ"! প্রসাদ বলিলেন —"আজ প্রাতঃকালে রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'আজিকার তিথিটা কি' আপনি "পূর্ণিমা' বলিয়া দিয়াছেন কিন্তু আজ অমাবস্যা"। রামপ্রসাদ ইহা স্মরণ না করিয়া দিলে আজ তাঁহাকে হয়ত বৈকালে রাজসভায় অপ্রস্তুত হইতে হইত। যেন কতই ভীত হইয়া সাধকপ্রবর পুনরায় মায়ের নিকট গমন করিয়া তন্ময় ভাবে দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন

—"বৎস! যাও কোন চিন্তা নাই। রাজা যদি জিজ্ঞাসা করেন—এরূপ হইল কেন, তাহা হইলে তুমি বলিও, তুমি তাহার প্রাণের পুত্র রামপ্রসাদকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছ বলিয়াই, তোমার এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে। সেই সৌভাগ্যের ফলে আজ আমি তোমাকে এই অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্রের উদয় দর্শন করাইব। ইহা দেবীর আদেশ। সাধারণের পক্ষে আজ অমাবস্যা বটে?"

আগমবাগীশ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে দেবী-চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে বলিলেন—"অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী মা আমার; ঐ দেখ আমার ভুলে তোমার প্রিয়পুত্র প্রসাদের অন্তরে কিরূপ ভীতির সঞ্চার হইয়াছে, পাছে আমাকে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, এই সামান্য ভ্রমের জন্য পাছে আমি রাজার নিকট অপমানিত হই তাহা হইলে ত' তোমার সকল ভক্তেরই মাথা হেঁট হইবে। আচ্ছা মা! আজ কিরূপে আমাদের মান রক্ষা করিবে?" এইবার আগমবাগীশের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি অদ্ভুত প্রভাজাল বিস্তার করিয়া গৃহ আলোকিত করিয়া ফেলিলেন। গুরু শিষ্যে মাতৃ-চরণে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করত আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। বাজীকরের কন্যার বাজীকরণে দুইটি সাধকপুত্রের বাহ্যিক চৈতন্য বিলুপ্ত হইল, তাঁহারা শুনিতে পাইলেন "আমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘের অন্তরালে থাকিয়া নিজ হস্তের কঙ্কণ উত্তোলন করিব, তোরা প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিয়া পূর্ণচন্দ্ররূপে তাহা দর্শন করিবি।" সাধকদ্বয় প্রেমগদ্‌গদকণ্ঠে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করত বলিলেন—"জয় মা ভক্তবৎসলা! কৃষ্ণচন্দ্র! ধন্য আজ তুই—তোর মনস্তুষ্টির জন্য আজ ত্রিলোকেশ্বরী জগদম্বা অঘটন ঘটাইবেন।"

ভক্তদ্বয় পুলকিতচিত্তে আহারাদি করিয়া পুনরায় রাজসভায় গমন করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রও আজ বিষাদিত চিত্তে সভাসীন হইয়াছেন, মনে যেন কি এক দারুণ চিন্তার উদয় হইয়া মহারাজের মুখভাব বিকৃত করিয়াছে, মহারাজের মনে সেই প্রাতঃকালের চিন্তা! সেই তিথি জিজ্ঞাসার কথা! তবে কি আমার গুরুদেব মাতাল! তখন সমাজে মদের প্রতি বড়ই জাতক্রোধ ছিল। মাতালকে কেহ কাছে বসিতে দিত না। কিন্তু আগমবাগীশ যে প্রকার মদ খাইতেন, সে মদে তাঁহার চিত্ত আনন্দময় করিত, কৃষ্ণচন্দ্র সে মদের মহিমা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। এ মদের নেশা একবার ধরিলে যে জগতের সকল নেশা ছুটিয়া যায়, মানুষ যে দেবত্বে উন্নীত হইতে পারে! রাজা সভায় আসিলেন এবং গুরুদেবকে সভাস্থ দেখিয়া মনে করিলেন—এইবার আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন। এখন ত' আর নেশা নাই। কৃষ্ণচন্দ্র জানেন না যে, ইঁহারা সদাসর্ব্বদাই নেশায় বিভোর, এ নেশা যে একবার করিতে

শিখিয়াছে—চির-জীবনে তাহার নেশা আর ছুটে না, আশা মিটে না। মানব-জীবন ধন্য করিয়া তবে তাহার অবসান হয়।

রাজা সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরুদেব আজ একবার পঞ্জিকা দেখুন ত' কি তিথির ও নক্ষত্রের প্রকোপ চলিতেছে।"

আগমবাগীশ সেই একই সুরে বলিলেন—"কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি বারবার আমাকে এত তিথির বিষয় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আজ "পূর্ণিমা" তাহা ত' তোমাকে পূর্ব্বে দুই তিন বার বলিয়াছি, তথাপি ক্রমাগত বিরক্ত করিতেছ কেন।" রামপ্রসাদ অন্তরাল হইতে গুরুশিষ্যের কলহ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যোড়হস্তে বলিলেন—"গুরো! পঞ্জিকায় লিখিতেছে, আজ সমস্ত দিবারাত্র অমাবস্যা।"

আগমবাগীশ মাতৃবলে বলিয়ান্—এজগতে এখন তাঁহার অসাধ্য কি আছে? তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন—"পঞ্জিকা সাধারণের জন্য, তুমি ত' তাহা বল নাই। আমি জানি তুমি অমাবস্যায় উপবাস কর, তাই বলিয়াছিলাম—আজ উপবাস করিতে হইবে না, আজ "পূর্ণিমা" আজ আমি তোমায় পূর্ণচন্দ্র দেখাইব। মায়ের প্রিয় পুত্র প্রসাদের প্রতি তোমার করুণার আধিক্যবশতঃই আজ এই সৌভাগ্যোদয়। সাধারণ লোকের পক্ষে আজ অমাবস্যাই বটে।"

কৃষ্ণচন্দ্রের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। ঐহিক পারত্রিক-নিস্তার-কর্ত্তা ভবার্ণবনাবিক শ্রীগুরুর চরণতলে পড়িয়া বলিলেন—"গুরো! আমি অধম আপনার গূঢ় অভিসন্ধির বিষয় বুঝিতে পারি নাই, আমায় ক্ষমা করুন। এই বলিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হৃদয়ে তিনি প্রদোষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ভক্তত্রয় * সেই ঘোর অমাবস্যার দিন পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় অবলোকন করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিলেন। পাঠক! সাধকের তপোবলের নিকটে কিছুই অসম্ভব নাই। এ জগতে যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজিতা, যাঁহার শক্তিতে জগৎ শক্তিমন্ত—যিনি এই জড় জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত—তাহার শক্তি লাভ করিতে পারিলে মানব করিতে পারে না—এমন কার্য্য কি আছে? সন্ধ্যা সমাগমে এই অভাবনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। এ স্থানে সকলের জানা আবশ্যক যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও একজন সামান্য রাজা ছিলেন না, কেবল ধন সঞ্চয় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। সাধন-বিষয়ে তিনিও সাতিশয়

---

* কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, আগমবাগীশের এই ঘটনার সময় রামপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন না।

উন্নত ছিলেন। নায়িকা-সাধনায় সুসিদ্ধি লাভ করিয়া জগতের অনেক অসাধ্য-সাধনে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর অষ্টপাশ-মুক্ত-সাধক আগমবাগীশের কৃপায় তাঁহার জীবনে এমন একটী অঘটন সংঘটন হইয়া মানবজন্ম সফল হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ত্রিবিধভাব ও পঞ্চ-মকার

রামপ্রসাদ পরদিন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার সিদ্ধাসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ আগমবাগীশের মত শক্তির উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রামপ্রসাদের বাটীর নিকট তাঁহার একটী উদ্যান ছিল—ইহা এখনকার মত প্রমোদ উদ্যান নহে। ঘন সন্নিবিষ্ট ছোট বড় বৃক্ষাদিতে ইহা পরিপূর্ণ; অতিশয় নির্জ্জন স্থান দেখিয়া প্রসাদ তাহারই মধ্যে পঞ্চবটীর বন প্রস্তুত করিয়া তথায় একটী পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রস্তুত ক'রিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার সিদ্ধাসন। এই আসনেই ভক্তবীর শ্রীরামপ্রসাদ বিশ্বজননীকে প্রসন্ন করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি মাতৃমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা, হোম ও জপতপে কালাতিপাত করিতেন। আবশ্যক হইলে গৃহে যাইতেন, নতুবা কেবল মাত্র দুইবেলা দুইবার আহারের সময় ব্যতীত অহোরাত্র এইস্থানেই অবস্থান করিতেন। তাঁহার চক্ষে এই স্থান স্বর্গাদপি গরীয়সী, ইন্দ্রের অমরাবতী অপেক্ষাও ইহা রমণীয় সুষমাসম্পন্ন, ত্রিভুবনে বুঝি এমন স্থান আর নাই; বাস্তবিক ভক্তসাধকের বাসনা চরিতার্থ করিতে ভক্তাধীনা ভগবতী যথায় আবির্ভূতা, সাধকের ভক্তিভরা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রে মূর্ত্তিমতী হইয়া যথাকার মূর্ত্তি মধ্যে তিনি স্বয়ং প্রাণময়ীরূপে প্রতিষ্ঠিতা, ভক্তের প্রাণপণ উদ্বোধনে যেখানে তিনি স্বয়ং উদ্বোধিতা, ভক্ত যখন ইচ্ছা—ডাকিলেই ভক্তাধীনা জননীর সাড়া পায়, প্রাণের কাতর আবেদন জানাইতে পারে, তখন ভক্তের নিকট সেস্থান অপেক্ষা রমণীয় শোকতাপ, অভাব অভিযোগশূন্য দ্বিতীয় স্বর্গ আর কোথায়, থাকিলেই বা তাহা চায় কে? যাঁহাকে লইয়া স্বর্গ, যাঁহার শোভায় স্বর্গের এত পবিত্রতা—এত সৌন্দর্য্য; তিনি যেখানে, স্বর্গের সুখ ও সৌন্দর্য্য ত' সেইখানেই

চিরবিরাজিত, ভক্ত রামপ্রসাদ এই স্বসৃষ্ট স্বর্গে মায়ের চরণতলে বসিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন—ভুলেও কোথাও যাইতেন না। গুরু কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের সাধন-ভজনের উচ্চতা, তাঁহার হৃদয়ের বল, প্রাণের দৃঢ়তা দেখিয়া তৎপ্রাপ্তির জন্য রামপ্রসাদ লোকালয়ে যাতায়াত একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। মহারাজের নিকট হইতে বাটী আসিয়া অবধি, তিনি আপনার সিদ্ধাসনকেই সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান করিয়া লইলেন।

সাধনের জন্য নির্জ্জনতাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। রামপ্রসাদের এই উদ্যান, সে উদ্দেশ্য সাধনের কিছুতেই হীন ছিল না। গ্রামের বালক বালিকা বা অপরাপর জনগণ এ নিবিড় এরণ্ড জঙ্গলপূর্ণ বিস্তৃত উদ্যানে প্রবেশ করিতে সাহস করিতেন না। কাজেই সাধন-ভজনে প্রসাদের পক্ষে এস্থান বিশেষ উপযুক্ত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে কেবল তাঁহার জননী সিদ্ধেশ্বরী আসিয়া প্রসাদের সহিত অবসর ক্রমে দুই একটী সাংসারিক কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার আগমনে সমাধিস্থ রামপ্রসাদ সময়ে সময়ে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রীতিবিহ্বল প্রাণে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতেন, মা মা বলিয়া প্রেমাশ্রুনীরে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত। এইরূপ তন্ময়, এইরূপ বালক ভাবাপন্ন না হইলে, ভাবের ঘোরে এইরূপ ভাবে আপন অস্তিত্ব হারাইতে না পারিলে কি ব্রহ্মময়ীর সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে? প্রসাদ ত' অহরহঃ বলিতেন—"মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে। সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধ'র্ত্তে পারে?" যিনি গোড়া পাকা না করিয়া, কোন প্রকার বিধি-নিষেধের অধীন না হইয়া, উদ্দাম প্রকৃতির বশে সতত বিঘূর্ণিত; অন্ধকার গৃহে অভীষ্ট দ্রব্য লাভের ব্যর্থানুসন্ধানের ন্যায় জগজ্জননীর পাদপদ্ম লাভ, তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। রুদ্রযামাল গ্রন্থে কথিত আছে—

"ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবেন দেবদর্শনম্।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ ভাবাবলম্বনম্॥"

শারীরিক শক্তির দ্বারা জাগতিক অনেক কার্য্য সাধন করা যায়, জড়বস্তু বিষয়ক চিন্তা মানসিক শক্তির দ্বারা সংসাধিত হয় বটে, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের চিন্তায় মায়ের প্রসাদ লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে, এক ভাব ব্যতীত কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। ভাবেই দেব দর্শন, ভাবেই পরম জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতিভেদে ভাবও ত্রিবিধ, যথা—পশুভাব, বীরভাব এবং দিব্যভাব। তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির লোকের সাধনা পশু ও বীরভাবে; তাই গুরু উপদেশ বিহীন নিম্নস্তরের

সাধক মায়ের মূর্ত্তির পানে চাহিয়াই শিহরিয়া উঠে, কঠোরতা ও ভীষণতা দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হয়, কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির দিব্য ভাবাপন্ন সাধক সেই সৌম্য, বরভয়দায়িনী, কৃপাময়ী মূর্ত্তিকে দেখিয়া মুগ্ধান্তঃকরণে চরণতলে লুটিয়া পড়ে কেন? দেখিতেছে ত' সকলেই—কিন্তু তাহার মধ্যে এত পার্থক্য কেন? তুমিও দেখ, ভক্তও দেখে, তবে উপলব্ধি বিষয়ে এত বিভিন্নতা হইবার কারণ কি? তাঁহারা ভক্ত ভাবাবেশে বিভোর হইয়া দেখে, আর তুমি সংসার দাবদাহে, মায়া-মোহে আচ্ছন্ন হইয়া শুষ্ক হৃদয়ে দেখ, তাই তোমার ও তাঁহার দেখায় এত প্রভেদ। ভাবের পক্বতা হেতু এইরূপ হইয়া থাকে। তবে সাধনা করিতে করিতে সে ভাব যে তোমার উপলব্ধি হইবে না তাহা নহে, তুমি মায়ের জন্য ব্যাকুল হইলেই যে মা তোমার জন্য ব্যাকুল হইবেন, তাহার আর বৈচিত্র্য কি? সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে শাস্ত্রবিহিত কার্য্য করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় সংযম ও যোগশিক্ষা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম দ্বারা পশুভাব আয়ত্ত করিতে হইবে, ইহাতে চিত্ত কামগন্ধ শূন্য এবং ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি বিষয়ে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে। তারপর সাধকের বীরভাব আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। ইহার লক্ষণ এই যে, বহুবিধ কাম্যবস্তু সম্মুখে থাকিলেও চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইবে না। নানাবিধ মনোমুগ্ধকর বস্তু সম্মুখে পাইয়াও অনায়াসে লোভহীন অন্তঃকরণে ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া জগতে বিচরণ করিতে পারিবে। পর্ব্বত সমুৎপন্না নদীর অসীম সমুদ্রে আত্ম-সমর্পণের ন্যায় যাহার অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত যাবতীয় বাসনা অনন্ত আত্মাতে বিলীন হয়, কোন প্রকার চাঞ্চল্য থাকে না, তাহার তুল্য আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ আর কে আছে? এরূপ ব্যক্তি মোক্ষপদ লাভের একমাত্র উপযোগী।

গুরুর উপদেশে প্রথমতঃ পশুভাবে সাধনা করিতে হয়। ইহাতে অপরাপর ক্রিয়ার মধ্যে যোগশিক্ষাই প্রধান, এই যোগশিক্ষা দুই প্রকার যথা—আত্মযোগ ও ঈশ্বরযোগ। অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে একাগ্রতা লাভের পর আত্মাতে চিত্ত বিলীন হইলে আত্মযোগ সাধন করা হইল। আর ঈশ্বরের স্থূলাবস্থা (মূর্ত্তিপূজা) হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মাবস্থা পর্য্যন্ত একাগ্রমনে আয়ত্ত করিয়া ক্রমশঃ আত্মার নিকট উপস্থিত হওয়াই ঈশ্বরযোগ নামে অভিহিত। পশুভাবে আত্মযোগ সমাধা হইলে (তান্ত্রিক সাধক গুরুর দ্বারা এইস্থানে পূর্ণাভিষিক্ত হন) পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা উন্নত বলিয়া বিবেচিত হন। ইহাই বীরাচার, বীরভাবের সাধক আর ইন্দ্রিয়ের দাস নহেন। তাঁহারা জগতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন, তাঁহাদের আর পতনের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে

না। এই সময়ে গুরু শিষ্যকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্ণাভিষেক করিয়া আবশ্যক বোধ করিলে পঞ্চতত্ত্বে অধিকার প্রদান করেন, সাধক এই বাহ্যিক পঞ্চমকারের রসাস্বাদনে পতিত না হইয়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলে কেহ-বা জ্ঞানযোগী অর্থাৎ অদ্বৈতভাবের ভাবুক, কেহ-বা ভক্তিযোগী অর্থাৎ সেব্য-সেবকত্ব রূপ দ্বৈতভাবের ভাবুক হইয়া থাকেন।

দিব্যভাব এই বীরভাবেরই চরমোৎকর্ষ। সাধক এই সময় দেবতুল্য, আনন্দময়, সুখ-দুঃখের অতীত, নির্ম্মলান্তঃকরণ, সমদর্শী ও ক্ষমাশীল। এই অবস্থায় সাধকের ভগবদ্দর্শন হয়, ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকে, কাজেই সাধক তখন মা-ময় জগৎ করিয়া ধন্য হয়। ভাবের ভাবুক না হইলে যুক্তি-তর্কে, জড়-বিজ্ঞান বিশ্লেষণে বা শাস্ত্র মীমাংসায় সে তত্ত্বাতীত বিষয়ের উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। দিব্যভাবের ভাবুক রামপ্রসাদ তাই অহরহঃ বলিতেন—"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ?"

পূর্ব্বে ঈশ্বরযোগের কথা বলা হইয়াছে। এই যোগসিদ্ধ যোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যোগী যখন উত্তমরূপে যোগাভ্যস্থ হইয়া ভক্তিপ্রাবল্যে জগন্মাতার পাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিতে পারেন, "তুমি মা, আমি ছেলে বা তুমি প্রভু আমি দাস" এইরূপ ভাবে ভাবিতে পারেন, তখন তাঁহার তুল্য ভক্ত সাধক আর কেহ নাই। এইজন্য রামপ্রসাদ নির্ব্বাণ মুক্তি চাহিতেন—"চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।" তাই আরও বলিতেন—"অগ্রে শশী (প্রবৃত্তি) নিজ শক্তির দ্বারা বশীভূত কর।" নতুবা তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না।

বাহ্যিক পঞ্চতত্ত্বে সাধক উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ তাহাতে যদি তাঁহার পতন না আসে, তাহা হইলে তিনি তখন আধ্যাত্মিক পঞ্চমকারে অনুরক্ত হইয়া প্রাণমন সুশীতল করিতে পারেন। বীরভাবের সময় বাহ্যিক পঞ্চমকার গুরুর উপদেশ মত উপভোগ করত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে সাধক দিব্যভাবের ভাবুক হইয়া ভক্তি-ভাবে ঈশ্বরযোগ অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক পঞ্চমকারে আপনিই অভ্যস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রবৃত্তির আর উত্তেজনা থাকে না।

বাহ্যিক পঞ্চমকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন। বীরাচারী সাধক নিয়মিতরূপে শোধন করিয়া গুরুর উপদেশে উহা উপভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এমন লোভনীয় পদার্থ ত' জগতে আর কিছুই নাই, এই জন্য দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে, সাধককে আশক্তিপাশ মুক্ত করিতে, তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে শিষ্যকে গুরু এইরূপ পরীক্ষাও করিয়া থাকেন। গুরুর উপদেশ মত কার্য্য করিলে, ইহাতেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যায়। রামপ্রসাদ সাধক চূড়ামণি আগমবাগীশের

উপদেশে বীরভাবে এই সকল ক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। সাধক যখন পঞ্চমকারে অধিকার প্রাপ্ত হন, তখনকার অবস্থা অতি গোপনীয়। রামপ্রসাদ যখন এই অবস্থায় উপনীত ছিলেন, তখন তাঁহার ইতস্ততঃ যাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল। কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, সাধনা ভিন্ন তখন তাঁহার অন্য কাজ ছিল না। অহরহঃ হরমহিষীর চরণ-তলে বসিয়া কেবল পঞ্চতত্ত্বে মাতোয়ারা হইয়া সাধন পরায়ণ থাকিতেন। প্রসাদের সে অবস্থায় আনন্দময় মূর্ত্তি কেবল তাঁহার গর্ভধারিণী ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পাইতেন না। তখন সমাজে মদ বড়ই ঘৃণিত ছিল—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মদ্যপায়ীকে সমাজের নিকট কত নিন্দনীয় হইতে হইত, কত কথা শুনিতে হইত এবং পরিশেষে জাতিচ্যুত পর্য্যন্ত হইতে হইত। এইজন্য সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :

মন ভুল না কথার ছলে
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে।
সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই যে কুতূহলে
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
যত মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাক বসি, হর-মহিষীর চরণতলে,
নৈলে ধর্ব্বে নিশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয় মদ খাইলে।
* যন্ত্রভরা মন্ত্র সাঁড়া, অশুভাসে সেই জলে
সে যে অকূল তারণ, কূলের কারণ,
কুল ছেড়ো না পরের বোলে।
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ছলে,
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে।
মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে, নিদানকালে
পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥

সাধক রামপ্রসাদ বাহ্যিক পঞ্চমকার এই ভাবে সাধন করিতেন। প্রায় আট দশ বৎসর তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল সেই নির্জ্জন উদ্যান মধ্যে সিদ্ধাসনে বসিয়া বীরভাবে সাধন-ভজন করিয়া দিব্যভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন।

* যন্ত্র—বোতল, জল—সুধাঘটিত কারণ-বারি, কুল—কৌলিক ক্রিয়াকলাপ। বেতাল—শিব, বৈতালী—কালী।

এই সময় তিনি লোকের সঙ্গ আদৌ করিতেন না। তারপর তিনি যে ভাবে পঞ্চমকার সাধন করিতেন, তাহার মর্ম্ম এই :

(মদ্য)—সোমধারা ক্ষরেদ্‌যাতু ব্রহ্ম রন্ধ্রাদ্‌ বরাননে।
পীত্বানন্দ ময়স্তাং যঃ স এব মদ্য সাধকঃ ॥

(মাংস)—মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংসান্‌ রসনা প্রিয়ান্‌,
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধক।

(মৎস্য)—গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধক ॥

(মুদ্রা)—সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্‌।
সূর্য্যকোটী প্রতীকাশং চন্দ্রকোটী সংযুতম্‌,
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলী সংযুতম্‌,
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে।

(মৈথুন)—মৈথুনং পরমং তত্ত্ব সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারণম্‌।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্‌ ॥
বেয়াস্থ কুসুমাভাষ, কুণ্ডমধ্যে অবস্থিত.
মকারশ্চ বিন্দু রূপো মহাযোনৌস্থিত প্রিয়ে।
আকার হংস মারুহ্য একতাচ সদা ভবেৎ;
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্‌।

তখন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গানের মর্ম্মও অনুরূপ হইয়াছিল, তিনি ঐ গান তখন আবার এই ভাবে গাহিতেন :—

সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
(আমার) মন-মাতালে মাতাল করে,
(যত) মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মত'লে।

বীরাচারী সাধক ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া বীজ ও শক্তিকে প্রসন্ন করত সহস্রার পদ্মে উপনীত হইতে পারিলেই শিব হইতে পারেন। এই সহস্রার বা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে সুধাক্ষরণ হয়—তাহাই মদ্য নামে কথিত। সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাধক এই অবস্থায় অবস্থিত হইলে, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন এই

মদ্যই তাঁহার পানীয়, তখন তাঁহার কোনরূপ ভেদাভেদ থাকে না, তখন তাঁহার বিষ্ঠা-চন্দন সমান জ্ঞান হয়। সাধক তখন ব্রহ্মানন্দ ভোগে বিভোর। বাক্যালাপ তাহার একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়, বাক্যের এই সংযমকে মাংস ভক্ষণ কহে। ইড়া, পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে রজ ও তমরূপ শ্বাস প্রশ্বাসকে প্রণায়াম দ্বারা নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই মৎস্য ভক্ষণ করা হয়। সহস্রদলপদ্মে পারদের ন্যায় কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিবিশিষ্ট যে আত্মা, তাঁহাকে জানার নাম মুদ্রাসাধন। নাভিচক্রস্থিত অজপারূপ শ্বাস প্রশ্বাস আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনির সহিত সম্মিলনের নাম মৈথুন। ইহাই আধ্যাত্মিক পঞ্চমকার যোগসিদ্ধি গুরুর দ্বারা শিক্ষিত না হইলে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া এই পঞ্চমকারের আস্বাদ লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সাধক আগমবাগীশ প্রসাদকে এই ষট্‌চক্র* ভেদরূপ যোগও শিক্ষা দিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাতুলালয়ে প্রসাদ

রামপ্রসাদের এই সময়কার অবস্থা অতি চমৎকার, এই সময় হইতেই তিনি সিদ্ধ সাধক বলিয়া সকলের নিকট পূজিত হইতে লাগিলেন। কোনও ঘটনাচক্রে এই সময় কিয়দ্দিবস তাঁহাকে তাঁহার মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সেই সময় তথাকার কোন ধনী জমিদারের মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মহা সমারোহ হইবে। দেশ বিদেশ হইতে অধ্যাপকমণ্ডলীর আবাহন হইতেছে। পাঁচ সাতখানি গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কিন্তু রামপ্রসাদের মাতুল হরমোহন গুপ্তের নিমন্ত্রণ তথায় রহিত করা হইয়াছে। কতকগুলি অকৃতকর্ম্মা যুবকের হস্তে এই কার্য্যের ভার ছিল, তাহারাই এরূপ অপরিণামদর্শিতার কাজ করিয়াছে। মাতুল মদ্যপায়ী ভাগিনেয় রামপ্রসাদকে গৃহে স্থান দিয়া মদ্যপানের প্রশ্রয় দিতেছেন—অতএব সমাজের নিয়মানুসারে তাঁহার নিমন্ত্রণ রহিত করা উচিত। যদি আমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করি, তাহা হইলে হয়ত সমাজপতিগণ আমাদিগকে দোষ দিতে পারেন। অপরিপক্কবুদ্ধি, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকেরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রসাদের মাতুলের নাম আর উত্থাপন না করিয়া

* ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত "বামাক্ষ্যাপা" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

সামাজিক নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিল। ভাগিনেয়কে বাটীতে রাখিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইল, এই ভাবিয়া তিনি সন্ধ্যার প্রাকালে কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণমনে বহির্বাটীর দাওয়ায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। মনে মনে করিতেছেন—কি সর্ব্বনাশ, রামপ্রসাদ হেন সাধকের প্রতিও সমাজের এরূপ তীব্রদৃষ্টি! কই, এখন ত' সে আর আদৌ মদ খায় না, পূজাদিও করে না, কেবল অহরহঃ গান গাহিয়াই তন্ময় হইয়া থাকে; তবে তাহার প্রতি সমাজের এত জাতক্রোধ কেন?

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময়ের অবস্থায় সাধকের আর পশুভাবে লোক দেখাইয়া বাহ্যিক পূজাদি করিবার অবস্থা নহে; তখন তিনি সে স্তরের অনেক উচ্চে, বীরভাবে অবস্থিত; কেবল গানেই মাকে ডাকিয়া ভক্ত তাঁহার প্রাণের আবেদন নিবেদন করিতেন, বাহ্যিক পূজার আবশ্যক হইত না। যখন আবশ্যক বোধ করিতেন—তখন অতি নিভৃতে, অতি গোপনে গভীর অমানিশায় নিজের সাধনপীঠে মায়ের সাধনা করিয়া সাক্ষাৎকার লাভের জন্য তন্ময় হইতেন। মাতুল মহাশয় যখন রামপ্রসাদের প্রতি সমাজের এই ঘোর অত্যাচার দেখিয়া সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন—সে সময় রামপ্রসাদ বাটী ছিলেন না, কোথায় গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি ভোজন করিতে গৃহে আসিলেন এবং মাতুল মহাশয়কে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন—"মামা! আজ এরূপ ভাবে বসিয়া কেন গা? কোন অসুখ ক'রেছে কি"? রামপ্রসাদ জমীদার বাটীর নিমন্ত্রণের কথা কিছুই জানেন না। তাই মাতুলকে সেইরূপ ভাবে অবস্থিত দেখিয়া শরীর খারাপ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন।

মাতুল বলিলেন,—"হাঁ বাবা! শরীর একটু খারাপ হইয়াছে বটে, তবে তত কিছু নয়, তুমি আহারাদি করগে।"

রামপ্রসাদ আর কোন কথা না বলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং আহারাদি করিলেন! গুপ্ত কথা স্ত্রীলোকের নিকট কখনও চাপা থাকে না। প্রসাদের মাতুলানী বলিলেন—"বাবা! আজ জমীদার বাটীর নিমন্ত্রণে আমরা একঘরে হইলাম, তাঁহারা আমাদের নিমন্ত্রণ রহিত করিয়াছেন।"

প্রসাদ বলিলেন—"কেন মামীমা! কি অপরাধ হ'য়েছে।

মাতুলানী। বাবা! সে কথা আর তোমার শুনিয়া কাজ নাই। হ'লামই বা একঘরে, তুমি বেঁচে থাকো, তোমার ছেলেপিলেগুলি বেঁচে থাক্। আমাদের ভাবনা কি?

প্রসাদের বড়ই কৌতূহল হইল, কথার মধ্যে যে কোন রহস্য আছে, বুঝিতে

পারিয়া বলিলেন—মামীমা! কি হয়েছে, বলো না, তাতে আর দোষ কি?"

প্রসাদকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া মামী বলিলেন—"বাবা! তুমি আমাদের এখানে আছ বলে তাই। তা বাবা! ঐটে না খেলে কি আর চলে না?"

প্রসাদ বলিলেন—"মামীমা! এই কথা। ওরা জানে না, তাই বলে মদ খায়, আমি যে সে অনেক দিন ছেড়েছি।" এই বলিয়া প্রসাদ হাসিয়া আকুল হইলেন। প্রসাদের মাতুল-মাতুলানী তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসিতেন—তাঁহারা জানিতেন প্রসাদের তুল্য ছেলে কি আবার হয়! ও যা করে—তাহার আবার প্রতিবাদ কি! মাতুলানী বলিলেন—"বাবা! ও কথায় তুমি কিছু মনে ক'রো না, আমরা উহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নই।"

প্রসাদ আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। মামী বলিলেন—"বাবা, বেশী রাত্রি ক'রো না, একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ী চ'লে এসো।"

প্রসাদ বাটীর বাহির হইয়া উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রসাদের মনে এখন সুখ-দুঃখ মান-অভিমান কিছুই স্থান পায় না, কিছুতেই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করিতে পারে না, শত্রুমিত্র তাঁহার কেহ নাই। যিনি ব্রহ্মময়ী মাকে হৃদয় কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছেন, জাগতিক ব্যাপারে তিনি কখনই বিচলিত নহেন। প্রসাদ এখন শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে কেবল মাতৃনামের ডঙ্কা বাজাইতেন, অহরহঃ সাধন-সঙ্গীত রচনা করিয়া মায়ের গুণগান করাই এখন তাঁহার সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। প্রসাদ গান গাহিতে গাহিতে পথ দিয়া যাইতেছেন—"শ্যামা মায়ের এমনি বিচার বটে, যে জন দিবানিশি দুর্গাবলে, তার কপালেই বিপদ ঘটে।" যে জমীদারের বাটীতে পরদিন মাতৃশ্রাদ্ধে মহোৎসব সম্পন্ন হইবে তাঁহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকা ঠিক রাস্তার উপরেই অবস্থিত ছিল। জমীদার ভবন আজ আত্মীয় কুটুম্বগণের আনন্দ কোলাহল-উৎফুল্ল, বালক-বালিকাগণের সরল হাস্যরস-সমুদ্ভাসিত, প্রতি কক্ষ আজ ভামিনী কামিনীগণের অলঙ্কার ঝনাৎকার শব্দে মুখরিত। বহির্বাটীর কক্ষ সকল আলোকোজ্জ্বল, যুবকগণ নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকে, গান বাদ্যের বিমল আনন্দে আনন্দহিল্লোল তুলিতেছে। ঠিক এই সময়ে আনন্দময়ীর আনন্দদুলাল রামপ্রসাদ এই বাটীর নিকট দিয়া আনন্দমনে মায়ের নাম করিতে করিতে চলিয়াছেন।

লোকে যতই কেন রামপ্রসাদকে নিন্দা করুক না, সমাজের চক্ষে যতই তিনি দোষী হউন না কেন, সাধক বলিয়া, ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা বলিয়া কিন্তু সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত, তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব

করিত। একজন যুবক বলিল—"ভাই সমাজ যাহাই বলুক না কেন, রামপ্রসাদ কিন্তু সহজ লোক নহেন, তাঁহার মত লোক কলিতে আর জন্মাইবে না। ভাই! আজ ত' আর কিছু নয়, সামাজিক কর্ম্ম ত' আগামী কল্য হইবে, অদ্য একবার রামপ্রসাদকে ডাকিয়া দুই একটা গান শুনিতে দোষ কি?" সকলেই যুবকের কথা সমর্থন করিল এবং পথবাহী সাধক প্রবরের নিকট সকলে যাইয়া তাহাদিগকে গান শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। উদার প্রকৃতি রামপ্রসাদ দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাহাদের সহিত সেই সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তারপর সকলের অনুরোধে গান ধরিলেন :—

মা মা বলে আর ডাক্‌ব না,
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা ধরো এলোকেশী,
(না হয়) ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগী খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাবো না।
ডাকি বারে বারে মা মা ব'লিয়ে,
মা বুঝি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি তার ছেলে বাঁচে না?
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের একি সূত্র,
মা হ'য়ে হ'লি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,
না হয় দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা।*

আদুরে ছেলের মত প্রসাদের এই খেদোক্তি পূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল এবং বলিল—এমন গান শুনিলে কি আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে? এইরূপ আরও কয়েকটী সঙ্গীতের অবতারণা করিতে রাত্রি অনেক হইল, মামী বলিয়া দিয়াছেন—"বাবা! একটু সকাল সকাল ঘরে এস।" আর রাত্রি করা বিধেয় নহে ভাবিয়া প্রসাদ পিপাসা নিবারণের জন্য কথঞ্চিৎ জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জমিদার-পুত্র তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতর গমন করিলেন এবং যথায় পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য সাত জালা সঞ্চিত ছিল, তাহার একটীর মধ্য হইতে একটী মৃন্ময় পাত্রে করিয়া প্রসাদকে জল আনিয়া দিলেন। প্রসাদ

*রাগিণী গৌরীগান্ধার, তাল—একতালা

তাহা পানের আশায় মুখের নিকট লইয়া পান না করিয়া আঘ্রাণ লইয়া বলিলেন—"দেখুন, জলে কিসের গন্ধ ছাড়িতেছে।" অমনি একজন বলিল—"আরে কর কি, ভাল দেখে এক গেলাস জল আন না" ? অপর একজন চলিয়া গেল এবং অপর পাত্রে করিয়া পুনরায় এক গেলাস পানীয় জল আনয়ন করিল—তাহাও পূর্ব্ববৎ গন্ধযুক্ত। সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—জলে ঠিক মদের গন্ধ ছাড়িতেছে। সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং একজন বিশিষ্ট যুবক পুনরায় জল আনিয়া দিল, প্রসাদ মুখাগ্রবর্ত্তী করিয়া পুনরায় তাহাদের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—"ইহাতেও যে এরূপ গন্ধ।" যুবক লজ্জিত ও স্তম্ভিত হইল। এইরূপে একে একে, সকল জালার জল আনিয়া দেওয়া হইল—কিন্তু প্রসাদ হস্তস্পর্শ করিবা মাত্র তাহা মদিরাগন্ধ সমন্বিত হইতে লাগিল। তখন সকলে প্রমাদ গণিল। চারিদিকে একটা আশ্চর্য্যের কোলাহল পড়িয়া গেল। অতিবৃদ্ধ বাটীর কর্ত্তা মহাশয় বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কিরে, তোরা এত গোল-মাল করছিস্ কেন" ? যুবকগণ বৃদ্ধকে দেখিয়া ভীতবিহ্বল চিত্তে বলিল—"দাদা-মহাশয়। আমরা রামপ্রসাদকে ডাকিয়া গান শুনিতেছিলাম—তারপর গান শেষ হইলে, তিনি একটু পিপাসার জল চাহিলেন, আমরা জল আনিয়া দিলাম। কিন্তু যতবারই জল আনিয়া দিলাম—ততবারই তাহাতে মদের গন্ধ ছাড়িতেছে। রামপ্রসাদ তাহা পান করেন নাই, আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি। দাদামশাই ! কেন এমন হ'লো ?" বৃদ্ধ স্থির চিত্তে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আজ অপরাহ্নে নিমন্ত্রণ করিবার সময় কিরূপ নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে ? যাহারা নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল, তাহারা বলিল—"বাবার কথায়, সামাজিক হিসাবে কেবল রামপ্রসাদের মামাকে বাদ দিয়া সাতখানি গ্রাম সমস্তই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"তোমার বাবার যেমন বিদ্যে, এ সকল কাজে এই বুড়োটাকে কি একবার জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে নাই ?"

যুবক বলিল—"আপনি তখন গৃহে ছিলেন না, এদিকে বেলা শেষ হয় দেখিয়া বাবার অনুমতি লইয়াই আমরা নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম।"

বৃদ্ধ। আমি ত' তোর বাবার বাবা, আমার বুদ্ধি বিবেচনা ত' তার চেয়ে ঢের বেশী ; যাহা হউক, রামপ্রসাদের মামাকে বাদ দেওয়া ভাল হয় নাই। মামার অপমান হইয়াছে বলিয়া, শাক্ত-ভক্ত রামপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ হইয়া এই শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, চল সকলে এই অপরাধের জন্য তাঁহার পায়ে ধরি নতুবা কল্য যজ্ঞ সমাধা হইবে না। ইতিমধ্যে একজন দৌড়িয়া যাইয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এস। এই বলিয়া বৃদ্ধ সকলের

সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—"দোহাই রামপ্রসাদ! বাবা! ছেলেপিলেরা না বুঝে একটা দোষ ক'রে ফেলেছে, তার জন্য তুমি কিছু মনে করো না বাবা! তুমি আমাদের সকলকে ক্ষমা করো" বলিয়া বৃদ্ধ রামপ্রসাদের হাতে ধরিলেন, যুবকগণ পদে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। রামপ্রসাদ শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"মহাশয়! আপনারা করেন কি? আমাকে এমন করেন কেন? পিপাসার জন্য জল চাহিয়াছি বলিয়া দোষ হইয়াছে, আচ্ছা থাক, আর জল চাই না"—এই বলিয়া প্রসাদ তাঁহাদিগকে প্রতিনমস্কার ও অনুনয়-বিনয় করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর তাঁহারাও সকলে রামপ্রসাদের মাতুলের নিকট যাইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে স্বভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। প্রসাদের মাতুল প্রসাদের এ অদ্ভুত খেলার বিষয় বুঝিতে পারিয়া, আনন্দে ভাগিনেয়কে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ জীবনে কখন আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেন না কিন্তু ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় তাহা আপনাপনি প্রকাশ হইয়া পড়িত। মা যাহা করাইবেন—তাহাতে বাধা প্রদান করিবার সাধ্য কার? ইহার পরই আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা এই:

একদিন রামপ্রসাদ কার্য্যোপলক্ষে জননী ও পুত্র কলত্র লইয়া কোন আত্মীয়ের বাটী যাইতেছিলেন। তখন দূরদেশে যাইতে হইলে এখনকার মত অশ্বযান ছিল না, নৌকাযোগেই যাইতে হইত। প্রসাদ নৌকার উপরিভাগে বসিয়া আপন মনে মায়ের নাম গানে বিভোর হইয়াছেন। ভিতরে পরিজনবর্গ নৌকার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। ক্রমশঃ নৌকা এক জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হইল। নদীর তীরে দুই ধারেই ভীষণ বন, অপর দৃশ্য কিছুই নাই। মাঝিমাল্লাগণ তখন এক মনে ঝুপ্ ঝাপ্ দাঁড় বাহিয়া চলিতে লাগিল। অভ্যন্তরস্থ প্রসাদের পরিজনবর্গও পুত্রগণের উৎপাতে নৌকার জানালা বন্ধ করিয়া তাহাদের সান্ত্বনায় নিরত হইল। নৌকার উপর প্রসাদ আপন মনে সঙ্গীত আলাপে বিভোর, দরবিগলিত ধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে। মাঝিমাল্লাগণ তাদৃশ কিছু বুঝিতে না পারিলেও মুগ্ধান্তঃকরণে প্রসাদের সেই ভক্তিমাখা মা মা বুলি শুনিয়া একরূপ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা যেন ঠিক কলের পুতুলের মত হাত পা নাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাদের প্রাণেও তর তর ধারে যেন ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতেছে—তাহারাও কাঁদিতেছে। মাতৃভক্ত প্রসাদ গাহিতেছিলেন—

সামাল্ সামাল্ ডুবল তরী।
আমার মনের ভোলা, গেল বেলা, ভজ্‌লে না হরসুন্দরী।
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি, ক'রে ভরা কৈলে ভারী,
সারাদিন কাটালে ঘাটে ব'সে, সন্ধ্যা বেলা ধরলে পাড়ী।
একে তোর জীর্ণ তরি, কলুষেতে হ'লো ভারী,
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী।
তরঙ্গ দেখিয়া ভারী, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী,
এখন গুরুব্রহ্ম সার কর মন, তিনি হন ভবকাণ্ডারী।*

দুই ধারের বনের পশু-পক্ষিগণও সে গানে মোহিত হইয়া গেল! নৌকা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আপনাদের কলরব ভুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া প্রসাদের সেই সুধামাখা সুশ্রাব্য স্বরলহরী শ্রবণে মুগ্ধ হইতে লাগিল। বন্য হরিণগণ মুগ্ধ হইয়া তটসন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল। যেন তাহারাও সেই সম্মোহন শরবিদ্ধ হইয়া স্থানান্তরে যাইবার শক্তি হারাইয়াছে। ভক্তের প্রাণমন বিমোহন সঙ্গীতের এমনি আকর্ষণীয় শক্তি! শরতের আকাশে মেঘ নাই, তথাপি টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে—প্রকৃতি যেন সেই প্রাণমন মুগ্ধকারী সঙ্গীত শ্রবণে ভক্তিভরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। চারিদিক্ নীরব নিস্তব্ধ। নৌকা কিনারা দিয়া চলিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ বনান্তরাল হইতে শ্রুত হইল—"ওরে! কে ভক্ত, এমন সুধামাখা সঙ্গীত তরঙ্গে দশদিক্ আনন্দ মুখরিত করিতেছিস্। একবার ফিরিয়া গা, আমারও প্রাণ শীতল হউক।" বোধ হইল রমণীকণ্ঠের এ মধুর স্বর। কোথা হইতে আসিতেছে—বুঝিতে না পারিয়া রামপ্রসাদ তাদৃশ গ্রাহ্য না করিয়া পূর্ব্ববৎ গাহিতে লাগিলেন! প্রসাদ শুনিলেন না দেখিয়া, পুনরায় সেইরূপ রমণীকণ্ঠের আগ্রহসূচক বাণী শ্রুত হইল—"ভক্ত, এদিকে ফিরিয়া গান গাও।" এইবার প্রসাদ ফিরিয়া দেখিলেন—বনান্তরালে একটী পুরাতন জীর্ণ ভগ্ন মন্দির, সম্মুখের দ্বার রুদ্ধ নানা তরুলতায় আচ্ছাদিত হইয়া একপ্রকার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এইবার প্রসাদ পুলকিত নেত্রে, প্রগাঢ় ভক্তিভরে বলিলেন,—"যদি গান শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুই ফিরিয়া চা না?" ভক্তপ্রাণের কি অসীম ক্ষমতা, কি তীব্র তেজোদৃপ্ত বচন পারিপাট্য—কি গভীর ভক্তি ভাবপূর্ণ আহ্বানবাণী! তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থিত মন্দির দ্বার অর্গলমুক্ত হইয়া গেল। ভক্তবীর রামপ্রসাদ গললগ্নীকৃতবাসে সগণে তথায় উপস্থিত

* যে গানের নীচে কোন চিহ্ন দেওয়া থাকিবে না, তাহা প্রসাদী সুর, তাল একতালা বুঝিতে হইবে।

হইলেন। দেখিলেন—আনন্দঘনচিৎস্বরূপা ইষ্টমূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজিতা; অসি খর্পরধরা, লোলরসনা মুখের ভাব দেখিলে বোধ হয়, যেন মা ভক্তসন্তানকে ক্রোড়ে পাইয়া বহুদিনের কত মনের কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। শ্রীরাম-প্রসাদ সপরিবারে দেবীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া একতারা সহযোগে গাহিলেন :—

দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করাল বদনা।
নীল কাদম্বিনীরূপ মায়ের, এলোকেশী দিক্‌বসনা।
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না।
সদা পদ্ম বনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা।
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়ে কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না।
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বলোনা। *

জলে জল মিশিয়া যাওয়ার মত নির্ব্বাণ মুক্তির প্রতি যে রামপ্রসাদের আস্থা ছিল না, তাহা এই সঙ্গীতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। জন্মে জন্মে আসিও তুমি প্রভু, আমি দাস—এই ভাবে সাধনা করিয়া ধন্য হইতে, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বাড়াইতে প্রসাদের একান্ত কামনা ছিল। চিনি খাইতে যত ভাল লাগে,—রসনা তৃপ্তি হয়; চিনি হইয়া চিনির সহিত মিশিয়া যাইলে কি সেরূপ সুখ লাভ হয়? রাম-প্রসাদ দেবীর নিকট এইরূপ ভাবের গীত গাহিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিলেন।

এই মন্দির এবং মূর্ত্তি কাহার প্রতিষ্ঠিত, তাহার সন্ধান তিনি প্রাপ্ত হন নাই। বহুদিন হইল জীর্ণাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে ইহাই বুঝিতে পারিলেন। পূজাদির কোন ব্যবস্থা ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিয়া রামপ্রসাদ পুনরায় এই মন্দির সংস্কার করিয়া দিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা এখানে আসিয়া পরমানন্দে রাত্রি যাপন করিয়া পরমানন্দময়ীর প্রীতি সম্পাদন করিতেন।

* এই গীতটী একতালা তাল যোগে ঝিঁঝিট রাগিণীতে গেয়।

নবম পরিচ্ছেদ

আজু গোঁসাই ও রামপ্রসাদ

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আনন্দময় মূর্ত্তি রামপ্রসাদ পঞ্চবটী মধ্যে আপন সিদ্ধাসনে বসিয়া সন্ধ্যাকালীন আরাধনার উপক্রম করিতেছেন। সেদিন একাদশী, ভোজনের জন্য আর গৃহে যাইতে হইবে না। ইহার জন্য গৃহে যাইতে যে সময়টুকু নষ্ট হয়—প্রসাদ যেন সে অমূল্য সময়টুকুও নষ্ট করিতে নারাজ। আজ প্রাণ ভরিয়া সমস্ত রাত্রি জপে মগ্ন থাকিবেন ভাবিয়া আনন্দ-বিহ্বল প্রাণে আনন্দময়ীর সুসন্তান ভক্তপ্রবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ প্রাণের আবেগে দুটি সঙ্গীত রচনা করিলেন। একটি "মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, এই উন্মুক্ত আঁধার ঘরে" ইত্যাদি, আর একটী "ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ, কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক। অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্যময়ে ভজ, মকরন্দ রসে মজ ওরে মনো-ভৃঙ্গ" ইত্যাদি।

সঙ্কল্পিত জপ শেষ করিয়া এই গান দুইটীতে মায়ের চরণে অর্ঘ্য স্থাপন করিবেন। এই চিন্তায় ভক্তহৃদয় প্রেমবিহ্বল—আনন্দোদ্বেলিত।

এমন সময় নগ্নপদে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই সাধন-ক্ষেত্রে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, তদীয় জননী, আর দুই একজন ভগবন্নিষ্ঠ ভক্ত ভিন্ন কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ অবস্থায় আসিতে দেখিয়া প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ! আজ এরূপ অবস্থায় আসিবার কারণ কি? গুরুদেবের আসিবার কথা ছিল, কই তিনি ত' দয়া করিলেন না।" কৃষ্ণচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন—"ভাইরে! গুরুদেব আর আমাদের সঙ্গ করিবেন না; তিনি আমাদিগকে চির জীবনের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।" আগমবাগীশ দেহ-রক্ষা করিয়াছেন শুনিয়া রামপ্রসাদ একটু দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু বিচলিত হইলেন না, তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"মহারাজ! তার জন্য আর চিন্তা কি? মায়ের কাছে গিয়াছেন—তার জন্য শোক কেন? ধ্যেয়ধন যদি বাহ্যিক চক্ষুর অন্তরালই হয়—তাতে ক্ষতি কি, ধ্যানে ত' দেখিতে পাইব—সে জন্য চিন্তার কারণ নাই?" এই বলিয়া গান ধরিলেন,—"ভাবনা কালী, ভাবনা কিবা।"

গুরুর শোকে প্রাণ খারাপ হওয়াতেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিরঞ্জনের নিকট তত্ত্বকথার আস্বাদ গ্রহণে পরিতৃপ্তি লাভের জন্য আসিয়াছিলেন! প্রসাদকে কিছু বলিতে হইল না, তিনি নিজেই ভাব-সঙ্গীতের অবতারণা করিলেন দেখিয়া

রাজা ধীরস্থিরভাবে চিত্র-পুত্তলিকার মত তাহা শ্রবণ করিয়া হৃদয়বেগ উপশমিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত রজনী বেশ আনন্দে কাটিল। পরদিন মহারাজ আসিয়াছেন শুনিয়া, আজু গোঁসাই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আজু গোঁসাইয়ের ভাল নাম অযোধ্যারাম গোস্বামী, কেহ কেহ তাঁহাকে আজব গোস্বামী বলিয়াও ডাকিত; তাহার কারণ তিনি একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কখনও কখনও ভাল লোকের মত আহার বিহার করিতেন, কখনও কখনও বা একটি পূর্ণ পাগলের মত আপনার খেয়ালেই আপনি মত্ত থাকিতেন। ইনি রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী ছিলেন এবং সমবয়স্ক বলিয়াই অনুমান হইত, তাঁহার জীবনের সহিত প্রসাদের জীবনের অনেক ঘটনা সংজড়িত বলিয়া এখানে তাঁহার কথঞ্চিৎ পরিচয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এই জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ বিবৃত করিলাম।

কুমারহট্টে আজু গোঁসাইয়ের বাটী ছিল। সংসারে কেবল মাত্র তাঁহার জননী বিদ্যমান ছিলেন, পাগল-স্বভাব বলিয়া তাঁহার বিবাহ হয় নাই বা তিনি বিবাহ করেন নাই। পাগল বলিয়া যে তিনি সাধারণ লোকের মত বিকৃত মস্তিষ্ক ছিলেন, সাধারণ পাগলের মত অযথা লোকের সহিত ঝগড়া মারামারি করিতেন— তাহা নহে। সাধনার দিক দিয়াই তাঁহার পাগ্‌লামী পরিস্ফুট হইয়াছিল, তবে তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার নিয়ম বা বাঁধাবাঁধি ভাব ছিল না, নিজের মনে যাহা বলিতেন বা যাহা করিতেন—তাহাই তাঁহার পক্ষে ভাল, কেহ প্রতিবাদ করিলে বা ভাল হইতেছে না বলিলে—সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। ভাল করিয়া তাঁহার ক্রিয়াকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, বেশ বুঝিতে পারা যাইত, তিনি একজন মহা ভগবদ্ভক্ত এবং সর্ব্বদা পাগ্‌লামীর ভাণে ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, ভাব-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়-কন্দর সদা উদ্বেলিত থাকিত। সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিত না বলিয়া পাগল বলিয়া উপহাস করিত। কিন্তু তিনি পাগল হইলেও যে সে পাগল ছিলেন না—কাজের পাগলই ছিলেন—ইনি ছিলেন বৈষ্ণব, শাক্ত বৈষ্ণবের মতবিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ, এই জন্য রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের মধ্যেও বাদাবাদী ভাব চিরপ্রচলিত ছিল। রামপ্রসাদ জ্ঞানের গভীরতায়, ভাবপ্রবণতায় ধীরস্থির প্রশান্ত বারিধির ন্যায় অবস্থান করিতেন; কেহ কোনও কথা বলিলে বা প্রতি বিরূপ হইলে কোন প্রকার রোষ বা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন না—সে সকল সামান্য বিষয় তাঁহার গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিত না। আজু গোঁসাই কিন্তু সাধক হইলেও অল্প জলের শফরী, তাই রামপ্রসাদকে সময়ে সময়ে বিষমভাবে আক্রমণ করিতেন, অনেক

কথার ভুল ধরিতেন, তাঁহার গানের উল্টা নকল করিয়া তাঁহাকে রাগাইবার চেষ্টা করিতেন। পাগল স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এমন এক একটা কথা বলিতেন যে অপর লোক হইলে বোধ হয় একটা বিষম কাণ্ড বাধিয়া যাইত। কিন্তু ক্ষমাময় রামপ্রসাদ পাগলকে "গোঁসাইদা। বেশ বেশ তোমার প্রতি উত্তরে বেশ বাহাদুরী আছে"—বলিয়া অকাতরে তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করিতেন। প্রসাদের সহিত গোঁসাই ঠাকুরের যে আকাশ পাতাল প্রভেদ—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি তাঁহার হৃদয়ে যে একেবারে ভাবের অভাব ছিল, তাঁহার প্রাণ যে একেবারে ভক্তিহীন ছিল, ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গ করিলে, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যাইত না। সঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সঙ্গীতে তিনি সকলকেই বশীভূত করিতে পারিতেন, যে একবার তাঁহার সুধামাখা প্রাণ-মাতান সঙ্গীত শুনিয়াছে—সে-ই মুগ্ধ হইয়া প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গীত শুনিতে আসিত, কিন্তু প্রায়ই প্রসাদের অবসর হইত না; কাজেই বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত। আজু গোঁসাইও গান শুনিতে আসিতেন, প্রাণ ভরিয়া গান শুনিতেন, পরদিন প্রসাদকে রাগাইবার জন্য অবিকল পাল্টা সঙ্গীত রচনা করিয়া জবাব দিতেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইত যে, রামপ্রসাদকে রুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বেশী গান শুনিবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। আজু গোঁসাই কর্ত্তৃক প্রসাদী সঙ্গীতের ব্যাঙ্গোক্তি অনেক ছিল বলিয়া শুনা যায় কিন্তু তাহা সংগ্রহ করা যায় না, কয়েকটী যাহা পাওয়া যায়, নিম্নে তাহার কয়েকটী লিপিবদ্ধ করিলাম—পাঠকগণ ইহা হইতে পাগল কবি আজু গোস্বামীর হৃদয়ভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

আজ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত, তিনি উভয়ের মধ্যে বাদাবাদীর গান শুনিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। গোঁসাইজীকে হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"অযোধ্যারাম! ভাল আছ তো?"

অযোধ্যারাম। খুব ভাল, খুব ভাল, মন্দ ত' কাকে বলে জানি না। আপনি কখন এলেন?

কৃষ্ণচন্দ্র। কল্য এসেছি!

অযোধ্যা। আপনার শারীরিক কুশল ত'?

কৃষ্ণচন্দ্র। মায়ের ইচ্ছায় একপ্রকার কেটে যাচ্ছে।

কৃষ্ণচন্দ্র শক্তি উপাসক ছিলেন—তাই বলিলেন—"মায়ের ইচ্ছায় একপ্রকার কেটে যাচ্ছে।" রামপ্রসাদের হৃদয়ে যেমন ভেদজ্ঞান ছিল না, কৃষ্ণচন্দ্রেরও তাই—তবে আজু গোস্বামীর সম্মুখে এই কথা বলায় একটু দোষ হইল। তিনি

গোঁড়া বৈষ্ণব, এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"মায়ের ইচ্ছায় কেন, বলনা বাবার ইচ্ছায়। বাবা না হ'লে কি ছেলের জন্ম হয়?" কৃষ্ণচন্দ্র দেখিলেন—ভেদবুদ্ধি পাগল এখনি বিগড়াইয়া যাইয়া অনর্থক কথা বাড়াইবে, কাজেই বলিলেন—"হ্যা হ্যা অযোধ্যারাম, বাবার ইচ্ছায় সব ভাল।"

অযোধ্যারাম মহারাজকে হারাইয়া দিয়া, পুলকিতচিত্তে আপন আপন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়া হইলেন না। তিনি জানেন—যখন মহারাজ আসিয়াছেন, তখন রামপ্রসাদ নিশ্চয়ই গান গাহিবেন, তাহা হইলেই তিনি তাহার উল্টা গান গাহিয়া জবাব দিবেন। অযোধ্যারাম কখন বগল বাজাইতেছেন, কখন নাচিতেছেন, কখন বা আপন মনে হাসিতেছেন—আর সময় সময় চিৎকার করিতেছেন—"জয় বৃন্দাবন চন্দ্র"। তাঁহাকে একটু অন্তরে যাইতে দেখিয়া মহারাজ মনে করিলেন—পাগল আর আসিবে না। তখনকার রাজা মহারাজগণ এইরূপ সরল প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন যে, কাহারও মনে কষ্ট দিতেন না। এইবার মহারাজ প্রসাদকে বলিলেন—"অনেকক্ষণ নীরব যে, পাগল চলিয়া গিয়াছে—এইবার একটি গান গাও, প্রাণ যে বড়ই অস্থির হচ্ছে।"

রামপ্রসাদ একটী সঙ্গীত কখনও দুইবার গাহিতেন না। এইজন্য তাঁহার গানের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। বিগত রজনীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুরুদেবের মৃত্যুতেই নিতান্ত মুহ্যমান হইয়া কাশী যাইয়া, কথঞ্চিৎ সুস্থ হইবার জন্য প্রকারান্তরে প্রসাদকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহারাজের উক্তির ব্যর্থতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রসাদ গাহিলেন* :

"আর কাজ কি আমার কাশী,
কালীপদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

অযোধ্যারাম গোস্বামী কোথায় ছিলেন, দৌড়িয়া আসিয়া উত্তর দিলেন :

"পেসাদে তোকে যেতেই হবে কাশী,
সেথা গিয়ে দেখ্‌বিরে তোর মেসো আর মাসী।"

অযোধ্যার কথা শুনিয়া, সকলে হাসিতে লাগিলেন—তখন তাঁহাদের মন প্রাণ ভাবে বিভোর হইয়াছে, রামপ্রসাদ তন্ময় হইয়াছেন, কাহারও তিরস্কার পুরস্কার তখন তাঁহার কর্ণে স্থান পাইতেছে না, তাই পুনরায় গাহিলেন :—

"এই সংসার ধোঁকার টাটী,
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।"

ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী।
যেমন সরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব মাটী।
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটী।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটী।

অযোধ্যারাম উত্তরে গাহিলেন :—

"এ সংসারে সুখের কুটি, খাই দাই আর মজা লুটি।"

বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রসাদের রামমোহন নামে একটী পুত্ররত্ন লাভ হয়, প্রকারান্তরে স্বীয় পত্নী সর্ব্বাণীর গর্ভাবস্থার উল্লেখ করিয়া রামপ্রসাদ এই গানের শেষ দুইটী চরণ রচনা করেন। তাহা এই :

"রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা সুখে পান ক'রে, শেষে বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি।

গোঁসাই কবি কিরূপ ভাবুক, রসিক এবং স্পষ্টবক্তা ছিলেন দেখুন, তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন :—

তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাচায়েছ পাকা ঘুঁটি।

অর্থাৎ এতদিন তুমি সংসার খেলায় বেশ পাকা হইতেছিলে, ঊর্দ্ধরেতা হইয়া বেশ সাধনায় সুনিপণ হইতেছিলে; পাকা ঘুঁটি চালিয়া কিস্তিমাৎ করিতে পারিতে, কিন্তু স্ত্রীসহবাসে সে পাকা ঘুঁটি পুনরায় কাঁচা করিয়া ফেলিলে। তারপর গাহিলেন :—

"যার যেমন মন, তেমনি ধন লভিবে সে পরিপাটী,
জ্ঞানহীন বৈদ্য তুমি, বুঝ কেবল মোটামুটি।
পরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন, কেলে মায়ের চরণ দুটী,
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতেই ছিলনা ত্রুটী,
এদিক ওদিক বজায় রেখে খেতে পেতো দুধের বাটি।"

গোঁসাইয়ের কথায় মহারাজের এইবার বিরক্তিরোধ হইতে লাগিল, তিনি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"চুপ কর"। রামপ্রসাদের জ্ঞান নাই, তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া কেবল ভাবের প্রবাহে নূতন নূতন গান গাহিয়া যাইতেছেন, পুনরায় গাহিলেন :

* এস্থানে গোঁসাই কবি রামপ্রসাদেব উত্তব প্রতিউত্তবে যে কযেকটী গান দেওয়া হইল, তাহার দুই এক চবণ মাত্র দেওয়া হইল, কারণ প্রসাদের কোন কোন সঙ্গীতেব সমগ্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তরে গোঁসাই কবির সমগ্র গান পাওয়া যায় না।

আয় মন বেড়াতে যাবি,
কালীকল্পতরুতলে রে, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।"

গোঁসাই কবি মহারাজের কথা শুনিলেন না, তিনি পুনরায় উত্তর গাহিলেন :

"বলেন রামপ্রসাদ কবি আয় মন বেড়াতে যাবি,
তার কথায় কোথাও যেওনারে, সাধকের ভাব সে বুঝ্‌বেবাকি।"

রামপ্রসাদ গাহিলেন,—"মুক্ত কর মা মায়াজালে" সমগ্র গানটী পাওয়া যায় নাই।

আজু গোঁসাই গাহিলেন :

"বদ্ধ কর মা ক্ষেপ্‌লা জালে,
যাতে চুনো পুঁটী পালাবে না, মজা মারবো ঝোলে ঝালে।"

প্রসাদ গাহিলেন : "শ্যামা-ভব-সাগরে ডুবনারে মন,
মিছে কেন বেড়াও ভেসে? (সমগ্র সঙ্গীত দুষ্প্রাপ্য)।

আজু গোঁসাই গাহিলেন : "একে তোমার কোপো নাড়া
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি, হলে পরে জ্বর জাড়ি,
যেতে হবে যমের বাড়ী।"

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ তাঁহার কালীকীর্ত্তনের একস্থানে লিখিয়াছেন :

গিরীশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কসিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস।
সুরভি পরিবার সংশ্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মায়ের বেণু"

গোঁসাই কবি উত্তরে গাহিলেন :—

"না জেনে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালেরও আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে॥
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে॥"

এইবার রামপ্রসাদ পাগলকে একটু লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কর্ম্মের ঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট ম'লেও যায় না।" "পাগলের ছাট আজু গোঁসাইকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন :—

"কর্ম্মডোর, স্বভাব চোর, মদের ঘোর, মোলেও ঘুচে না।" "মদের ঘোর"

এই কথায় ভক্ত-চূড়ামণি রামপ্রসাদকেই বলা হইয়াছে। ইহাতেও প্রমাণ হয় যে, বীরাচারী রামপ্রসাদ সাধন ভজনের সময় শক্তি-সঞ্চয়ের জন্ম বা বিক্ষিপ্ত মনকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্ম সময়ে সময়ে কারণবারি পান করিতেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শক্তি-সাধক ছিলেন বলিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সহিত তাঁহার বেশ মিলন হইয়াছিল। তিনি প্রসাদকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিস্ফুরণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কবিত্ব-কল্পবৃক্ষ অজস্র ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল, যখন যাহা চাহিতেন—সেইরূপ ফলদানেই যাচকের মনপ্রাণ সুশীতল করিত। সেই সুচারু কল্পবৃক্ষে কালীকীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি সুমধুর ফল এবং ফুলরূপে অসংখ্য সঙ্গীত ফুটিয়া সাধকের হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিয়াছিল, পরে সেই আলোক-রশ্মিবিচ্ছুরিত হইয়া এখনও ভারতবাসীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছে। গোঁসাই কবির উৎসাহদাতা কেহ ছিল না, তাঁহার কবিত্ব-তরুমূলে কেহ ত' জল সিঞ্চন করে নাই—তাই তাহা অঙ্কুরেই শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব দেখিতে ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু যখন পাগল বৈষ্ণব বেশী বাড়াবাড়ি করিত, পাগলামীর মাত্রা বাড়াইয়া দিত, তখন তাঁহাকে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ করিতেন, তাঁহাকে আর বেশী প্রশ্রয় না দিয়া বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেন, পাগল বুঝিয়া সুজিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিত। আজও মহারাজকে সাতিশয় বিরক্ত হইতে দেখিয়া দৌড়াইয়া পলাইলেন এবং নিমিষের মধ্যে চক্ষের অন্তরাল হইয়া গেলেন।

এক সপ্তাহ হইল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য ছাড়া হইয়াছেন; আর এখানে বসিয়া থাকিলে চলে না, আবার কিয়দ্দিনের জন্ম কৃষ্ণনগরে যাইতে হইবে, বলিলেন—"রামপ্রসাদ! অনেকদিন এখানে আসিয়াছি, কাহাকেও কোন কথা বলিয়া আসি নাই, অতএব অন্ত আমি দেশে যাইব।" এই বলিয়া মহারাজ স্বদেশ যাইবার জন্ম রওনা হইলেন। রামপ্রসাদও তাঁহার সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া লৌকিক আচারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

সাধক-কবি রামপ্রসাদের সহিত তখনকার যাবতীয় বড় বড় লোকই সঙ্গ করিয়া আপনাকে ধন্ম জ্ঞান করিতেন। ত্রিলোকের অধীশ্বরীর অনুকম্পা লাভ যাঁহার হৃদয়ে একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, শয়নে স্বপনে বিশ্বজননীর গুণগানই যাঁহার কথা-প্রসঙ্গ, তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে কে না ইচ্ছা করে! এরূপ সাধু-সঙ্গলাভ বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্য সঞ্চয় ব্যতীত সম্ভবপর নহে।

দশম পরিচ্ছেদ

ভক্ত-সম্মিলন

শীতের অন্তে ফাল্গুনমাসে রাজা নবকৃষ্ণ একদিন রামপ্রসাদের বাটী আসিয়া, তাঁহাকে স্বভবনে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রামপ্রসাদ নিরহঙ্কারী অমায়িক প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, কাহারও মনে কষ্ট দিতে তিনি ইচ্ছা করিতেন না। ইহাতে যদি নিজকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত, তাহাতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। রামপ্রসাদ সংসারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, রাজার সহিত শোভাবাজার রাজবাটীতে আসিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ স্বধর্ম্ম নিরত ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, রামপ্রসাদের ন্যায় ভক্ত চূড়ামণির পদার্পণে আপনার ভবন পবিত্র এবং নিজকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। সাধুসঙ্গের অসীম শক্তি, অতি বড় পাষণ্ডও ভগবানের নামে উন্মত্ত হয়। ভক্তিমান রাজা নবকৃষ্ণের কথা ত' স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্যের কৃপায়, তাঁহার আকর্ষণশক্তি বলে পাপিষ্ঠ জগাই-মাধাইও অবশেষে পাপ কার্য্য পরিহার করিয়া সাধু-ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তখন অন্য পরে কা কথা।

রাজা নবকৃষ্ণ যে রামপ্রসাদকে এত সাধ্যসাধনা করিয়া তখন নিজ ভবনে আনয়ন করিলেন, উদ্দেশ্য—কেবল তাঁহার সহিত একত্র বাসে পবিত্রতা লাভ করা এবং তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত অমিয় মধুর সঙ্গীত সুধাপানে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করা। এই সাধু উদ্দেশ্য ছাড়া রাজার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। রামপ্রসাদকে যখন যে কোন মহৎ ব্যক্তি লইয়া যাইতেন—সকলের মনে এই একই উদ্দেশ্য জাগরূক থাকিত। তখনকার লোক ধর্ম্মে এত বীতশ্রদ্ধ হয় নাই—সে সময় ধর্ম্মের অনুরাগ মানবহৃদয় হইতে এখনকার মত একেবারে অন্তর্দ্ধান করে নাই।

ফাল্গুন মাস—শীতের প্রকোপ ক্রমে হ্রাস হইয়া হৃদয় পরিতৃপ্তিকর বসন্তের প্রভাব ধীরে ধীরে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। মধুর মলয় সমীরণ মৃদুমন্দ-ভাবে প্রবাহিত হইয়া মানব-মনে কি যে এক অব্যক্ত অমিয় মদিরা ঢালিয়া দিতেছে, তাহার বর্ণনা করা যায় না, কারণ সে সময়ে এখনকার মত ঋতু-বিপর্য্যয় ঘটে নাই, প্রকৃতি এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে জীবের আনন্দ হরণ করিতেন না, ধর্ম্মের আধিপত্য জগতে বিশেষভাবে বিস্তারিত ছিল বলিয়া, প্রকৃতিও ঋতু সকলের সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়া প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ সাধন করিতেন। সে ভাব এখন

আর নাই বলিয়া, তাহার অনুভব বা বর্ণনা একান্ত দুঃসাধ্য।

আজ রাজভবনে রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইবে, বহু সংখ্যক লোকের ভোজন ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে, প্রাতঃকাল হইতেই রাজবাটী আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। দোলমঞ্চে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি রক্ষা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা হইতেছে, জলে আবির গুলিয়া পিচ্‌কারী সাহায্যে সকলের গাত্রবস্ত্র রঞ্জিত করা হইতেছে, সকলেই উৎসবামোদে প্রমত্ত। সাধক রামপ্রসাদ ঠাকুর-দালানে আসিয়া বসিয়াছেন, এতক্ষণ যুগলমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আনন্দময়ীর আনন্দে আনন্দময় হইয়া ভাবসমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন। পরিধানের বস্ত্র স্খলিত হইয়াছে—সর্ব্বাঙ্গ আবিরাপ্লুত, তদুপরি ঘর্ম্মসঞ্চার হইয়া স্থানে স্থানে যেন তাহা জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রসাদের সেই ভাব দেখিলে বোধ হয়, ঠিক যেন একটি বালক আন্‌মনে বসিয়া পূজা দেখিতেছে। রাজাও রাম-প্রসাদের সেই বালকভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত একাসনে করযোড়ে বসিয়া দেবতার প্রতি চাহিয়া আছেন। আর এক একবার সজল নয়নে বলিতেছেন—"মরি, মরি! কত জন্মের সাধনা হইলে জীবহৃদয়ে এইভাব বদ্ধমূল হয়। এত লোকের কলরবে কানপাতা যায় না, আমরা তিলার্দ্ধ মনঃস্থির করিতে পারিতেছি না—আর রামপ্রসাদের বাহ্য চৈতন্য নাই, এত গোলমালেও বিরক্তি আসিতেছে না! এই জন্যই বলিতে হয়, মন যাহার স্ববশে থাকে—সাধক যখন আপনার মনকে বশীভূত করিতে পারে, তখন তাহার পাপ-তাপ-কলরবপূর্ণ সংসারই কি, আর নিভৃতনিবাস বিজন অরণ্যই বা কি, সকল স্থানেই সে আপনার কার্য্য করিতে পারে। ধন্য রামপ্রসাদ, ধন্য তোমার সাধনানুরক্তি। অদ্যকার দোল উৎসব আমার সার্থক হইল। এমন আনন্দ, এমন পরিতৃপ্তি এতবার দোল করিয়া, আমি কখনও লাভ করিতে পারি নাই।"

প্রায় একঘণ্টা পরে রামপ্রসাদ কথঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন তখন ভগবানের আরাত্রিক কার্য্য শেষ হইয়া ভীম উদ্যমে বাদ্যোদ্যম হইতেছে। তখনও রাজাকে একাসনে করযোড়ে ভগবানের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় চাহিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রামপ্রসাদ মৃদু হাসিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন—"শ্যাম আজ আমার শ্যামা হইয়াছেন, তুমি প্রণাম কর।" রাজা প্রেম গদ্‌গদ চিত্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণি-পাত করিলেন। প্রসাদের হৃদয় তখনও ভাবের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, তখনও অর্দ্ধস্তিমিত নেত্র হইতে দরবিগলিত ধারে প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে। ভাবুক সাধক কবিরঞ্জন গাহিলেন :—

"হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা!
(ওর) মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ওমা ॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না * অনুপমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্ম সনাতনী গো মা ॥
আবির রুধির তায়, কিবা শোভা পায় পায়,
কামাদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি গো মা ॥
যে দেখেছে শ্যামা-দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ওমা ॥ †

কি চমৎকার, কি চিত্ত-বিনোদন, কি ভাবময় প্রাণ-মনোমোহন সঙ্গীত সমাগত জনসঙ্ঘ, আবাল বৃদ্ধ বণিতা ভাবের প্রভাবে, সুরের মোহিনী শক্তিতে কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তারপর যে যার স্থানে চলিয়া গেল। রাজা প্রসাদকে লইয়া পুনরায় খাস কামরায় গমন করিলেন। তিনি যেন ভাবমদিরায় উন্মত্ত হইয়াছেন।

হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ! ধর্ম্মময় হিন্দুর জীবনে ধর্ম্মকর্ম্মের অভাব নাই। দোল উৎসবের পরই চৈত্র মাসে চড়ক পূজা। এই সময়ে জমিদারগণের রাজস্ব আদায়ের ভারি ধূম, দোকানদারগণের দেনা-পাওনার আদান প্রদানেরও একটা মহা মহেন্দ্রক্ষণ, এসময় সকলেই ব্যস্ত। যে যেরূপ প্রকারের লোক, তাহার ব্যস্ততা সেইরূপ প্রকারের কিছু না কিছু আছেই। রাজা বাহাদুরের এই সময় রাজস্ব আদায়ের সময়, গঙ্গামণ্ডলের তালুক এবং আর আর ছোটখাট তালুক হইতে এই সময় অজস্র টাকা আদায় হয় এবং তাঁহাকেও ইহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু এ বৎসর ধর্ম্মপ্রাণ রাজার কোনদিকে দৃক্‌পাত নাই, কোনও বাজে কাজে মনঃসংযোগ করিতে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি হইতেছে না। রাজস্ব আদায় ত' প্রতি বৎসরই আছে, প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে, তাহার জন্য লোক জনেরও যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে, পাওনা টাকা আদায় হবেই, তাহার জন্য বৃথা ব্যস্ত থাকিলে রামপ্রসাদের ন্যায় মহাপুরুষের সঙ্গ ত' তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়! বহু সৌভাগ্য বলে এ বৎসর তাঁহাকে পাইয়াছেন। রামপ্রসাদ কখনও বাড়ী ছাড়া হন না, এবার যদি ভাগ্যক্রমে রাজার সহিত সঙ্গ করিতে এতদিন এস্থানে আছেন, তবে হেলায় এ শুভক্ষণ হারাইবেন কেন? এই ভাবিয়া রাজা বাহাদুর প্রসাদকে আরও কিছুদিন তদীয় ভবনে থাকিবার জন্য অনুরোধ

* শরীরে সার্দ্ধ ত্রিকোটী নাড়ীর মধ্যে উক্ত তিনটি নাড়ীই সর্ব্ব প্রধান।

† রাগিণী গাড়া ভৈরবী—তাল আড়া।

করিলেন, প্রসাদের কার্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত হইতেছে না, তিনি সদাসর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাকিতে পান, নিভৃতে মায়ের আরাধনা করিতে পান, সে বিষয়ে কোনপ্রকার বাধাবিঘ্ন অন্তরায় ঘটিতেছে না, অথচ রাজা বাহাদুর ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মে তাঁহার মতিগতি যথেষ্ট বিদ্যমান, কাজেই এরূপ লোকের নিকট অবস্থান করিতে কাহার না প্রবৃত্তি হয়? রামপ্রসাদ আরও কিয়দ্দিন থাকিবার জন্য সম্মতি প্রদান করিলেন। রাজা সন্তুষ্ট চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজার মহাধূম, চারিদিকেই মহামেলার আয়োজন হইতেছে। শোভাবাজারের নিকটবর্ত্তী একস্থানে চড়ক হইতেছে। চড়ক পূজা পরমশৈব বাণ রাজার উৎসব, এ উৎসব হিন্দুর নিকট বিশেষতঃ শিবভক্ত সাধকগণের নিকট বড় আদরের, তাঁহারা বহুদিন ব্যাপী এই উৎসবে মত্ত হইয়া সংযতচিত্তে দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্করের সাধনা করিয়া থাকেন। প্রতি শিবালয় সেইদিন উৎসবের অপরিসীম আনন্দ-কোলাহল মুখরিত হয়।

রাজা নবকৃষ্ণ আজ প্রসাদকে লইয়া নিকটবর্ত্তী শিবালয়ে আসিয়াছেন। উভয়ে স্বতন্ত্র একটী স্থানে উপবেশন করিতেছেন। কত গান, কত বাদ্যোদ্যম হইতেছে; গাজনের সজ্জিত সন্ন্যাসিগণের তাণ্ডব নৃত্য, তাহার সহিত ঢাকের সেই উত্তেজনাপূর্ণ রণবাদ্য, শুনিলে স্বতঃই যেন প্রাণে একটা শক্তি জাগিয়া উঠে, যেন নির্জ্জীব প্রাণ শক্তিমন্ত হইয়া নৃত্যপর হইয়া উঠে। রাজা ও রামপ্রসাদ বসিয়া বসিয়া হাসিতেছেন, আর গাহিতেছেন:

"ওরে মন চড়কি চড়ক কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥"

রামপ্রসাদ উক্ত গান গাহিয়া রাজার প্রাণে অতুল আনন্দ প্রদান করিলেন। আপনার প্রাণ ত' মত্ত হইয়াই আছে। এমন সময় কতকগুলি বালক উৎসর্গিকৃত শিবপূজার নৈবেদ্য সকল চুরি করিয়া খাইতেছে, অধিক লোক সমাগমে এতক্ষণ পুরোহিত মহাশয় তাহা দেখিতে পান নাই। এইবার দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—"ওগো, তোমরা দেখ, শিবের ঘরে চুরি হচ্ছে, আমার সব লুটেপুটে নিলে।" পুরোহিতের চীৎকার শুনিয়া বালকগণ পলায়ন করিল। উপস্থিত ব্যক্তি সকলে হাসিয়া আকুল হইল। প্রসাদ কিন্তু পুরোহিতের কথায় ভাবাবেশে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার চৈতন্য নাই, কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্যময়ীর চৈতন্যে প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"শিবের ঘরে চুরি হইয়াছে, সেত বেশই হইয়াছে; বাবার দ্রব্য একলাই সমস্ত ভোগ ক'র্ব্বে, কাহাকেও দিবে না—তাহা হইলে চুরি ভিন্ন আর উপায় কি?" এই কথায় পুরোহিতের অন্তরে আঘাত লাগিল,

তিনি মনে করিলেন বুঝি এ বোলটা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল। পুরোহিতের নামও শিবনাথ শিরোমণি, তাঁহার বহু শিষ্য যজমান ছিল, উপার্জ্জনও অনেক করিতেন, কিন্তু "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" কৃপণের এক শেষ। নিজের প্রকৃতির অনুরূপ কথা হইয়াছে বলিয়া, পুরোহিত মহাশয়ের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেন না, যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি কেমন করিয়া তাহার নাম এবং স্বভাব জানিল! যাহাতে রামপ্রসাদকে সেস্থান হইতে সরাইয়া দিতে পারেন—তিনি তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ত' রামপ্রসাদকে চিনেন না, আজ ভক্ত চূড়ামণির দর্শন লাভে যে তাঁহার জন্ম সফল হইল তাহা ত' তিনি বুঝিলেন না, তাই এরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেন। আজ সেখানে যে শিবনাথ পুরোহিতের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ—তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উপায় নাই। রামপ্রসাদের শরীর যে অক্ষয় মাতৃ-কবচে আচ্ছাদিত, মৃত্যুই যখন তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না, তখন মনুষ্য শক্তি ত' কোন্ ছার্; তার উপর রাজা নবকৃষ্ণ সঙ্গে রহিয়াছেন, পুরোহিত ইচ্ছা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। রামপ্রসাদ চুরির কথা লইয়া গান ধরিলেন:

"আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্রেরে।
শিবের সর্বস্বধন মায়ের চরণ, যদি আস্তে পারি হ'রে॥
জাগা ঘরে চুরি করা ইথে যদি পড়ি ধরা,
হবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে॥
গুরুবাক্য দৃঢ় ক'রে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে।*

গান শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল, সকলেই রাজাকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ! ইনি কে; এমন ভক্ত ত' কখন দেখি নাই।" রাজা সকলের নিকট রামপ্রসাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। এইবার সকলে তাঁহার নিকট যোড়হস্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল, কেহ বা পদধূলি লইতে অগ্রসর হয় দেখিয়া, প্রসাদ—"কর কি?" বলিয়া, সকলের হস্ত ধারণ করিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল—আজ আমাদের চড়ক পূজা সার্থক হইল, আমরাও ধন্য হইলাম। পুরোহিত মহাশয়, অপ্রস্তুত হইয়া প্রসাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অহঙ্কার ভক্তিলাভের অন্তরায়। আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ভাবিতে না পারিলে, ভক্ত হওয়া যায় না।

* একতালা তালযোগে—সোহিনী রাগিণীতে গেয়।

বৈদ্যকুলতিলক ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ তাহা বিশেষরূপে জানিতেন, তাই পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। রামপ্রসাদের নাম শুনিয়া আরও কতলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। শিবালয়ে সন্ধ্যা সমাগমে এই ভক্ত-সম্মিলন যে দেখিয়াছে, সেই ধন্য হইয়াছে। এই সময় কতগুলি ভক্ত মিলিয়া প্রসাদের শিব-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। প্রসাদের কীর্ত্তনে পাষাণ গলিয়া গেল, আনন্দের সাগর প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে সাগরে যে আসিয়া পড়িল, সেই ভাসিয়া গেল, ক্ষণেকের জন্য ভবের সকল ভাবনা এড়াইয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল। হায়! ভারতের ভাগ্যে কি আর কখন এ শুভ সাধু সম্মিলন হইবে না, আর কি সেরূপ ভক্ত জন্মিবে না?

রামপ্রসাদ বহুদিন হইল—দেশ ছাড়িয়াছেন, আর প্রবাসে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না, কাজেই রাজা দুঃখিতান্তঃকরণে বিশেষ সাবধানের সহিত তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা প্রসাদের সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়া, কিছুদিন প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। শুনা যায়—তজ্জন্য তিনি রথযাত্রার সময় পুনরায় কয়েকদিনের জন্য তাঁহাকে নিজ আলয়ে লইয়া আসিয়াছিলেন। "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" দেহরূপ রথে আত্মরূপী শ্রীবামনের দর্শনে জীব মোক্ষলাভ করে। রামপ্রসাদের পঞ্চভৌতিক দেহরথ কখন খালি থাকিত না তাঁহার ষট্‌চক্রযুক্ত রথে শ্যামা মা অহরহঃ বিরাজমানা। এইজন্য তিনি গাহিলেন:

"কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিন্‌টে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড়কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে,
সে যে সময়ে শির নাড়তে নারে, কলে বিকল হলে পরে॥
তীর্থে গমন মিথ্যে ভ্রমণ, মন উচাটন ক'রো নারে,
ও মন ত্রিবেণী ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে।
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখ্‌বে প্রসাদেরে,
ও মন এই ত' সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার হুঅক্ষরে।"

কি মধুর ভাবময় সঙ্গীত! সাধন-দণ্ডে হৃদয়-সমুদ্র মথিত না হইলে, কি এ সুধা সমুত্থিত হইতে পারে! ধন্য সাধক, কৃপাময়ীর কৃপা তোমার প্রতি যথেষ্ট, তিনি কৃপা না করিলে কি, শুধু জপতপে এ শক্তি লাভ হইতে পারে?

গানটীর ভাব দেহতত্ত্বের সহিত গাথা রহিয়াছে:—মানব-দেহ-রথ ষট্‌চক্র

(অর্থাৎ ছয়টী পদ্ম) যুক্ত, প্রতি চক্রে বা পদ্মে শিবশক্তি বিরাজিত ; মূলাধার (গুহ্য দেশের) পদ্ম হইতে কাছাকাছি তিনটী কাছি (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) বাঁধা আছে। পঞ্চইন্দ্রিয়ের ক্ষমতায় মন সারথি রথ চালাইতেছে। যুড়ি ঘোড়া চক্ষু দুইটী, দেশ দেশান্তরে যায়, কিন্তু কলে বিকল হ'লে আর মাথা নাড়িতে পারে না। রামপ্রসাদ তীর্থে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেন না তাই তিনি বলিতেন—"তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, ইহাতে কেবল মনকে উচাটন করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। সাধনার সহিত মনের সম্বন্ধ, মন ঠিক হইলে ঘরে বসিয়াই সকল তীর্থদর্শন বা সকল তীর্থ দর্শনের ফললাভ হইয়া থাকে। দেহের মধ্যে যাবতীয় তীর্থ বর্ত্তমান, তুমি যদি ভাবুক হও ভাবাবেশে তোমার হৃদয় সবশ হইয়া থাকে তাহা হইলে যাতায়াতের পণ্ডশ্রম না করিয়া ঘরে বসিয়া তীর্থ দর্শন করনা কেন ? অনেকে হয়ত বলিবেন—সকলেই ত' আর রামপ্রসাদ নহে যে, ঘরে বসিয়া তীর্থ দর্শন করিবে। আমরা বলি—যদি আপনার মন ঠিক না হইয়া থাকে, মনের মালিন্য যদি সমভাবে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তীর্থ-স্থানেও কিছু দেখিতে পাইবেন না, কেবল ঘরের পুঁই মাচাটী মনে প'ড়বে, আর প্রাণ চঞ্চল হইয়া—"কখন ঘরে যাই, কখন ঘরে যাই" করিতে হইবে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিয়া যদি ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপ ত্রিবেণী তীর্থে ব'সিতে পার, তাহার সুশীতল নীরে স্নান করিতে পার, তাহা হইলে জাগতিক সমস্ত বিষাদ-অবসাদ, শোক-তাপ, দুঃখ দৈন্য, দূর হইবে—অন্তরে এক মহা শান্তিপূর্ণ শীতলতা অনুভব করিবে—ইহাই না যথার্থ ত্রিবেণী-স্নান, নতুবা ত্রিবেণী-স্নান ক'রয়া, পরক্ষণেই যদি সাংসারিক চিন্তায় লিপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলে আর তীর্থ-স্নানের ফল কি ? জান না কি ডাকের কথা আছে,—অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে খণ্ডায়, আর জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডায়। কিন্তু তীর্থ-দর্শনে পাপার্জ্জন করিলে, তাহার আর খণ্ডন নাই ? তাই বলি—যদি তুমি তীর্থে যাইবার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাক, যদি তীর্থে যাইয়া নিষ্পাপ হইয়া আর পাপ করিতে প্রবৃত্তি না হয়—তবে তীর্থে যাও, নতুবা তোমার তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ ভিন্ন আর কি বলিব। মাতৃভক্ত প্রসাদ, তাঁহার আরও দুই একটী গানে এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

(১) "কাজ কি আমার গিয়ে কাশী,
কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

(২) "কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে ব'সে মায়ের নাম করিব"

যে সাধকের হৃদয় জ্ঞানময়, মন ভক্তিময়—তাঁহার আবার তীর্থের প্রয়োজন কি? যিনি আত্মতত্ত্বে তত্ত্ববান, তত্ত্বজ্ঞান যাঁর হৃদয়কন্দর আলোকিত করিতেছে, যিনি আমার আমিত্ব তুমিত্বে সমর্পণ করিয়াছেন বা তাঁহার তুমিত্ব আমিত্বে মিশাইয়া আত্মজ্ঞানে অমিয়-ময় হইয়াছেন; তিনি ও আমি যাহার এক হইয়াছে; তিনি চিদানন্দময় শিব—তখন তিনি "আমি" ভিন্ন আর কিছুই দেখিবেন না, তখন সেই আত্মজ্ঞানী সেই নির্ব্বাণ পথের পথিক সম্মোহন স্বরে ত' স্বতঃই গাহিবেন—

(১) ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণনেত্রং ॥
নচ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুঃ।
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

(২) অহং প্রাণ সংজ্ঞা নবে পঞ্চ বায়ু।
নবা সপ্ত ধাতুর্নবা পঞ্চ কোষাঃ ॥
ন বাক্যানি পাদৌ, নচোপস্থ পায়ুঃ।
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

(৩) ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখম্।
ন মন্ত্রো ন তীর্থ ন বেদা ন যজ্ঞাঃ ॥
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা।
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

(৪) নমে দ্বেষ রাগৌ নমে লোভমোহৌ।
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবম্ ॥
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষঃ।
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

(৫) ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা নমে জাতিভেদাঃ।
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম ॥
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরু র্নৈব শিষ্য।
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

(৬) অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকার রূপ।
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ ॥
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিঃ।
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥

বৈদ্যকুলচূড়ামণি সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল—তাই তিনি রাগ, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, এমন কি সমস্ত কামনার বহির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং মা-ময় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তীর্থ গমন তাঁহার পক্ষে ভাল লাগিবে কেন? অভিমুক্তপুরী কাশীগমনের কথা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিকট উত্থাপন করিলে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের কথায় বলিয়াছিলেন :—

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা।
ভক্তিশ্রদ্ধাগয়েয়ং নিজ গুরুচরণ ধ্যান যুক্ত প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরিয়ং সকল জন মনঃ সাক্ষিভূতান্তরাত্মা,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যং কিমস্তি।

আমাদের এই দেহই কাশী। যদি বলেন—কাশীতে ত্রিভুবনজননী গঙ্গা বিরজিতা। এ দেহের মধ্যে তাহা কই?

প্রসাদ বলিলেন,—"জ্ঞানই গঙ্গা! পতিতোদ্ধারিণী, যাবতীয় পতিত জীবের উদ্ধার কর্ত্রী। বুদ্ধিহীন, পাষণ্ড, পতিত ব্যক্তিকে জ্ঞানই উদ্ধার করেন। জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে, কিছুই হইবার উপায় নাই। ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত সমর করিয়া গয়াসুর ভগবানকে পরাভূত করত তদীয় পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া গয়ায় অবস্থিত। অতএব ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেহের মধ্যে গয়ার পবিত্রতা, মূলাধারে ত্রিবিধ নাড়ীর ত্রিধারাই প্রয়াগ স্বরূপ, আর প্রত্যেক প্রস্ফুটিত হৃদয় পদ্মে আমার মা বিশ্বেশ্বরী ও পিতা বিশ্বেশ্বর বর্ত্তমান। যদি এই দেহেই সকল পাওয়া যায়—তবে আর অন্য তীর্থ কোথায়?"

সাধনায় ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইবার ভয়ে রামপ্রসাদ সময়ে সময়ে কারণ-বারি পান করিতেন, ইহার কারণ এই যে তখন সমাজে সামাজিক নিয়মে সকলে মদ্যপায়ীকে বড়ই ঘৃণা করিত, তাহার নিকট কেহ আসিত না বা তাহার সঙ্গ করিত না—ইহাতে রামপ্রসাদের সাধন-ভজনের পক্ষে বড়ই সুবিধা হইত। শোধিত সুরা তন্ত্রশাস্ত্রে "আনন্দ" রূপে কথিত হইয়া থাকে, সাধনার সময় একাগ্রতা আনয়ন করিয়া বা শক্তিমন্ত করিয়া বেশীক্ষণ তন্ময়ভাবে একাসনে উপবিষ্ট করত যোগ সাধনের পক্ষে ইহা সাধককে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সাধারণ সামাজিক লোকে, বিশেষতঃ প্রতিবেশী মহলে প্রসাদকে মদ্যপায়ী বলিয়া অনেকেই ঘৃণা করিত; একদিন তিনি বলরাম তর্ক-ভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠির সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন—পাণ্ডিত্যাভিমানী তর্কভূষণ প্রসাদের অতুলনীয় সাধনার বিষয় কিছুই বুঝিতেন না, অথবা রামপ্রসাদের জ্ঞান

অষ্টপাশ-মুক্ত সাধককে বুঝিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। তাই তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"দেখ দেখ মাতালটা কোথায় যাইতেছে।" নির্ব্বিকারচিত্ত রামপ্রসাদের তিরস্কার পুরস্কার সমান জ্ঞান ছিল; তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় রাগান্বিত না হইয়া হাসিতে হাসিতে গাহিলেন :—

রসনে কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
এ কেবল বাদার্থ মাত্র পাঁজি পুঁথি ঘাঁটরে।
রসনারে কর বশ, শ্যামা নামামৃত রস,
তুমি গান কর, পান কর যদি সে পাত্রের পাত্র বটরে।
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
করে জপ কর অবিরাম কি তব উৎকটরে॥
শ্রুতি রাখ সত্বগুণে, দ্বিঅক্ষর ভাব ভাব মনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া (১), কালী বলে কাল কাটরে।

শাস্ত্রপাঠী তর্কভূষণ প্রসাদের দেখাদেখি, বিনা গুরুর সাহায্যে প্রাণায়াম সিদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধ হইতে না পারিয়া, শেষে দুরারোগ্য হাঁপানি রোগগ্রস্থ হইয়াছিলেন। প্রসাদ তাই পুনরায় গাহিলেন :—

রসনায় কালী কালী ব'লে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চ'লে॥
সুরাপান করিনেরে, সুধা খাই যে কুতুহলে,
আমি মনকে লয়ে মত্ত থাকি, যত মদ মাতালে মাতাল বলে।
খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল কয়,
যা আছে ধর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম, জানে কেবল সেই পাগলে।
দেখাদেখি সাধয়ে যোগ, নিজে কায়া বাড়ালে রোগ,
ওরে মিছামিছি কর্ম্মভোগ, গুরুবিনা প্রসাদ বলে॥ (২)

পণ্ডিত আপনার দোষ বুঝিতে পারিয়া, তখন চৈতন্য লাভ করিলেন এবং প্রসাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সেই দিন হইতে তাঁহাকে গুরুর মত মান্য করিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইতেন এবং সাধন-ভজনের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া রামপ্রসাদের

(১) রাগিণী জংলা—তাল একতালা।
(২) প্রসাদীসুর—তাল একতালা।

প্রতি পণ্ডিতের যে অভক্তিভাব ছিল, শেষে তাহা প্রগাঢ় ভক্তিভাবে প্রসাদকে জড়াইয়া ধরিল। পণ্ডিতকে হাঁপানি রোগে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিয়া পরোপকার-পরায়ণ রামপ্রসাদ তাঁহাকে প্রাণায়ামের প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিত তাঁহার উপদেশানুসারে প্রণায়াম শিক্ষা করিয়া রোগমুক্ত এবং বিশেষ প্রতিভাশালী হইয়া পাণ্ডিত্যের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মাতৃ-বিয়োগ ও সংসার-বিরাগ

এ জগতে যাঁহারা যে কোনও একটা বিষয়ে বিশেষ ভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই উন্নত ব্যক্তির মূলে হয় পিতৃ-ভক্তি, নয় মাতৃ-ভক্তি দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল রহিয়াছে। কি লৌকিক, কি পারলৌকিক সকল বিষয়েই এই নিয়ম। সম্প্রতি আমাদের দেশে যাঁহারা গণনীয় ও বরণীয় হইয়াছেন তাঁহারা কেহ সাতিশয় মাতৃ-ভক্ত ও সাতিশয় পিতৃ-ভক্ত হইয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করত মরজগতে আপন কীর্ত্তিধ্বজা চির-প্রথিত করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের সাধকপ্রবর রামপ্রসাদেরও মাতৃ-ভক্তি বড়ই প্রবলা ছিল। জননী সিদ্ধেশ্বরীকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবতীর মত ভক্তি করিতেন, তাঁহার আজ্ঞা দেবতার আদেশ জানিয়া যত অসাধ্য হউক না কেন. অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিতেন। বাল্যকালের এই ভক্তি প্রাবল্যই যৌবনে তাঁহাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। দেবীর আদর্শে নিজ জননীকে ভক্তিভাবে পূজা করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইয়া বিশ্বজননীকে এরূপভাবে বাঁধিতে সক্ষম হইয়াছিল যে, একদিন প্রসাদের কাছে তাঁহাকে কন্যারূপে গৃহের বেড়া পর্য্যন্ত বাঁধিতে হইয়াছিল।

পাছে মায়ের কোন কষ্ট হয়, মা কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন ভাবিয়া রামপ্রসাদ বৃদ্ধা জননীর জন্য কখন বাটী ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতেন না, সিদ্ধেশ্বরীও প্রসাদকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। বাটী আসিতে যদি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইত, তাহা হইলে সন্তানবৎসলা জননী ঘর-বাহির করিতেন, কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এই জন্য রামপ্রসাদ দেশ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন

না বা তাঁহার অনুমতি লইয়া কোথাও যাইলেও নির্দ্দিষ্ট দিনে বাটীতে আসিতেনই, নতুবা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রবোধ দেওয়া সকলের অসাধ্য হইত।

রামপ্রসাদ যৌবনের মাহেন্দ্রক্ষণে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সৌভাগ্যবলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সাধন-সঙ্গীত, তাঁহার কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, প্রভৃতি সকলের নিকট সমাদরে আদৃত ও গীত হইতে লাগিল। এইরূপ সুসময়ে, সন্তানের এইরূপ শুভ সংযোগের সময় সিদ্ধেশ্বরীর শরীর কিন্তু ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, বার্দ্ধক্য হেতু তিনি নানাপ্রকার জটিল ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরমতত্ত্বে তত্ত্ববান রামপ্রসাদ যদিও এখন মায়ামোহের অতীত, জগতের নশ্বরত্ব যদিও তিনি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মা ব্রহ্মময়ী ব্যতীত এ জগৎ-প্রপঞ্চ সমস্তই মিথ্যা, মা-ময় আত্মজ্ঞানী রামপ্রসাদ যদিও ইহার গূঢ়তত্ত্ব বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তথাপি জননীর পীড়ায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাংসারিক নিয়মানুসারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। সর্ব্বাণী পূজনীয়া শাশুড়ীর দৈহিক সুস্থতা লাভের জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাল যাহার নিকটবর্ত্তী, গণাদিন যাহার ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া রাখে কাহার ক্ষমতা? সিদ্ধেশ্বরীর পীড়া ক্রমশঃ কঠিনভাব ধারণ করিতে লাগিল। তিনি রামপ্রসাদের ন্যায় সাধকের গর্ভধারিণী, অতএব এ জগতে তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী, পুণ্যবতী রমণী আর কে আছে? তিনি আপনার সময় নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া বলিলেন,—“বাবা প্রসাদ! এখন তুমি আর আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইও না, আমার কাছে কাছেই বসিয়া থাক।” তিনি সজ্ঞানে ইষ্ট মন্ত্র-জপ করিলেন। অন্যান্য লোকের মত তাঁহাকে মৃত্যু-সময় তীরস্থ করা হয় নাই।

জননীর কথা শুনিয়া রামপ্রসাদ বলিলেন,—“মা! এই যে আমি তোমায় কোলে ক'রে বস্‌লাম; যে কষ্ট হ'চ্ছে, তার উপশমের জন্য ইষ্টনাম জপ কর, আমিও মাকে ডাকি।” এই বলিয়া রামপ্রসাদ গান রচনা করিয়া গাহিলেন:

মাগো কালী কালী বলনা।
কর পদধ্যান, নামামৃতপান, যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা।
ভাই-বন্ধু-দারা-সুত-পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
দুরন্ত শমন বাঁধ্‌বে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না।
দুর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গা নাম আমার,
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার, সকলি অসার ভেবে দেখ না।

গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখ না কালান্ত নিকটে এলো,
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী ব'ল, দূর হবে কালযম-যন্ত্রনা ॥ (১)

প্রসাদের গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরীরও জীবন-নাটকের যবনিকা পতন হইল। জননীর শবদেহ ক্রোড়ে প্রসাদ তখন সমাধিমগ্ন, মুদ্রিত নয়ন হইতে অবিরল ভক্তি-অশ্রু বিগলিত হইয়া জননীর পরলোকাভিমুখী আত্মাকে অভিষিক্ত করিতেছে। প্রসাদের বাহ্য-জ্ঞান নাই। সর্ব্বাণী শাশুড়ীর মৃত্যুতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। প্রসাদের ছোট ছোট পুত্র ও কন্যাগণ ঠাকুরমার শোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রতিবেশীবর্গ সে দৃশ্য দেখিয়া সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। সামাজিক নিয়মে রামপ্রসাদ কাহারও কাহারও অপ্রিয় হইলেও অন্য সময়ে সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত, শোকে-দুঃখে সমবেদনা অনুভব করিত। মাতৃবিয়োগে রামপ্রসাদ ক্ষণিক একটু ম্রিয়মাণ হইলেন, সাংসারিক হিসাবে এরূপ না করিলে সাধারণের পিতৃ-মাতৃ ভক্তি একেবারেই লোভ পাইতে পারে। জননীর মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ সামাজিক নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধও করিলেন। এবার কিন্তু সমাজপতিগণ তাঁহার প্রতি তত বিরূপ হইলেন না; মাতাল বলিয়া কেহ কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিলেন না।

তুমি যত বড় পণ্ডিতই হও, অর্থোপার্জ্জনে তোমার যতই কৃতিত্ব থাকুক না কেন, লোক-বল, তোমার যতই বর্দ্ধিত হউক না কেন, তুমি যতই সাধন-মার্গের উচ্চ চূড়ারূঢ় হইয়া বৈরাগ্য লাভ কর না কেন, এ জগতের সমস্ত মায়াময়, অতএব মিথ্যা বলিয়া যতই তোমার ধারণা বদ্ধমূল হউক না কেন, পিতৃ-মাতৃ বিয়োগে তোমাকে কিন্তু একটু না একটু ধাক্কা খাইতেই হইবে, তিলেকের জন্য জনক-জননীর অভাব তোমার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে দুঃখ প্রদান করিবেই করিবে। রামপ্রসাদ স্নেহময়ী জননীর অভাব বোধ করিলেন বটে, কিন্তু সামান্য লোকের মত একেবারে অভিভূত হইলেন না। আত্মা যখন অবিনাশী, তখন তাঁহার জননীর আবার মৃত্যু কি? বাল্য, যৌবন বার্দ্ধক্য যেমন দেহের অবস্থান্তর, মৃত্যুও তদ্রূপ। এই বলিয়া সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজা নবকৃষ্ণ সময়ে সময়ে আসিয়া রামপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। রামপ্রসাদ এই দুইজনকে পাইলে ধর্ম্মালাপে বেশ সুখে কালাতিপাত করিতেন, অন্য লোকের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় তাদৃশ উৎফুল্ল হইত না বা তিনি অপর কাহারও সঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিতেন না, তাঁহাদেরই গ্রামের একজন কর্ম্মকার রামপ্রসাদের বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, তাঁহার

(১) বসন্ত বাহার—একতালা

নাম ভজহরি। ভজহরি তদানীন্তন সময়োপযোগী কিছু কিছু লেখাপড়া জানিত, ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা ছিল। সংসারে তাহার কেহ ছিল না, বিবাহাদি করিয়া সে সংসারে জড়ীভূত হয় নাই, তাই প্রসাদের অধীনস্থ থাকিয়া, প্রায়ই তাঁহার সহিত অবস্থান করিয়া অনেকটা কাজের লোক হইয়াছিল। সময় পাইলে সে নিজেই কাজকর্ম্ম করিত; কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে বা বাধ্য ঠেকিলে, প্রাণের বন্ধু রামপ্রসাদের নিকট তাহার সমাধান করিয়া লইত। রামপ্রসাদ ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভজহরি সকল-বিষয়ে ভাল ছিল বটে, কিন্তু সংসারে তাহার আসক্তি বড় প্রবল ছিল, ইহার জন্য প্রসাদের সহিত সময় সময় তাহার মতান্তর হইত।

বন্ধু ভজহরি বৈকালে রামপ্রসাদের কাছে বসিয়া আছেন। রামপ্রসাদের আজ প্রাতঃকাল হইতেই যেন মায়ের অভাব বোধ হইতেছে, যেন তাঁর জন্য প্রাণ বড়ই উচাটন হইয়াছে, মায়ের সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি হৃদয়-পটে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ তিনি মাতৃ-পূজার আয়োজনে ব্যস্ত, সে দিন তিথিও বেশ প্রশস্ত ছিল। কাজেই তিনি ভজহরিকে তাহার আয়োজন করিতে বলিলেন। সে দিন শ্মশান-যাগ করিয়া মাতৃদর্শনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; তাঁহার সিদ্ধপীঠের কিঞ্চিৎ দূরে পল্লীর শ্মশান, * বেশ নির্জ্জন স্থান। ভজহরি প্রসাদের কথা মত তথায় সমস্ত পূজোপযোগী দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিল।

অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিল; অন্ধকার এতদূর জমাট বাঁধিয়াছে যে, কোলের মানুষ-পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না; তামস-প্রকৃতি নীরব নিস্পন্দ, ঝিল্লি দল শুধু 'ঝিঁ ঝিঁ' রবে তাহার নীরবতা মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। ইহাই সাধনার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া রামপ্রসাদ বন্ধুকে বলিলেন—"দেখ, তুমি এইস্থানে অপেক্ষা কর, রজনীযোগে ত' আর বাটী যাইতে পারিবে না?" ভজহরি তাহাই করিল। সেই সিদ্ধ-স্থানের নিকট বসিয়া, সেও ক্ষমতানুসারে লক্ষ জপের সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

রামপ্রসাদ শ্মশানে গিয়া আসন প্রস্তুত করিলেন; একটী মৃন্ময়-মূর্ত্তি গঠন করিয়া সম্মুখে রাখিলেন; সৌভাগ্যক্রমে সেদিন একটি চণ্ডালের শবদেহও শ্মশানে প্রথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। রামপ্রসাদ সেই শবোপরি উপবেশন করিলেন। শবের নাভিপদ্ম, নিজের মূলাধার পদ্মে সংযোগ করিয়া পদ্মাসনে

* কেহ কেহ বলেন রামপ্রসাদের এই কার্য্য 'বড়তির বিলে সংঘটিত হইয়াছিল।' এই স্থান ২৪ পরগনার শ্যামনগর ইচ্ছাপুরের মধ্যে অবস্থিত। প্রসাদের জীবনে ইহাই প্রধান কার্য্য, ইহাতে উত্তরসাধক ছিলেন একজন সন্ন্যাসী।

বসিয়া মায়ের উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। ভক্তাধীনা দয়াময়ী প্রথমে প্রসাদকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন; অভয়চিত্ত রামপ্রসাদ অশেষ সাহসের সহিত গাহিলেন—

'আমি কি আটাসে ছেলে।
আমি ভয় ক'রি না চোখ রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃৎকমলে,
নিজের বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে।
শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার ক'র্ব্বো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
জানাইব কেমন ছেলে, মোকর্দ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল-কালে।
মায়ে পোয়ে মোকর্দ্দমা, হবে রামপ্রসাদ বলে,
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত ক'রে লবে কোলে।"

রামপ্রসাদ চিরকালই বীরভাবের সাধক, ঠিক আব্দারে ছেলের মত তিনি বিশ্বজননীর নিকট জোর জবরদস্তী করিয়া কথা কহিতেন। নিতান্ত দীনতা প্রকাশ করিয়া তিনি মায়ের করুণা প্রার্থনা করিতেন না। উগ্রতপস্বী, বীর সাধক রামপ্রসাদের আহ্বানমাত্রেই মায়ের আসন টলিল; ভক্তের ভক্তি-ডোরে মা আমার চিরদিনই বাঁধা, কাজেই নিজের স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই, ভক্তের কাছে তাঁহার ন্যায় পরাধীন জগতে আর কে আছে? ভক্তের জন্য মা আমার কি না করিয়াছেন—সময়ে সময়ে তাঁহার যে এই সকল মূর্ত্তি পরিগ্রহ—তাহা আর কাহার জন্য, ভক্তের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নয় কি? আজ রাম-প্রসাদের ভক্তির আকর্ষণে আকর্ষিতা হইয়া করাল-বদনা, বিশ্বেশ্বরহৃদয়বাসিনী, বিশ্ববন্দিনী, ভুবনপ্রতিপালিকা মা আমার হাসিতে হাসিতে ভক্তকে কোলে লইবার জন্য শ্মশানে সমাগতা হইলেন। আমানিশার নিবিড় অন্ধকার তিরোহিত হইয়া কোটীচন্দ্রসমপ্রভায় শ্মশানক্ষেত্র প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিল, ভক্তগতপ্রাণা সন্তানবৎসলা মা সাধককে কোলে করিবার জন্য, তাঁহার অভীষ্ট ফল দানে সন্তোষ করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যেন কত আগ্রহের সহিত বলিলেন—"আয় বাপ্! ভক্তচূড়ামণি, তোকে কোলে করিয়া আমার তৃষিত প্রাণ শীতল করি। ভক্ত হৃদয়মন্দিরে ভক্তি-বিমল-পুষ্পে মানসোপচারে যে মূর্ত্তির পূজা করিতেছিলেন, সাধকের ধ্যানের সেই ধ্যেয় ধন, প্রাণের সেই আরাধ্য বস্তু, হৃৎকমলে আরোপিতা সেই মহিমাময়ী মূর্ত্তি

বাহিরে আসিলেন, সাধক প্রাণের দেবতাকে ভিতরে বাহিরে দেখিবার জন্ত তাঁহাকে সমানভাবে ভাবিবার জন্ত বাহিরে আসিলেন! সাধকের দিব্য জ্ঞানে গঠিত সেই মূর্ত্তি বাহিরে আসিল। ইহা কি মিথ্যা কল্পনা? ইহা যদি মিথ্যা হয়, তবে জগতে সত্যবস্তু আর কি আছে? প্রসাদ সমাধির অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে তাঁহার প্রস্তুত মাটির মূর্ত্তি সজীবতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, মূর্ত্তি যেন কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিতেছেন—প্রসাদ! এখনও এত কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনা কেন বাপ্! বাঁধা ত পড়িয়াই আছি।" প্রসাদ সে কথায় কান না দিয়া—সেই ভবারাধ্য পদে পুষ্পাঞ্জলি দিবার ইচ্ছা করিলেন, ইতস্ততঃ পুষ্প খুঁজিলেন, পাত্রস্থিত পুষ্প সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্ত চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন পার্শ্বের গাব গাছে অজস্র রক্তকোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে; সাধক হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা গ্রহণ করত প্রাণ ভরিয়া দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

আদ্যাশক্তি ভক্তি উক্তি যুক্তি মুক্তি-দায়িকা।
সিদ্ধ বিদ্যা রাধ্যা সাধ্যা শৈলসুতা বালিকা॥
হাস্য-আস্য সুপ্রকাশ্য দৃশ্য চারু নাসিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান-চন্দ্রিকা॥
রক্তপদ্ম রক্তগণ্ড মর্ত্ত্য-রক্ত-ভূষিকা।
পাদপদ্মে পদ্ম-পদ্মে পদ্মাসন-পূজকা।
সিংহ-পৃষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বষ্ট দৃষ্ট দুষ্ট-নাসিকা॥
ভদ্রকালী ভয়ানকা ভূত ঈশ-ভাবিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান-চন্দ্রিকা॥
মর্ত্ত্যে মত্ত সত্যযুগে দৈত্যকুল-ঘাতিকা।
চণ্ডমুণ্ড খণ্ড খণ্ড দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডিকা॥
পৃথ্বী রক্ষে পক্ষে বক্ষে বিরূপাক্ষ-বন্দিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান-চন্দ্রিকা॥
নিত্য-বস্তু নিত্যকালী নরমুণ্ড-মালিকা।
ইন্দি-নিন্দি হস্তে অস্ত্র অঙ্গ ইন্দু-ভালিকা॥
দম্ভে কম্পে স্বর্গ মর্ত্ত ভীম-ঘোর-ভাষিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান-চন্দ্রিকা॥
দীর্ঘকেশী দক্ষপুত্রী কুচ-পদ্ম-কালিকা।
ভক্তাধীনা দয়াময়ী অন্নপূর্ণা অম্বিকা॥

বিশ্বধাত্রী বিশ্বকর্ত্রী জীবিকাদি-পালিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান-চন্দ্রিকা ॥
লগ্না মগ্না রক্তারক্তি ঘণ্টা ঘণ্টি-ঘণ্টিকা।
দ্রোণ-পাণ্ডু-মুক্তাহার ঘোর-ঘন-রূপিকা ॥
অঙ্গে সব শব ভূষা সর্ব্বসুখ দায়িকা।
ত্বং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান-চন্দ্রিকা ॥
বর্ণে বর্ণে সাধ্য কার লোল জিহ্বা-আশ্রিকা ॥
পদ-প্রান্তে এ অশান্তে স্থান দেহ কালিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞান-চন্দ্রিকা ॥ *

সাধন ভজনের তীব্রতা সাধিত হইলে জীবের জীবন এইরূপেই ধন্য হয়, অশান্ত বালকের হাত এড়াইতে মায়ের সাধ্য কোথায়? তিনি যদিও নানাপ্রকার খেলনা দিয়া, নানাপ্রকার প্রলোভনের বস্তু চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করত আপনার লীলামাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। তৎপ্রদত্ত ধন যৌবন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, সাধের অট্টালিকা, দাস দাসী পরিশোভিত সংসার-আগার পাইয়াই আমরা ভুলিয়া যাই, আর কিছু আকাঙ্ক্ষা, আর কিছু স্পৃহা আমাদের নাই। তাই লীলাময়ী মা আমার লীলায় মত্ত ছায়াজাল বিস্তার করিয়া মায়ের সংসারে মায়াময়ী মার লীলা-খেলার একটানা স্রোত চলিয়াছে। ছেলে খেলায় মত্ত হইয়া শান্ত থাকিলে মায়ের প্রাণও শান্ত-সুস্থ থাকে, কিন্তু যদি কোনও ছেলে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া, জাগতিক মায়াখেলার প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া, নাছোড়বান্দা হইয়া মায়ের কোলে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হয়—মায়ের সাধ্য কি যে তাহাকে ফাঁকি দিতে পারেন? বাজীকরের মেয়ের ফাঁকিবাজী তাহার নিকট চলে না—যে অত্যন্ত আবদারের ছেলে, তাহার নিকট মায়ের কোনও বুদ্ধিই খাটে না। রামপ্রসাদ সমস্ত ভুলিয়া, জগতের সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মহারা হইয়া গাহিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার নিকট মায়ের কোন ক্ষমতাই খাটিত না। তাঁহার মত ভক্তের নিকট মায়ের সমস্ত ক্ষমতাই হার মানিয়া যাইত; হার মানিয়া যাইত বলিয়াই, আজ এই শ্মশানে বিশ্বজননীর আবির্ভাব। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, তাই আজ গাবগাছে পদ্ম পুষ্পের উদ্ভব। পাঠক! রামপ্রসাদের সাধন-সৌধের ভিত্তিমূল কতদূর দৃঢ় একবার অনুভব করুন। সময় সময় এইরূপ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের পদার্পণে ভারত চির পবিত্রতার আধার, দেব-বাঞ্ছিত স্বর্গভূমি হইয়াছিল, এ পবিত্র দেশে জন্মগ্রহণ করাও যে বহু সুকৃতির ফল—তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

* তৎকর্তৃক এই স্তবটী তাঁহার অনেক আত্মীয়ের নিকট শ্রুত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সর্ব্বাণীর ঐকান্তিকতা

রামপ্রসাদ ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রাতঃকালে সিদ্ধাসনে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—ভজহরি তখনও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা! শুধু জপ করিলেই কাজ হয় না, মানবের তন্ময়তা কই, মন যে সদাই উড়ু উড়ু করিতেছে সদাই সংসারের জন্য, আহার-বিহারের জন্য অস্থির হইতেছে, দুষ্ট মনটাকে কেমন করিয়া বশ করিতে পারা যায়, বল দেখি?"

রামপ্রসাদ। দাদা! একেবারেই কি হইবে? জপ করিতে করিতে তবে ত' চিত্তস্থির হইবে, চিত্তস্থির করিবার পরম ঔষধই হইল—জপ। উতলা হইও না, কাজ কর, সিদ্ধি আপনি আসিবে।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দুই বন্ধুতে বাটী গমন করিলেন। তখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত; প্রসাদ বাটীতে আসিয়া রন্ধনাদির কোন প্রকার আয়োজন দেখিতে পাইলেন না। পুত্র রামদুলাল ও কন্যা পরমেশ্বরী প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছিল, পিতাকে দেখিতে পাইয়া খেলা ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিল। প্রসাদ পুত্রকে কোলে করিলেন এবং পরমেশ্বরী একটু বড় হইয়াছিল বলিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"মা! এখনও খাওয়া দাওয়ার যোগাড় হয় নাই, এত বেলা হ'ল পাগ্‌লী কোথা গেছে?" রামপ্রসাদ স্ত্রী সর্ব্বাণীকে সময়ে সময়ে আদর করিয়া "পাগ্‌লী বলিয়া ডাকিতেন। কারণ সর্ব্বাণী বড়ই কার্য্য পাগ্‌লা ছিলেন. দিবারাত্রির মধ্যে কেবল চার পাঁচ ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন, তারপর সমস্ত সময় একটা না একটা কাজে ব্যাপৃত হইয়া থাকিতেন। সংসারের কোন কাজ না থাকিলে, তিনি প্রাঙ্গণের ঘাসগুলি তুলিয়া স্থানান্তর করিতেন, তথাপি বসিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন না; এই জন্য রামপ্রসাদ তাঁহাকে সময়ে সময়ে আদর করিয়া 'পাগ্‌লী' বলিয়া ডাকিতেন। সতী-সিমন্তিনী সর্ব্বাণী স্বামীর আদেশ দেবাদেশ বলিয়া মান্য করিতেন। রামপ্রসাদ ছাড়া তাঁহার যে আর কোন দেবতা থাকিতে পারে বা আছে, তাহা তিনি আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। প্রত্যহ তাঁহার স্বামী-পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। এ হেন সহধর্ম্মিণীকে দেখিতে না পাইয়া, রামপ্রসাদ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁরে! পাগ্‌লী, কোথায়?"

পরমেশ্বরী বলিল,—"বাবা! আজ ঘরে কিছুই নাই, কি ক'রে রান্না হবে? আমাদের জন্য মুড়ীমুড়কী ছিল, মা আমাদের সেই সব খাইয়ে, ঐ ঘরের ভিতর ব'সে আছে।"

সর্ব্বাণী তখন স্বামীর ধ্যানে তন্ময়, বাহিরে যে এত কথা হইতেছে, তাহা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। বাটীতে কিছু নাই শুনিয়া প্রসাদ বিচলিত হইলেন। কন্যা তৈল আনিয়া দিল, রামপ্রসাদ তেল মাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। কিছু তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবেন—ইহাই উদ্দেশ্য। অর্থাদি সংগ্রহ কেবল বৃথা শক্তির অপচয় করা, রামপ্রসাদের ইহা ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কর্ম্ম। ভগবান্ যখন জীব দিয়াছেন, তখন আহার যোগাইবার জন্য তিনিই দায়ী। পরম-বিশ্বাসী রামপ্রসাদের হৃদয়ে এ ধারণা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, তাই তাঁহার অভাব হইত না। মহারাজ প্রদত্ত এত জায়গীর, তাঁহার প্রজাদির নিকট এত খাজনা আদায় রামপ্রসাদ কখনও নিজে করিতে যাইতেন না। প্রজাগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহা কিছু দিত, কোন বৎসর অজন্মা হইলে, কেহ খাজনাও দিত না, প্রসাদ তাঁহার জন্য কোন প্রকার বিরক্ত হইতেন না, মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন, তাহার দ্বারা সর্ব্বাণী যাহা করিতেন—তাহাই হইত, তখনকার দিনে এত টাকা আয় সত্ত্বেও রামপ্রসাদের ঘরে সময়ে সময়ে অর্থের অভাব হইত। গৃহে অন্ন নাই, তজ্জন্য সাধক রামপ্রসাদের ভ্রূক্ষেপ নাই—তাহার জন্য মনে যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া, তাহার কিছুই হইল না। তবে চেষ্টা করিতে হয়—ইহা মায়ের আদেশ, তাই চেষ্টায় বাহির হইলেন। আনমনে বহু দূর যাইতে লাগিলেন; আর গাহিতে লাগিলেন :—

"মন হারাণী কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া,
তুই কাঁচমূলে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।
মিছে এদেশ ওদেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল জোড়া।
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়্ছে কেবল শালের কোঁড়া,
ওরে সেই কালের বিনাশ, ন্যাস ক'রবে মন্ত্র-সোঁড়া॥ *
প্রসাদ বলে ভাব্ছ কি মন, পাঁচ শোয়ারের তুমি ঘোড়া,
সেই পাঁচের কাছে প্যাঁচা প্যেঁচি, তোমায় ক'র্বে তোলাপাড়া॥

রামপ্রসাদের মনে তখন ছেলেপলের ভাবনা নাই। পুত্র কন্যাগণের ক্ষুধার

* সোডামন্ত্র—একপ্রকার মন্ত্র বিশেষ, যাহাতে ভয় নাশ হয়।

অন্ন নাই শুনিয়া গৃহের বাহির হইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া আর সে ভাব রহিল না। সাধন-সিদ্ধ হৃদয় না হইলে এরূপভাব আর কাহার পক্ষে সম্ভব?

এদিকে কন্যার মুখে কর্ত্তা গৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া সর্ব্বাণী প্রবুদ্ধ হইলেন এবং সাংসারিক কাজ কর্ম্মে মন দিলেন। রন্ধনের জন্য চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। ইতিমধ্যে—"কে আছ গা বাড়ীতে? ঘোষপাড়ার জলীর অংশে তোমাদের যে ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহার অর্দ্ধেক ভাগ আনিয়াছি—গ্রহণ কর" বলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রজা ধান্যপ্রদান করিয়া চলিয়া গেল। সর্ব্বাণী সেই ধান্য পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতিবেশীর নিকট হইতে সেদিনকার মত তণ্ডুল গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বাণী জানিতেন, কর্ত্তা যখন ঘরে আসিয়াছেন, তখন এ সামান্য বিষয়ের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। মনোমধ্যে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই, সর্ব্বাণী ইতিপূর্ব্বে চুল্লীতে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন।

বন্ধু ভজহরি রামপ্রসাদেরই আশ্রিত, তণ্ডুল পাওয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি প্রসাদকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন।

বৈকালে আহারাদির পর প্রসাদ যখন বন্ধু ভজহরির সহিত একত্রে বহির্ব্বাটীতে বিশ্রাম করিতেছেন, তখন ভজহরি বলিল—"আজ অধিক বেলায় আহার করিয়া শরীরটা যেন মেজ্ মেজ্ করিতেছে। ঠিক সময়ে আহার জুটবেই বা কিসে, একে দরিদ্র তার উপর চেষ্টা নাই, কাজেই এইরূপ হয়, কাঙ্গালের ছেলের "রঙ্গাই নাচ্" ভাল দেখায় কি? আগে আত্মরক্ষা তার ত' ধর্ম্ম. শরীর রক্ষা না ক'রলে ত ধর্ম্ম হবে না? পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন ভিন্ন, যে শরীর-রক্ষার আর অন্য উপায় নাই।" ভজহরি প্রসাদকে শুনাইয়া এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। ভজহরি অতি সরল প্রকৃতির লোক, তাই রামপ্রসাদ তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। ভজহরি সময়ে চারিটী খাইতে পাইলেই মহানন্দিত হইত। এই পরম হিতৈষী বন্ধুর অপর কেহ ছিল না বলিয়া মাতৃ-বিয়োগের পর হইতে রামপ্রসাদ তাঁহাকে নিজের আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন। ভজহরি কিছু কিছু লেখা পড়া জানিতেন, চরিত্র সুমার্জ্জিত, ধর্ম্মকর্ম্মেও তাহার বেশ আস্থা ছিল, তবে পেটের জ্বালা সে সহ্য করিতে পারিত না, আজ পেটের জন্য বড় কষ্ট পাইতে হইল বলিয়া ইঙ্গিতে প্রসাদকে এই সকল সাংসারিক উপদেশ দিতে লাগিল। আগে গরীবের অন্নের চিন্তা তারপর ধর্ম্ম-চিন্তা, অন্নচিন্তায় চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলে ধর্ম্ম হইবে কিসে? রামপ্রসাদ ভজহরির কথার উত্তরে একটী গান গাহিলেন :—

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ না রে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি-নিধি, দেখিস্‌রে তুই বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন-তোড়া বাঁধরে যতনে কসে,
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি অভয় চরণ পাবার আশে॥

রামপ্রসাদের জমিজমা অনেক ছিল, কেবল তাঁহার নিজের দোষে সব নষ্ট হইতেছে। ভজহরি তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিলেন—"দেখ ভাই প্রসাদ! তুমি সাধনা কর না, তাতে ত' ক্ষতি নাই, কিন্তু এ সবও ত' দেখিতে হ'বে; তুমি যদি না দেখ, তা হলে আর কিছুদিন পরে—সমস্তই নষ্ট হইবে। এত জমাজমি, টাকাকড়ি আসিবার এত উপায় থাকিতে তোমার পরিবারবর্গ কেন কষ্ট পাইবে?" ভজহরি সময়ে সময়ে প্রসাদকে বিষয়-রক্ষা বিষয়ে এইরূপে উত্তেজিত করিতেন, কিন্তু রামপ্রসাদ সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। বলিতেন—"ভাই! ইচ্ছা করি—তোমার কথা মত কাজ কর্ব্বো, কিন্তু কই পারি না ত, কেলেবেটী ক'র্ত্তে দেয় না। সে বেটী কাজ কর্ত্তে না দিলে ত' আর কর্ত্তে পারা যায় না, আর দেখ আমার সংসারও ত' তেমন অচল নেই। সংসারের কেহ ত' দুঃখ পাচ্ছে না, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেই ত' আনন্দময় দেখ্‌ছি; যা কিছু আনন্দ লাভের জন্যই ত'। যখন উহারা নিরানন্দ নয়, তখন মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, আমার ঐ সব ইচ্ছা যেন আর না থাকে—ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় বেশ সুখে চ'লে যাবে—ধর্ম্মপথে থেকে কার কবে সংসার অচল হ'য়েছে? তবে একটু কষ্টে। তা ভাই! কষ্ট না ক'র্‌লে কি কৃষ্ণকে পাওয়া যায়? কেলে বেটীর নাম ক'ল্লে যে জগতের কোন অসার চিন্তা আর মনের মধ্যে স্থান পায় না—আমি কি ক'রি বলো!" এই বলিয়া ভাবুক প্রসাদের প্রাণে ভাবের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, তিনি গাহিলেন,—

তারা নামে সকলই ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হ'রে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেম্নি ধারা তেমনি তো দেখায়॥

যেমন ঘরে বাইরে, দুর্গা বলে পায় না কোন ভয়,
মাগো, তুমি ত' অন্তরে আছ, তবু সময় বুঝ্‌তে হয় ॥
যার পিতামাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়' ওমা তারা
তনয়ের ভিটেয় টেঁকা, এ বড় সংশয় ॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা প্রসাদ পাওয়া দায়, ওরে ভাই-
বন্ধু থেকে নাকো রামপ্রসাদের আশায় ॥ *

এই গানে ভজহরিকে যেন একটু ইঙ্গিত করিয়া বলা হইল। প্রসাদের সঙ্গে থাকিয়া ভজহরির প্রাণও কতকটা রিপুর দাসত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। তবে রামপ্রসাদ হেন সাধকের পুত্র-পরিবার যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে—ইহাই তাহার ইচ্ছা, এইজন্য সে রামপ্রসাদকে আপনার মত ভাবিয়া উপদেশ দিত। কিন্তু সামান্য অধিকারী ভজহরি জানিত না যে মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত এ জগতের কোন কার্য্যই হইতে পারে না। তিনি যদি রাখেন, ত' মারে কার সাধ্য, আর তিনি যদি মারেন, ত' রাখে ত্রিজগতে এমন কে আছে? ভজহরি প্রসাদের গান শুনিয়া আর কোন কথা বলিল না, মনে কোন দুঃখ করিল না, বুঝিল ইহার প্রাণ যে দিকে অগ্রসর হইয়াছে—সামান্য সাংসারিক চিন্তার দ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনা দুষ্কর, অতএব বৃথা একজনকে সৎপথে বাধা দিয়া আমি নিমিত্তের ভাগী হইয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হই কেন? মা যাহা করিবেন তাহাই হইবে। সেই দিন হইতে ভজহরি আর রামপ্রসাদকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিত না। সে রামপ্রসাদের উপদেশ মত ভগবানের নাম করিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। নির্জ্জনে পাইলে সে রামপ্রসাদের নিকট হইতে সাধন বিষয়ে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বুঝাইয়া লইয়া ভক্তিভাবে হৃদয়ের ঘোর অন্ধকার অপনোদিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

রামপ্রসাদ আজ দুই তিনদিন হইল, গৃহেই আছেন—সিদ্ধাসনে যান নাই, ঘরে বসিয়াই কেবল ব্রহ্মময়ীর নাম গানে মনের মত্ততা জানাইয়া বিভোর হইয়া আছেন। পুত্র কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতিকে লইয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন; তিনি প্রত্যেক বস্তুতেই মায়ের বিভূতি দেখিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। রামপ্রসাদ যখন সিদ্ধাসনে দিনযাপন করিতেন, সর্ব্বাণী তখন ধ্যান-পরায়ণা হইয়া দেবতার ন্যায় স্বামীর রূপ-সুধাপান করিয়া প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্তি করেন, কারণ সিদ্ধাসনে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ, বিশেষতঃ ছোট ছোট পুত্রকন্যা লইয়া সেই সিদ্ধাসনে যাইলে পাছে কোন অপরাধ হয়, এইজন্য

* রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

সর্ব্বাণী তথায় যাইতেন না। প্রতিদিন স্বামীর পূজা ও ধ্যানে তাঁহার দর্শন-লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেন। এ কয়দিন দেবতা সাক্ষাৎকার, জড়চক্ষুর গোচরীভূত, কাজেই তাঁহার আনন্দের পরিসীমা নাই। সংসারে আর কোনও অভাব হইতেছে না, চারিদিক্ হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আসিয়া পড়িতেছে। সর্ব্বাণী প্রাণ ভরিয়া দেবতার ভোগ প্রদান করিতেছে। রামপ্রসাদের আগমনে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ভজহরি মনে মনে ভাবিতেছে—"হায়! আমি না বুঝিয়া প্রসাদকে কত বাজে কথায় বিরক্ত করিয়া থাকি. যে সাধনায় সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে আপনার করিয়া বাঁধিতে পারিয়াছে, এ জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে তাহার আবার অভাব কি? হীনবুদ্ধি আমি, না জানিয়া, না বুঝিয়া এরূপ মহাপুরুষকে কত কথাই বলিয়া থাকি। মা! পতিতপাবনি! আমার মত পতিতজনকে নয়নের অন্তরালে রাখিও না, আমিও তোমার একজন অকৃতি কুপুত্র—মা! প্রসাদের মুখ দিয়াই ত' তুমি বলিয়াছে—কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়। মা! এ কথার সার্থকতা এ দাসের প্রতি দেখাইয়া দীনকে উদ্ধার ক'রো-মা।"

এইরূপে রামপ্রসাদের সঙ্গ করিয়া, ক্রমশঃ ভজহরি ধীরে ধীরে হৃদয়ে শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিল।

সাধনমার্গে উত্তীর্ণ হইতে হইলে প্রথমতঃ কর্ম্মযোগ, পরে জ্ঞানযোগ তৎপরে ভক্তিযোগ আশ্রয় করিতে হয়, এই ত্রিবিধযোগ-সাধন দ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। আর্য্যশাস্ত্রে এই ত্রিবিধ উপায়ই শ্রেষ্ঠ এবং অভিলষিত ফলপ্রাপ্তির প্রকৃত পন্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভালমন্দ, সুগম, দুর্গম নাই। যাহারা প্রকৃত ভক্ত তাহাদের সাধনাই চরম লক্ষ্য। অন্য লক্ষ্যের কথা দূরে থাক্, ভগবানকে ছাড়া তাঁহারা মোক্ষপদকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এই ত্রিবিধ পথকেই আর্য্যশাস্ত্র তারস্বরে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। যিনি যে আশ্রমে অবস্থিত, তিনি সেই আশ্রমানুযায়ী কর্ম্ম করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

রামপ্রসাদ সাধনার চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইলেও, ভক্তির প্রবল বন্যায় হৃদয়-ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুকূলে কার্য্য করিতেন, তিনি সংসারী ছিলেন বলিয়া সংসার ধর্ম্মের যাবতীয় প্রথা প্রতিপালন করিয়া চলিতেন। আর্য্যশাস্ত্র প্রদর্শিত এই ত্রিবিধ পন্থার মধ্যে তিনি কাহাকেও নিকৃষ্ট মনে করিতেন না। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ জানিতেন—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনের সমন্বয় না হইলে প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। এ পন্থা নিকৃষ্ট,

উহা উৎকৃষ্ট, এইরূপভাবে উপাসনা বিড়ম্বনামাত্র—তাহাতে ঈশ্বর লাভ ত' পরের কথা, সাংসারিক কোন কাজেও শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায় না। যিনি যথার্থ জ্ঞানী হইয়াছেন—তাঁহাকে কর্ম্ম ও ভক্তির আশ্রয় লইতেই হইবে। যিনি ভক্ত—তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন ভক্তি পাইবার উপায় নাই, আর যিনি কর্ম্মী—তাঁহাকে জ্ঞানী ও ভক্ত হইতেই হইবে।

মূল কথা এই যে, যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী সাধক তাঁহাদের হৃদয়ে কখন কপটতা স্থান পাইতে পারে না। তাঁহাদের ন্যায় অল্পবৃক্ষের নিকট যাহা চাহিবে—তাহাই পাইবে। নারদাদি ঋষিগণ পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা যে কর্ম্ম করিতেন না বা জ্ঞানী ছিলেন না, তাহা কে বলিবে? সনক, সনাতন, শুকদেব গোস্বামী, জনক রাজা পরম জ্ঞানী ছিলেন, তাঁহারা যে ভক্ত ছিলেন না এবং কর্ম্ম করিতেন না—তাহা বলা সঙ্গত নহে। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী পরম শাক্ত-ভক্ত রামপ্রসাদ তাই পরম জ্ঞানী হইয়াও আশ্রম ধর্ম্মের অনুরোধে সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া, স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালন করিয়াও জগদারাধ্যা বিশ্বজননীকে ভক্ত-শৃঙ্খলে বিধিমতে শৃঙ্খলিত করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মাতুলের মৃত্যু

রামপ্রসাদ বাড়ীতে থাকিলে, পাড়ার অনেক লোক তাঁহার নিকট গান শুনিতে আসিত এবং তাঁহার সেই ভক্তিরসাপ্লুত সাধন-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ সকলে এই শাক্ত-ভক্ত রামপ্রসাদকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদ এবার প্রায় দুইমাস হইল, বাড়ীতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। বন্ধু-বান্ধবের সহিত স্থানান্তরেও যাইতেন না। কেবল অমানিশার দিন বা অন্য সাধন-শুদ্ধ তিথিতে সিদ্ধাশ্রমে যাইতেন; আবার পরদিন প্রাতঃকালে ঘরে ফিরিয়া আসিতেন। শুনা যায়, এই সময় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের জন্ম হয়। রামপ্রসাদ একদিন আহারাদির পর পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া ক্ষেত্রের কর্ম্ম করিতেছেন, আর গাহিতেছেন;—

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রইলো পড়ে, আবাদ
ক'ল্লে ফ'ল্তো সোনা।

কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছ্‌রূপ
হবে না, সে যে মুক্তকেশীর শক্তবেড়া,
তার কাছে ত' যম যাবে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না,
এখন আপন ভেবে যতন ক'রে,
চুটিয়ে ফসল্ কেটে নে না।
গুরু রোপণ ক'রেছেন বীজ, ভক্তিবারি
তায় সেঁচনা, ওরে একা যদি না পারিস
মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।

মরি, মরি, ভাবের কি আবিলতা, মাতৃনামে হৃদয়ের কি দৃঢ় বিশ্বাস-ভক্তি! পুত্রকন্যাগণ পিতার ভাব দেখিয়া যেন একরূপ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সহিত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। দুই কার্য্য কখনও একসঙ্গে হয় না, কিন্তু প্রসাদের কার্য্য দেখিলে একথার সত্যতা প্রমাণ হইত না। প্রাণের আবেগে গান গাহিতেন বলিয়া যে, কাজে হাত বন্ধ হইত—তাহা নহে। দুই দিক্ ঠিক সমভাবেই চলিত।

রামপ্রসাদ বাগানে কার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র প্রদান করিল। রামপ্রসাদ প্রকৃতিস্থ হইয়া পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র-খানি পাঁচপাড়া গ্রাম হইতে তাঁহার মাতুল মহাশয় লিখিয়াছেন। উক্তগ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছে, অজস্র লোক মারা যাইতেছে, তিনিও শয্যাগত, একপ্রকার মৃত্যুমুখে পতিত. বাঁচিবার আশা নাই, তাই অপুত্রক মাতুল ভাগিনেয়কে পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দিয়াছেন। মাতুল মাতুলানীর ভালবাসায় রামপ্রসাদ চিরমুগ্ধ, তাঁহারা রামপ্রসাদকে যেরূপ ভালবাসেন, আপন পুত্রকন্যাকেও লোকে সেরূপ ভালবাসে না, পাঠক তাহার নিদর্শন পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

মাতুলের আসন্ন অবস্থা শুনিয়া প্রসাদ সপরিবারে তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং ভজহরিকে কুমারহাটীর বাড়ীর ভার দিয়া পরদিন প্রভাতে সপরিবারে মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের সেই ভয়ানক অবস্থার সময় রামপ্রসাদকে সপরিবারে আসিতে দেখিয়া সকলেই বলিল,—"বাবা! তুমি একা এলেই হ'তো, ছেলেপিলেদের এ সময় নিয়ে এলে কেন, এখন গ্রামের অবস্থা বড়ই খারাপ শুনেছো ত?" রামপ্রসাদ—"আজ্ঞে হ্যাঁ! সব শুনেছি, কিন্তু প্রাণের মায়া করিয়া বসিয়া থাকিলে ত' মাতুলের সহিত দেখা হয় না? তিনি

যে সকলকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে ব'লেছেন, তাঁহার আজ্ঞা ত' শিরোধার্য্য কর্‌তে হবে—তারপর মা যা করেন, কপাল ছাড়া ত' পথ নাই।" এই বলিয়া তিনি মৃতকল্প মাতুলের নিকট গমন করিলে।

প্রসাদের মাতুল মনে করিয়াছিলেন—প্রসাদ একপ্রকারের লোক, সে কি আবার আসিবে! কিন্তু আজ তার মুমূর্ষু সময়ে তাঁহাকে সপরিবারে আসিতে দেখিয়া, তাঁহার প্রাণে আনন্দের তুফান বহিতে লাগিল। এ সময় মৃত্যু হইলে তাঁহার যে সদ্গতি হইবে, সাধকাগ্রগণ্য ভাগিনেয়ের অগ্নি প্রাপ্ত হইবেন—ইহাতে কোন্ অপুত্রক ব্যক্তি না পুলকিত চিত্ত হয়? মাতুল সাধক রামপ্রসাদকে আহ্বান করিয়া নিকটে বসিতে বলিলেন এবং ইতিপূর্ব্বে বধূমাতাকে (সর্ব্বাণী) তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতে দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদের মাতুলানী তাঁহার পুত্রগুলিকে লইয়া ভিন্ন কক্ষে আহারাদি প্রদান করিতে গমন করিলেন।

প্রসাদ পীড়ার অবস্থা এবং চিকিৎসা কিরূপ হইতেছে—প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মাতুল মহাশয় অতি ক্ষীণ কণ্ঠে, জড়িত-স্বরে বলিলেন,—"বাবা! গ্রামে দেবতার প্রকোপ পড়িয়াছে, রাত্রিদিনে প্রত্যহ প্রায় ৪।৬টী করিয়া মারা যাইতেছে, অতএব কে কার চিকিৎসা করে, যে ডাক্তারটী গ্রামে ছিলেন, তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া দেশ ছাড়িয়া পালাইয়াছেন। আমি যে আজ একরাত্রি একদিন জীবিত আছি, বোধহয় মায়ের ইচ্ছায় তোমার সহিত দেখা হইবে বলিয়া। বাবা! আমি ত' চলিলাম, আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির অধিকারী তুমি, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তুমি আমার এই সম্পত্তি ভোগদখল কর, আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও, পুত্রগুলিও দীর্ঘজীবন লাভ করুক। আমার পুত্রাদি কেহ নাই বলিয়া আমার ভিটা যেন সন্ধ্যায় আলোকহীন না হয়, তুমি এই ক'রো। দিদি (প্রসাদের মাতা) অগ্রে গিয়াছেন—আমিও তাঁহার নিকটে চলিলাম, তোমার অনাথা মাতুলানীকে লইয়া সুখে এইস্থানে বসবাস ক'র। আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গ্রামের এই দারুণ বিভীষিকা যাহাতে নষ্ট হয়, গ্রাম যাহাতে জনশূন্য না হয় মাতৃভক্ত! মাকে ডাকিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের আশু মঙ্গল বিধান কর।"

ধার্ম্মিক মাতুল এই কথাগুলি শেষ করিবার জন্যই যেন জীবিত ছিলেন। মা যেন প্রসাদের ন্যায় সাধনাপূত, সুসিদ্ধ সাধকের সহিত দেখা করাইয়া দিয়া তাঁহার অন্ধকারময় জীবন-পথ আলোকিত করিবার জন্যই এতক্ষণ জীবিত রাখিয়াছিলেন। কথাগুলি শেষ হইবামাত্রই মাতুল মহাশয় একবার ভেদ আর

একবার বমি করিয়া উত্তার নয়নে প্রাণত্যাগ করিলেন। রামপ্রসাদের মাতুল হরমোহন গুপ্ত গ্রামের সকলের প্রিয় ছিলেন—তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। রামপ্রসাদ মাতুলের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হইলেন, কারণ তিনি তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। সর্ব্বাণী "মামা গো! আমরা কি কুক্ষণেই এসেছিলাম" বলিয়া কাদিয়া উঠিলেন। মাতুলানী স্বামিবিয়োগে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু এ সকলে করাল কৃতান্তের যায় আসে কি! সে যে লোলরসনা বহির্গত করিয়া সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছে, এ মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না বরং ঐ সময় আরও দুইজনকে হরিধ্বনি দিয়া নিকটবর্ত্তী শ্মশান-ঘাটে যাইতে দেখা গেল। রামপ্রসাদ গ্রামের উপর মায়ের দারুণ প্রকোপ দেখিয়া দুঃখের হাসি হাসিতে হাসিতে মাতুলানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে দয়াময়ী মায়ের এমন কুদৃষ্টি পড়িল কেন?"

মাতুলানী বলিলেন—"বাবা! সেই যে ও পাড়ার জমিদার আছে জানো ত' তারা কতকগুলি পাড়ার লোকেরপরামর্শে বহুদিনের কালীপূজার জমিখানি দখল ক'রে নিয়েছে। যে দিন হ'তে এই কাজ হ'য়েছে, সেদিন হ'তেই এই বিপদের সূত্রপাত; জমীদারের বংশ ত' নির্ব্বংশ প্রায় হ'ল, এখন দায়ে প'ড়ে জায়গা ত' ছেড়ে দিয়েছে; কত পূজাদি মানসিক ক'র্চ্ছে তবু কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না।"

রামপ্রসাদ বলিলেন—"মায়ের আসন টলাইয়াছে, তাই তাঁর এরূপ কোপ-দৃষ্টি পড়িয়াছে নতুবা দয়াময়ী মা কি কখনও সন্তানের উপর রাগ করেন?"

রামপ্রসাদ আর কোন কথা না শুনিয়া, মাতুলের সৎকারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। ভক্তবীর রামপ্রসাদ কালভয়নিবারণী কালিকার প্রিয়পুত্র। ঘটনাক্রমে তিনি গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া, সকলেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল। জমীদার ভবনে এ সংবাদ পৌছালে, তাঁহারা আসিয়া রামপ্রসাদের নিকট কালিকার এ কোপদৃষ্টি নিবারণের জন্য প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

"এখন ত' মাতুলের সৎকার করিয়া আসি, এ কার্য্যত অগ্রে, তারপর মড়ক সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিব।" এই বলিয়া প্রসাদ শ্মশানে শবদেহ নীত করিলেন। পাড়ার অনেক লোক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। শ্মশানে চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া প্রসাদ যথাবিধি শব সংস্কার করিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। বোধ হইল—যেন অগ্নি প্রসাদের হস্তের পবিত্রতা লাভ করিয়া, তাঁহার মাতুলের পবিত্র দেহ আশু গ্রাস করিতে লাগিল।

অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল—প্রসাদ একস্থানে বসিয়া ভাবমগ্ন হইলেন, জীবের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহার ভাব-সমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল॥ শ্মশানের চারি-ধারে তাঁহার ইষ্ট-মূর্ত্তি যেন জীবোদ্ধারের জন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—দেখিতে পাইলেন। বরাভয়-দায়িনী মায়ের চিরকালই সমভাব, আবার মাকে যে কঠিনা বলে সে মায়ের মহিমা কিছুই বুঝে না। ঐ যে পরকাল-নিস্তার কর্ত্রী মা আবেশ-বিহ্বলা ঘোরাননা স্খলিত-বসনা হইয়া যেন সন্তানের মঙ্গলের জন্য পাগলিনী প্রায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, প্রসাদের এই ভাব হৃদয়ে উদয় হইবামাত্র গাহিলেন :—

মাগো কেন ল্যাংটা ফেরো!
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসন ভূষন নাই মা তোমার, রাজার মেয়ে গৌরব কর,
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর।
আপনি ল্যাংটা, পতি ল্যাংটা, শ্মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে, এবার তুমি বসন প'রো॥

প্রসাদকে এই মন-মাতান মধুর মাতৃনাম গাহিতে দেখিয়া সকলেই কাছে বসিল। শ্মশানের যেন সে ভীষণতা ছুটিয়া গিয়াছে, শ্মশান-রৌদ্র যেন কঠিনতার মধ্য দিয়া কোমলতার স্রোত বহাইয়া গিয়াছে, সে প্রাণ উত্তাক্তকর সূর্য্যরশ্মি যেন কাহারও গায়ে লাগিতেছে না; সকলেই ধীর স্থির ভাবে শ্মশানের তৃণ-মণ্ডিত ভূমিতলে বসিয়া আগ্রহ দৃষ্টিতে প্রসাদের মুখের প্রতি তাকাইয়া আছে, কিয়ৎক্ষণ পরে সাধকের প্রাণোন্মাদকারী সুধাময় সঙ্গীত আবার সমুচ্চারিত হইল :

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল পদে মহাকাল,
তার কেন রূপ কাল হ'লো॥
কাল মেয়ে ত' অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কালো,
যাকে হৃদয় মাঝে রাখলে পরে, হৃদিপদ্ম করে আলো!
রূপে কালী নামে কালী, কাল হ'তে অনেক কালো,
ওরূপ যে দেখেছে, সেই মজেছে, অন্যরূপ তার লাগে না ভাল।
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল,
না দেখে নাম শুনে কাণে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'লো।

এই সময় সকলে একবার প্রাণ ভরিয়া শ্মশানের মুক্ত বায়ুকে আলোড়িত

করত ভক্তিভরাচিত্তে সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, তদ্‌গতচিত্ত প্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন, নিমীলিত নয়নের কোণ হইতে দরবিগলিত প্রেমাশ্রু পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সকলে সেই ভাব দেখিয়া অশ্রু-পরিপ্লুতনেত্রে বলিতে লাগিল "ইহাই না সার্থক জন্ম, মানুষের এইরূপ জন্মই না প্রার্থনীয়! মা! কত জন্ম জন্মান্তর সাধন করিলে জীবকে তুমি এইরূপে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়া সমস্ত নিষ্কণ্টক করিয়া দাও! ধন্য প্রসাদ! তুমিই যথার্থ কলির ভক্তচূড়ামণি, আমরাও আজ তোমার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কে শুনে, আর কে তার উত্তর দেয়? প্রসাদ তখন কি এরাজ্যে আছেন? তিনি যে পরম পবিত্র ভাব-রাজ্যে চৈতন্যময়ীর চরণ তলে বসিয়া পার্থিব চেতনা শূন্য হইয়াছেন। প্রসাদ আবার গাহিলেন :—

তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগৎ মনোমোহিনী মা এলোকেশী।
কালোর গুণ ভাল জানে শুক শম্ভু দেবঋষি,
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালোরূপ তার হৃদয় বাসী।
কালবরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী,
হ'লেন বনমালী কৃষ্ণকালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি।
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী,
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে পূর্ণিমা শশী।
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামেশি,
ওরে, একে পাঁচ, পাঁচেই এক, মন ক'রোনা দ্বেষাদ্বেষী॥

সকলের হৃদয়ভেদী হরিনাম প্রসাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র হৃদয়ে তাহার সেই শ্রীবৃন্দাবনের ভাব উদয় হইল। প্রসাদ কখনও দ্বেষাদ্বেষী ভাব হৃদয়ে পোষণ করতেন না। তিনি শৈব বৈষ্ণবদিগকে সমান চক্ষে দেখিতেন তাই হরিনামে তাঁহার হৃদয় মোহিত হইয়া অভেদ ভাবের এই সঙ্গীত নিঃসৃত হইল। এরূপ সঙ্গীত প্রসাদ অনেক রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডে কেবল মায়েরই রূপ দেখিতেন। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেও তিনি ইষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া বিভোর হইতেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে তিনি মাতৃসত্তা অনুভব করিতেন, তাই জগতের প্রত্যেক বস্তু তাঁহার এত আদরের এত প্রিয় বলিয়া বোধ হইত।

এই সময় মাতুলের বিশাল দেহ ভস্মসাৎ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ হইবার উপক্রম

হইল। সকলে আবার হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন প্রসাদের চমক ভাঙ্গিল, তিনি বুঝিলেন—সব শেষ হইয়াছে। জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহের শেষ পরিণাম ভস্ম—ইহা পবিত্রতাময়, তাই ভোলা চিতাভস্ম মেখে পাগল হয়ে বেড়ায়। রামপ্রসাদ সেই পবিত্র চিতাভস্ম গায়ে মাখিলেন, তারপর চিতাগ্নি জলে ধুইয়া ফেলিলেন। পাথিব ক্রিয়া সকল শেষ করিয়া সকলে পরকাল-সম্বল হরিধ্বনি করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। প্রসাদ পথে গান ধরিলেন :

ভেবে দেখ মন, কেউ কারু নয়, মিছে ঘোর ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্যে কর্ত্তা ব'লে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তারে ফেল্‌বে টেনে, কালাকালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্যে মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে,
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া' অমঙ্গল হ'বে ব'লে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে,
তখন ডাক্‌বি কালী তারা ব'লে, কি করিতে পার্‌বে কালে।*

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটী ফিরিয়া প্রসাদ লৌকিকাচারে অশৌচ গ্রহণ করিলেন। তিনদিন অশৌচান্তে শুদ্ধ হইয়া রামপ্রসাদ মাতুলের লোকাচারে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও সম্পন্ন করিলেন; লোকজন যথেষ্ট খাওয়ান হইল। সংসারে আসিয়া তুমি যতই জ্ঞানী হও, এ সকল না কর, মহাদোষ, তাহাতে শাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়—কর্ম্মকাণ্ড পণ্ড করা হয়, লোক-শিক্ষার দোষ ঘটে, এইজন্য প্রসাদ হেন জ্ঞানী ব্যক্তিও কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করেন নাই। আর আজকাল হীনবুদ্ধি, অহংমত্ত আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি—"শ্রাদ্ধ আবার কি, মরা গরু কি ঘাস খায়?" আমাদের এইরূপ বুদ্ধির দোষেই ত' এত দুরবস্থা হইতেছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মড়কের প্রতিকার

রামপ্রসাদের মাতুলের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসম্পন্ন হইলে, গ্রামস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল আসিয়া রামপ্রসাদকে মড়কের প্রতিকার কল্পে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। তখনও গ্রামে পূর্ণমাত্রায় লোক মরিতেছে, গ্রামখানি একপ্রকার উজাড় হইয়া

* গাঢ়া ভৈরবী—তাল যৎ।

গেল। দিবারাত্র হরিধ্বনি এবং আত্মীয়বর্গের গগনভেদী ক্রন্দন ধ্বনিতে আর কাণপাতা যায় না। যে পাঁচপাড়া গ্রামে একদিন কত দিন দরিদ্র প্রতিপালিত হইয়া দাতাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিত, হায়! আজ সেই পাঁচগ্রাম দৈবকোপানলে পড়িয়া শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই সকলের চমক ভাঙ্গিয়াছে, দৈবের শান্তিবিধানের জন্য তাই সাধক-প্রসাদের নিকট সকলে হিতোপদেশ প্রার্থনা করিতেছে।

গ্রামের ব্যাপার দেখিয়া রামপ্রসাদ হেন সাধকের প্রাণও চঞ্চল হইয়া উঠিল, দয়ার্দ্র সাধু-হৃদয়ও বিচলিত হইল। তিনি বলিলেন—"দেখুন, যাগযজ্ঞ দ্বারা দৈবকে সন্তুষ্ট করাই এখন একান্ত কর্ত্তব্য, মায়ের কৃপা ভিন্ন এ বিপদ হইতে উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আপনারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দেবীর পূজাপীঠে মায়ের আবাহন করুন।"

সকলেই প্রসাদকে সেই কার্য্য সমাহিত করিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রসাদ বলিলেন—"তাহা কি কখনও হইতে পারে, ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আমি বৈদ্য হইয়া কেমন করিয়া করিব? ইহাতে সামাজিক নিয়মে দোষ পড়ে, শাস্ত্রের নিয়মভঙ্গ এবং ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করার পাপভাগী হইতে হয়। তবে আগামী শনিবার আপনারা সাধারণভাবে কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। তৎপরে যাহা করিতে হয়, আমি শ্মশানের এক নিভৃত স্থানে তাহা করিব।"

রামপ্রসাদের ন্যায় বিশ্বেশ্বরীর বরপুত্রও ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। সাধারণ কার্য্য ব্রাহ্মণের দ্বারা সমাধা না করিলে হিন্দুশাস্ত্রের অপমান করা হয়, ইহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে সকল সময় সকলের নিকট বলিতেন, সাধারণ গৃহকার্য্যে তিনি নিজেও ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় লইতেন, তাঁহাদের দ্বারাই গৃহে অনুষ্ঠিত যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সমাধা করিতেন। তিনি পুরোহিতকে দেবতার ন্যায় মান্য করিতেন। যে রামপ্রসাদ কালীর বরপুত্র, যিনি জগতের প্রত্যেক বস্তুতে জগন্ময়ীর সত্তা অনুভব করিতেন, যাঁহার প্রাণারাম সঙ্গীত শ্রবণের জন্য মা আমার সদাসর্ব্বদা লালায়িত হইতেন, যিনি জ্ঞানময় মহাপুরুষ, স্বয়ং সেই রামপ্রসাদই লোকশিক্ষার্থ বিপ্রগণকে যথোচিত মান্য করিতেন, আর আজকাল নগণ্য আমরা প্রতি কথায় বলিয়া থাকি—"ও ব্রাহ্মণ কিছু জানে না, উহার দ্বারা কাজকর্ম্ম করাইলে কোন ফল হইবে না—হায়রে শিক্ষা!"

যেদিন পরামর্শ হইল, তাহার পরদিনই শনিবার, বিপদ যেরূপ ঘনীভূত তাহাতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। পরদিনই সাধারণভাবে গ্রামে কালীপূজার অনুষ্ঠান করা হইল। গ্রামের পুরোহিত তখন প্রাণভয়ে গ্রাম

ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। কাজেই রামপ্রসাদ তাঁহার পরিচিত একজন ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ সাধু-প্রকৃতি ব্রাহ্মণকে আনাইয়া কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। গ্রামের সকলেই সংযতভাবে প্রসাদের উপদেশমত দেবীর তুষ্টিসাধনে প্রাণপণ করিতে লাগিলেন।

আর প্রসাদ সন্ধ্যার প্রিয়বন্ধু ভজহরিকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে শ্মশানবাসিনীর সেবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গোপনে তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইল। বলা বাহুল্য—এই ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে জানিয়া, প্রসাদ পূর্ব্ব হইতেই বন্ধু ভজহরিকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ গভীর রজনীযোগে শ্মশানে দেবীর আরাধনায় রত হইলেন। সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ জপ আরম্ভ করিলেন। ইষ্টমন্ত্র জপই সিদ্ধিলাভের অমোঘ উপায়; "জপাৎসিদ্ধি", তদ্ভিন্ন কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। প্রথমে আসন প্রস্তুত করিয়া বীর-সাধক তদুপরি উপবেশন করিয়া একটী সাধনসঙ্গীত রচনা করিয়া প্রাণের সহিত তাহা গাহিলেন:

তুই যারে, কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ ক'রেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি,
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি॥

এদিকে সাধারণের পূজা হইতে লাগিল আর ওদিকে শক্তিসাধক রামপ্রসাদ শ্মশানে শক্তির উদ্বোধন করিয়া যাহাতে মড়ক নিবারণ হয়, অকাল মৃত্যু হইতে যাহাতে লোক সকল রক্ষা পায়, তজ্জন্য মায়ের উপাসনায় রত হইলেন। রামপ্রসাদ একটী পাত্রে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে মাকে ডাকিতেছেন, ভক্তের প্রাণভরা ডাকে মায়ের সাড়া পড়ে, তাঁহার আসন টলে—এ ডাক অবহেলা করিয়া ভক্তবৎসলা কখনই থাকিতে পারেন না। গভীর রাত্রে যখন কাহারও সাড়াশব্দ নাই, প্রসাদের সঙ্গী ভজহরি বড়ই ভাগ্যবান্—তাই তখনও সে সমভাবে যোড়হস্তে জাগিয়া বসিয়া আছে। রামপ্রসাদের চক্ষে নিদ্রা নাই, নিদ্রা তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে না—সাধকের প্রতি নিদ্রার কর্ত্তৃত্ব খাটে না, তাই বিফল-মনোরথ হইয়া এস্থান ত্যাগ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এ শ্মশান চিরনিদ্রার স্থান, এখানে ক্ষণস্থায়ী নিদ্রার প্রভুত্ব খাটিবে কেন? নিদ্রাও বুঝি চিরনিদ্রিত হইবার ভয়ে এস্থানে আসিতে পারেন নাই।

ভক্তবীর শ্রীরামপ্রসাদ ডাকিতেছেন,—"বেটী! আজ নিদয়া হ'লে চ'ল্‌বে না, যখন ধ'রেছি, তখন তোমার জারিজুরি কিছু খাট্‌বে না, গ্রামের এ বিপদ নিবারণ কর্‌তেই হইবে।"

ব্রহ্মকটাহ ভেদ করিয়া মাতৃসন্নিধানে ভক্তের সে আবেদন উপস্থিত হইল। একটী ভয়ানক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটী শিবা অকুতোভয়ে তথায় আসিয়া প্রসাদের হস্তস্থিত আহার গ্রহণ করিল। বন্যশৃগাল স্বভাবতঃই চঞ্চল; মনুষ্য-সন্নিধানে সে আসিতে পারে না; কিন্তু একি! এ যে প্রসাদের হস্তস্থিত আহারীয় দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া শেষে তাঁহার গাত্রলেহন করিতে লাগিল! সামান্য বন্যপশু শৃগালের কি এত সাহস, সে কি এত নির্ভীক-চিত্ত হইতে পারে? আহারীয় নিঃশেষ করিয়া শিবা যখন তাঁহার গাত্র-লেহন করিতে লাগিল, তখন রামপ্রসাদের চৈতন্য হইল। সাধক তখন "শান্তিঃ শান্তি" রবে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। শৃগাল ধীর মন্থর গতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল। পাঠক! এ শিবা যে বন্য পশু নহে, সাক্ষাৎ শিব-সিমন্তিনী মা শিবারূপে শ্মশানে আসিয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? কিয়ৎক্ষণ পরেই রজনী প্রভাত হইল। রামপ্রসাদ ধীরে ধীরে মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং সেইদিনই স্বজনগণ সহ স্বগ্রামে প্রস্থান করিলেন। শুনা যায়—তার পরদিন হইতে গ্রামে একটীও লোক মরে নাই এবং সে ভীষণ মারীভয় হইতে রক্ষা পাইয়া গ্রামবাসী সকলে সেই শক্তিধর রামপ্রসাদের অশেষ জয়গান করিয়াছিল।

এই অলৌকিক ঘটনায় পাচপাড়া গ্রামে রামপ্রসাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছিল এবং সেই দিন হইতে সকলেই একজন মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করিত। রামপ্রসাদ তোষামোদ করিয়া মায়ের সাধনা করিতেন না, তিনি আব্‌দারে ছেলের মত জোর করিয়া দেবীর সন্তোষ সাধন করিতেন। বীরভাবের সাধক যথার্থ বীরের মত দেবীকে ভক্তিডোরে বাঁধিয়াছিলেন। যে ছেলে বড় অভিমানী বা আব্‌দারে হয়, সে ছেলের জন্য মাকে সদা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়—সদাই কাছে কাছে থাকিয়া তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতে হয়, নতুবা তাহাকে ত' বিশ্বাস নাই, কি জানি, যদি কোনও অনর্থ ঘটাইয়া বসে—এইজন্য দেবী প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন, কিন্তু তথাপি প্রসাদের নিকট তাঁহার নিস্তার ছিল না। ভক্তের জন্য ভক্তাধীনার যে কত দুর্গতি—তাহা আর কি বলিব! ভক্ত শ্রীমন্তের জন্য মাকে আমার আত্মাঘাত পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছে, শুম্ভ, নিশুম্ভ, মহিষাসুর প্রভৃতির জন্য তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না,

শেষে প্রসাদের ন্যায় ভক্তের ভক্তিডোরে বাঁধা পড়িয়া তাঁহাকে অধীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে। মায়ের আদুরে ছেলে না হ'লে কি এত জারিজুরি খাটে, না ভোগ মোক্ষ করতলগত করিয়া শক্তিসাধনায় এত শীঘ্র শক্তিমন্ত হইতে পারে। পুত্রের প্রতি মায়ের যত দয়া, যত করুণা উৎস উছলিয়া উঠে, তত ত' আর কাহারও প্রতি নয়। তাই মাতৃভক্ত শক্তিসাধক প্রসাদ এত প্রতাপশালী, এত দুর্জ্জয়!

রামপ্রসাদ কখনও হেঁট হইয়া জল খাইতেন না, সকল সময়েই মায়ের সহিত জোর করিয়া কথা কহিতেন, কথা না শুনিলে আব্দারে ছেলের মত মাকে কত গালাগালি দিতেন। তিনি ত' প্রায়ই বলিতেন—"এবার আমি বুঝ্‌বো হরে, মায়ের ধর্‌বো চরণ লব জোরে।" বীরসাধক রামপ্রসাদের এই বীরত্ব অনেক সঙ্গীতেই পরিস্ফুরিত হইয়াছে। এতদিন সংসারের কাজকর্ম্মে প্রসাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে; সমস্ত দিনের পর আসনে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাকিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্রের পীড়ার জন্য কেবল অন্দর হইতে ডাক পড়িতেছে, কাজেই বসিবার সুবিধা পাইতেছেন না। সমস্ত দিনের চেষ্টার ফল ফলিল না দেখিয়া তিনি যাবতীয় দোষ মায়ের ঘাড়ে চাপাইয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"বেটী। যতকিছু দোষ তোমার, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ কর্চ্ছো, তোমাকে জব্দ না করিলে কিছু হ'বে না।" এদিকে পুত্রের অতিরিক্ত পীড়ায় প্রাণেও একটা দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, সাধকের সাধনার ব্যাঘাত হইলে, সে সাধ্যবস্তুর উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাঁহাকে চিবাইয়া খাইলেও তাহার মনের ক্ষোভ মিটে না, তাই সাধক তীব্র স্বরে গাহিলেন :

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীনদয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার॥

গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা খেগো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা ক'রে যাবো॥

ডাকিনী যোগিনী দুটো, তরকারী বানায়ে খাব,
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্ভার চড়াব।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধবে কেশে,
সেই কালী তার গালে দিব।

এই অবধি গাহিয়াই সাধকের প্রাণ যেন একটু খারাপ হইয়া গেল, মাকে খাইয়া ফেলিলে, সন্তানের উপায় কি হইবে। রামপ্রসাদ তারামাকে ঠিক পাথিব

মায়ের মত বশীভূত করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এত জোর, এত আব্‌দার অতি শীঘ্রই মায়ের কর্ণগোচর হইত, মা অমনি বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া সন্তানের মনোবাসনা পূর্ণ করি:তন। এমন না হ'লে সাধনা! এমন না হ'লে সিদ্ধি! জগতে মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া যিনি এরূপভাবে কাজের খতম করিতে পারেন, তাঁহারই হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করা সার্থক। নতুবা কেবল পশু পক্ষীর মত বাজে কাজে জীবন যাপন করিলে, মানুষ-জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় রহিল। সাধক মনে করিলেন একেবারে খাইয়া ফেলা ত' উচিত নয়, তাই চমক ভাঙ্গিয়াছে, রাগের কিছু কম পড়িয়াছে বলিয়া আবার গাহিলেন :

খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব,
এই হৃদি পদ্মাসনে বসায়ে মনোমানসে পূজিব।
যদি বল কালী মেয়ে কালের হাতে
ঠেকা যাব, আমার ভয় কি তাতে
কালী ব'লে, কালেরে কলা দেখাব।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ ভাল
মতে তাই জানাব, তাতে মন্ত্রের
সাধন, শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব।

ক্রমশঃ পুত্রের পীড়া বাড়িতেছে, ঔষধে কিছু হইতেছে না দেখিয়া বলিলেন—"দেখি কোন কাজ হয় কি না,জপে ইহার প্রতিকার হইতেই হইবে।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া যেমন জপে বসিলেন, অমনি সেইদিনই জ্বরের তীব্রবেগ কমিয়া গেল, তখন আশ্বস্ত হৃদয়ে প্রফুল্লিত মনে গান গাহিলেন :—

দেখি মা কেমন ক'রে আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খোঁজে নাহি পাবা,
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা
প্রসাদ বলে ফাঁকি, ঝুঁকি মাগো! দিতে পার পেলে হাবা'
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা॥

মায়ের উপর জোর জবরদস্তি করিতে. এমন স্পষ্ট করিয়া মায়ের উপর ঝাল ঝাড়িতে, আর কোন সাধককে দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য ত্রুটী হইলে, সাধন বিষয়ে একটু বাধা ঠেকিলেই, তিনি মনে করিতেন—মা বুঝি আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন, মায়ের প্রতি অচল অটল বিশ্বাসী সাধক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতেন :—

আমি কি আটাশে ছেলে,
ভয় করি না চোক রাঙ্গালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃৎকমলে,
নিজের বিষয় পাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছেলে॥

পুত্র আরোগ্য হইবার পর, রামপ্রসাদ আবার সাধন ভজনে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন। সংসার আশ্রমী সাধক রামপ্রসাদ সংসার-কার্য্যে অবহেলা করিতেন না, সংসারকার্য্যে তিনিও সময়ে সময়ে বিশেষভাবে লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহার যে কোন কাজই হউক—বাদ দিতেন না। সংসারে জননীর বা পত্নীর আজ্ঞামত সমস্ত কার্য্য করিতেন, কিন্তু মনোভৃঙ্গ সেই বিশ্বপ্রসবিত্রীর চরণ মকরন্দবৃন্দের সুধাপানে বিব্রত থাকিত। যন্ত্রী যেমন যন্ত্র চালাইতেন, কর্ত্রী যেমন কল টিপিতেন, কল তেমনি চলিত। ভাবে বেশী বিভোর হইলে সময়ে সময়ে প্রসাদের জানা বিষয়েও ভুল হইয়া যাইত, জননী বা পত্নী তজ্জন্য তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া দিতেন না। মন্দ হইয়াছে বা ভুল হইয়াছে বলিয়া কোন প্রতিবাদও করিতেন না। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন—তিনি যে এইরূপ ভাবেই সংসার করিতেছেন, ইহাই সৌভাগ্য, এ অবস্থায় অনিত্য কাজ কর্ম্মে কেহ মনোনিবেশ করিতে পারে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ছায়ামূর্ত্তি দর্শন

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, একাদশী, মঙ্গলবার, শনিবার প্রভৃতিতে রামপ্রসাদ বাটীতে থাকিতেন না; যেমন কোন কাজই থাকুক না, যেরূপ দরকারই পড়ুক না, ঐ সকল তিথিতে রামপ্রসাদকে কেহই গৃহে দেখিতে পাইত না। তাঁহার সেই নিভৃত-নিবাস সিদ্ধাসনে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মায়ের শরণাপন্ন হইতেন। জানি না এদিন অমাবস্যা, সাধকের মনের ভাব কি প্রকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের আশায় অগ্রসর হইয়া বিফল-মনোরথ হইলে তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে নিষ্ফল হইলে—মনের ভাবগতি যেরূপ হয়, মুখের ভাব যেরূপ বিকৃত হইয়া থাকে, আজ প্রসাদের প্রতি তাকাইলে যেন সেই ভাব হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাই যেন বড়ই বিরক্তভাবে সঙ্গীতের অবতারণা করিয়া প্রসাদ আজ মাতৃ-গুণ-গান করিতেছেন:

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মূল বড়াই কর কিসে।
আপনি ক্ষেপা, পতিক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে,
তোমার আদিমূল সকলি জানি, দাতা কোন্ পুরুষে।
মাগী মিন্সে ঝগড়া ক'রে, রতে নার বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষে ক'রে ফিরে দেশে দেশে।
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে,
মাগো আমার বাপের নাম লইলে, বিরাজে কৈলাসে।

মরি মরি, এমন ধীরভাবে, জোর করিয়া মাকে বাপের নাম শুনাইয়া দিতে বাপান্ত করিতে আর কোনও সাধক পারিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। সেই রজনীযোগে যখন সমস্ত জগৎ তিমিরাবৃত, অন্ধকারের রাজত্ব যখন জগতের চারিধারে বিস্তৃত, জগতের প্রত্যেক প্রাণী যখন নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে নিদ্রিত, প্রসাদ পৌষের সেই দারুণ শীতে অমানিশার সূ'চভেদ্য অন্ধকারে, নগ্ন-গাত্রে, একাকী সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট, প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে, অদর্শন যাতনা আর সহ্য হয় না, ঠিক সেই সময় আঁধার ছুটিল, আলোক ফুটিল, সাধক-ক্ষেত্র কি এক স্বর্গীয় সুধাধারে সঞ্চিত হইল, চারিদিক হইতে গন্ধবহ চন্দন-সৌরভে সে স্থান পরিপূর্ণ করিয়া দিল, ধ্যানমগ্ন সাধকের তদ্দ্বারা অনুভূতি হইল, অন্নদার আগমন হইয়াছে। মূর্ত্তিমতী মা কালীরূপে তাঁর সম্মুখে হাস্যাননে দাঁড়াইয়াছেন তিনি প্রাণের আবেগে গাহিলেন :

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন রূপ কালো হ'লো।
কাল মেয়ে ত' অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কালো,
যাকে হৃদয় মাঝে রাখ্‌লে পরে হৃদিপদ্ম করে আলো।
রূপে কালী, নামে কালী, কাল হতে অধিক কালো,
ওরূপ যে দেখেছে, সেই মজেছে, অন্যরূপ লাগে না ভালো
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিলো।
না দেখে, নাম শুনে কাণে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'লো

প্রসাদ বলিলেন—"মা! এমনি তোমার নামের মহিমা—যে রূপ দেখিতে হয় না, নাম শুনিয়াই মন মজিয়া যায়, প্রাণ ভাবতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে উধাও হইয়া নাম-সাগরে আপন-হারা হইয়া পড়ে। মা! এমনি ক'রে তুমি আমাকে

হাসাও, নাচাও, কাঁদাও তাতে দুঃখ করিব না, কোন কথা বলিব না, কিন্তু সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ ক'রে, আমার নিজের কাজে এরূপ বাধা দিও না। নাকুফোঁড়া বলদের মত তোমার সংসার-লীলার কাজগুলো আমাকে দিয়ে বেশ করিয়ে নিচ্ছ, নাও কিন্তু আমার কাজের বেলা, সাধন-ভজনের বেলা এত নারাজ হও কেন, এত বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় কেন?" সে কথার উত্তরে প্রসাদ শুনিতে পাইলেন—"আর কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না বাপ্! তোর সংসারে আর কোনও ব্যাধি-বিপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না, তবে কালপূর্ণ হইলে আমার ক্রোড়ে সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে।" রামপ্রসাদ মাতৃচরণে প্রণিপাত করিয়া সে সুখের নিশি আনন্দময়ীর আনন্দে যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে তিনি যখন ইচ্ছামত স্নান আহ্নিক সমাপন করিলেন, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে, বালার্ক-কিরণে সাধনপীঠ সমুদ্ভাসিত; রামপ্রসাদ দিবাকরকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া আত্মদর্শন মানসে একদৃষ্টে নিজ প্রতিবিম্বের প্রতি তাকাইয়া "পরমাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। বাহ্য চৈতন্য নাই, সাড়াশব্দ নাই, আত্মদর্শনে সাধক বিভোর। সাধনার এইরূপ অবস্থায়, এইরূপ জপে ছায়ারূপে শূন্যে আপনার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে, ইহা সজীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধককে সকল বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। এই প্রত্যক্ষ-দর্শন বিষয় আমাদের পরীক্ষিত কিন্তু ইহাকে সজীব করিতে হইলে বহুদিন ব্যাপী সাধনার আবশ্যক, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, আত্মদর্শনে আত্মানন্দ উপভোগ হয়। পার্থিব ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, শোকদুঃখে হৃদয়ে আর বিষাদভাব আসিতে পারে না, চিত্ত দৃঢ় সম্বদ্ধ হইয়া যায়। রামপ্রসাদ এইরূপ আত্মদর্শনে প্রাণপণ করিতেছেন, শূন্যমার্গে শ্বেতকায় মূর্ত্তি সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া নিকটস্থ হইয়াছেন, এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে গাহিল :—

এখন কি ব্রহ্মময়ী হ'লো না তোর মনের মত।
ভুলায়ে ভবে আনিলি,
বিষয় বিষ মা খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় যত জ্বলি, আমি দুর্গা বলে ডাকি তত।

সাধনায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া রামপ্রসাদ ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া দেখিলেন, ভজহরি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রামপ্রসাদ বন্ধুবর ভজহরিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। কোন প্রকার দোষ করিলে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না।

ভজহরি এ সংসারে একাকী; আপনার বলিতে তাহার আর কেহ না

থাকিলেও প্রথমে সে সংসারে প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক কাজে এতদূর জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই সংসারকেই সে সর্ব্বস্ব মনে করিত। ত্রিজগতে এমন রমণীয় স্থান যে আর কোথাও আছে, তাহা সে বিশ্বাস করিত না, ইহার অনিত্যতা সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলে, তাহার সহিত কলহ করিয়া পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিত। কেবল রামপ্রসাদের সহিত পারিয়া উঠিত না, রামপ্রসাদ ইহার অনিত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ করিয়া দিলেও, সে কিছুতেই তাহা স্বীকার করিত না। ভজহরি প্রথমে এইরূপ ভাবেই রামপ্রসাদের সংসারে ঠিক আপন ভাবে, কাল কাটাইত, কিন্তু এখন তাহার চৈতন্য হইয়াছে, এখন রামপ্রসাদের সহবাসে তাহার মোহ ঘুচিয়াছে, তাই এখন সে বুঝিয়াছে—এ বিষকূপে পড়িয়াই তাহার এত দুর্দ্দশা। এখন তাহার মতিগতির ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিয়া রামপ্রসাদও সময়ে সময়ে তাহাকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেন।

রামপ্রসাদ আজ দুই তিন দিন বাটী যান নাই; আহারাদি করেন নাই কাযেই সর্ব্বাণী স্বামীর জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারই চাঞ্চল্য নিবারণার্থ আজ ভজহরির এস্থানে আগমন, নতুবা সাধন-ভজনের বাধা দেওয়া সে মহাপাপ বলিয়াই মনে করিত। ভজহরিও আজকাল আর বৃথা সময় নষ্ট করে না, সাধকাগ্রগণ্য রামপ্রসাদের পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করিয়া অবশিষ্ট সময়, সে নিজের ক্ষমতানুসারে মাতৃনাম জপ করিয়া কাটায়। সাধিলেই ক্রমশঃ সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, মন তৎপথাবলম্বী হইয়া মালিন্য পরিশূন্য হইতে থাকে। ভগবৎপন্থা অনুসরণের এমনি গুণ যে, তুমি যতই কেন পাষণ্ড হও না, তোমার হৃদয় যতই কেন কঠিন হউক না—কর্ম্মের গুণে তাহাকে কোমলভাব ধারণ করিতেই হইবে। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি" কয়লার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আর নাই, তাহাকে যতবারই ধৌত কর, যতই মাজ্জিত-ঘর্ষিত কর, তাহার সে কালবর্ণ কিছুতেই যায় না, কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাকে সুন্দর, পরিষ্কার বর্ণ সংযুক্ত করিতে পারা যায় না? নিশ্চয়ই করিতে পারা যায়—সাধক কবি তুলসীদাস বলিয়াছেন—"কয়লাকো ময়লা ছুটে, যব্ আগ্ করে পরবেশ" এই দুরন্ত মসীবর্ণ কয়লাকেও সুবর্ণবর্ণ করিতে পারা যায়, যদি তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কয়লার মলিনত্ব দূর করিতে হইলে অগ্নি সংযোগই শ্রেষ্ঠ উপায়। তেমনি আমাদের ঘোর বিষয়কালিমায় মলিন চিত্তকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে হইলে, বিবেকাগ্নির সাহায্য গ্রহণ কর, দেখিবে ইহার যাবতীয় মল অপসারিত হইয়া সুনির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ভাব ধারণ করত ভগবৎ-কথামৃত বর্ষনের অধিকারী হইবে।

ভজহরি-হৃদয়ে এই বিবেকাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার প্রধান সহায় রামপ্রসাদ। প্রসাদ দেখিলেন—যখন ইহার কেহ নাই, সংসারের জন্য ব্যাকুল হইবার যখন ইহার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, তখন এ দুর্লভ জন্ম বিফলে যায় কেন? পরের উপকার করা, কুপথগামীকে সুপথে আনয়ন করাই সাধুতার লক্ষণ, ভগবদ্বিভূতি-সম্পন্ন সাধকগণ পাপিষ্টগণকে সৎপথাবলম্বী করিবার জন্য জগতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। জগতের হিতসাধনই তাঁহাদের কর্ম্ম এবং সেইরূপ কর্ম্ম করিতেই তাঁহারা সতত সচেষ্ট। রামপ্রসাদ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ভজহরিকে নিজের আকর্ষণী শক্তি বলে এখন যে অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছেন, নির্ভয়ে তাহাকে আপন আশ্রয়ে আশ্রয় দিয়া যে ভাবে গঠিত করিয়াছেন, তাহাতে তাহার যে আর কখন পতন হইবে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পাঠক! তাহার হৃদয়ভাব উপরোক্ত সঙ্গীতেই সম্যকভাবে প্রকাশিত, যাহার মনোভাব এরূপ ধর্ম্মভাব বিশিষ্ট, অচিরে যে তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

রামপ্রসাদ যে সিদ্ধাসনে এরূপ অবস্থায় ছিলেন, তাহা ভজহরি জানিত না। তাই তাঁহার সাধনায় ব্যাঘাত হইল দেখিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইল, পাছে রামপ্রসাদ রুষ্ট হইয়া তাহার প্রতি বিরূপ হন, এই আশঙ্কায় সে সশঙ্কিত হইল। কিন্তু রামপ্রসাদের সাধন-ভাণ্ডার ত' শূন্য নয়, এ ভাবও ত' তিনি বহুকষ্টে জীবনে এই একবারমাত্র আনয়ন করেন নাই, এরূপ সাধনা যে তাঁহার নিত্যকর্ম্ম, ইচ্ছা করিলেই হইতে পারে, তবে বন্ধুর প্রতি বিরক্ত হইবেন কেন? তিনি ভজহরিকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"ভাই! দুই তিন দিন বাটী যাই নাই বলিয়া বুঝি তোমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছ?"

ভজহরি। আমি তত হই নাই, তবে বধূমাতাদের অনাহার জনিত বিশুষ্ক মুখভাব দেখিয়া, আমি তোমাকে ডাকিতে আসিতে বাধ্য হইলাম।

রামপ্রসাদের চমক ভাঙ্গিল। তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী সর্ব্বাণী যে তাঁহার প্রসাদ না হইলে আহার করেন না। এ কয়দিন তিনি যে বাটী গমন করেন নাই এবং তাঁহার সিদ্ধাসনের ত্রিসীমানায় কাহাকেও আসিতে যে নিষেধ করিয়াছেন, কাজেই কোনরূপে প্রসাদ পাইবার উপায় না থাকায়, গৃহলক্ষ্মীগণ অভুক্ত অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। শ্বাশুড়ী আহার করেন নাই বলিয়া পুত্র-বধূটীও আহারে তত আস্থা প্রদর্শন করেন নাই, বালিকা বধূ এতকষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কেন? তাই ভজহরি দেখিয়া শুনিয়া প্রসাদকে ডাকিতে আসিয়াছে। বালিকা বধূ আর কেহই নহে, রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ-পুত্র রামদুলালের

পত্নী, ইহারই পিত্রালয় গরলগাছা গ্রামে রামপ্রসাদ একবার অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

তখন আমাদের সংসারেই শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল, এখানে যাহা শিক্ষা হইত, এখানকার শিক্ষায় মানুষের মানসিক বৃত্তি যেরূপভাবে পরিস্ফুট হইত, দেশের অন্য কোন শিক্ষায় সেইরূপ হইত না। স্বামী-পুত্রের, আত্মীয়-স্বজনের, অতিথি-অভ্যাগতদের আহার না হইলে স্ত্রীলোককে আহার করিতে নাই—ইহা কেবল হিন্দুরই ঘরের কথা, হিন্দু-সংসারেরই অমোঘ বিধান, তখন ইহা কেহ অমর্য্যাদা করিত না। গৃহকর্ত্রী সর্ব্বাণীর অনুকরণ করিয়া বালিকা বধূটীও ঐরূপ শিক্ষায় অভ্যস্তা হইতেছিল।

সর্ব্বাণীর নিরম্বু উপবাস খুব সহ্য হইয়াছিল। তিনি স্বামীর মত সংযত হইয়া থাকিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না। রামপ্রসাদ হেন সাধকের সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর পক্ষে এ সকল বিষয় যে অতি তুচ্ছ। রামপ্রসাদ আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে আসিলেন এবং আহারাদির পর ভজহরিকে সেই পূর্ব্ব গীতটী গাহিতে বলিলেন। ভজহরির মুখে সেই বৈরাগ্যপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া রামপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবসমাবিষ্ট হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যোগ-বিভূতি ও সিদ্ধাই *

সাধন-মার্গে পরিপক্কতা লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। নষ্ট-স্বাস্থ্য-ব্যক্তির কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। এইজন্য আর্য্যশাস্ত্র স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পালনের নিয়ম বিধি-বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইতে পারিলেই প্রাণায়াম-যোগে সিদ্ধিলাভ করা সহজ-সাধ্য। বায়ু, পিত্ত ও কফ লইয়া দেহ গঠিত, এই তিনটীকে সাম্যাবস্থায় রক্ষিত করিতে পারিলেই দেহ নীরোগ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়, কষ্টসাধ্য সাধন-পথে

* বিভূতি ও সিদ্ধাই একই বস্তু, কেবল বিভিন্নভাবে প্রয়োগে বিভিন্ন নাম। সাধক সাধন-পথ বিচ্যুত হইয়া প্রাপ্ত-শক্তির অপপ্রয়োগে যে বিভূতি প্রকাশ করেন—তাহার নাম সিদ্ধাই। আর যে ঐশীশক্তি সাধক সাধন-পথে অগ্রসর হইবার জন্য বহির্জগতের বাধাবিপত্তি অতিক্রমণে প্রয়োগ করেন—তাহাই বিভূতি নামে অভিহিত।

অগ্রসর হইতেও আর তখন সাধকের কোন কষ্ট বোধ হয় না। প্রাণায়ামযোগে সিদ্ধ হইতে পারিলে দেহের ঐ তিনটী ধাতু সমতা প্রাপ্ত হয়! আসন দ্বারা দেহের স্থিরতা, তৎপরে ইন্দ্রিয়ের স্থিরতা, তৎপরে চিত্তের স্থিরতা প্রাণায়াম দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এই প্রাণায়ামে শরীর নীরোগ হয় এবং জীবনী-শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস যত কম বাহির হইবে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যত ধীরে ধীরে পড়িবে, জীবনীশক্তির ক্ষয় ততই কমিতে থাকিবে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সমতা-রক্ষা করিয়া বায়ুর গতিরোধ করিতে হইলে, প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু উহা অতি সাবধানে করিতে হয়, কেবল পুস্তকের সাহায্যে ঐ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়, তাহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফলিয়া থাকে। সিদ্ধ-গুরুর সাহায্য ব্যতীত ইহার অনুসরণ করা উচিত নহে, তবে এই প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইলে যে শরীর নীরোগ এবং সাধন-পথে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা জন্মে—তাহা স্থিরনিশ্চয়। প্রাণায়ামে সিদ্ধযোগীর নানাপ্রকার ক্ষমতা-লাভ হইয়া থাকে, অনেক সাধন-বিভূতি তাঁহার করায়ত্ত হইয়া যায়। এ সকল বিভূতি যদিও ঈশ্বর-প্রাপ্তির বিষয়ের কোন ক্ষমতা নহে। তথাপি সাধক ইচ্ছা করিলে আপনাপনিই এ সকল লাভ করিতে পারেন। সাধারণ যোগানভিজ্ঞ লোক, সাধকের ঐ সকল ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল ক্ষমতার সহিত ভগবৎ-প্রাপ্তির কোন সম্বন্ধ নাই। ছাত্র যেমন শিক্ষার সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়—ইহা সেইরূপ। সাধনার স্তর অতিক্রম করিতে করিতে প্রতি স্তরেই একটা না একটা বিভূতি সাধক পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐ পারিতোষিকই যথেষ্ট বলিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইলে, সাধকের ঐ স্থানেই কাযের খতম হইয়া যায়, আর অগ্রসর হইবার উপায় থাকে না। তখন তিনি বাজীকরের মত বাজী দেখাইয়া লোক মুগ্ধ করিতে থাকেন—আপন গন্তব্য পথ ভুলিয়া যান। আমরা এরূপ অনেক অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন লোক দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা যে রামপ্রসাদের ন্যায় মায়ের ক্রোড়স্থিত হইতে পারিয়াছেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তাঁহারা যে পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে আসিয়াছেন—ইহাই বেশ বুঝিতে পারা যায়। মাতৃ-ক্রোড় প্রাপ্তির আশা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, সকল সিদ্ধাইয়ের হাত এড়াইয়া অগ্রসর হইতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাঁহারা সফল-মনোরথ হইতে পারিতেন—মাতৃক্রোড় তাঁহাদের চির আশ্রয়-স্থল হইত। প্রাণায়াম সিদ্ধি হইলে শরীর অত্যন্ত লঘু হয়, তদ্দ্বারা অনায়াসে শূন্যমার্গে উঠিতে পারা যায় এবং ইহার দ্বারা অনেক অসম্ভবও সম্ভব করিয়া লোক মুগ্ধ

করিতে পারা যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে একজন বলিয়াছিল,—"ঠাকুর! আপনি কি খড়ম পায়ে দিয়া গঙ্গা পার হইতে পারেন?" তাহাতে পরম-হংসদেব উত্তর করিয়াছিলেন, "তুই কি আধ্‌পয়সার সাধনা পেলি, যে খড়ম পায়ে দিয়া গঙ্গা পার হইব?" তাঁহার কথার অর্থ এই যে, পারাপার কার্য্য যখন আধ্‌পয়সায় হয়, তখন যোগ-সাধনাটাকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা কেন? যাঁহারা ভাল সাধক, ভগবৎ প্রাপ্তির অনুরাগ যাঁহাদের হৃদয়ে যথার্থ বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহারা লোক দেখান কোন কার্য্য করিতে যান না। গভীর জলের মৎস্য সদৃশ ধীর গম্ভীরভাবে আপনার ইষ্টান্বেষণেই ব্যস্ত থাকেন। স্বল্প ক্ষমতা বিশিষ্ট শফরির ন্যায় অল্প জলে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন না, তবে এ সকল বিভূতি যে সময়ে সময়ে কার্য্যকরী হয় না, গভীর ভাবাবলম্বী সাধককেও যে সময়ে সময়ে এ সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হয় না—তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের নিকট ইহা অতি তুচ্ছ-অকিঞ্চিৎকর, আবশ্যক হইলে তাহার অনুসরণ করেন মাত্র। তবে সাধন-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে হইলে কোন হীনচিত্ত ব্যক্তিকে সাধনায় প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, এ সকল ক্ষমতা প্রদর্শন করা মন্দ নহে। তাহা হইলে উহারা সহজেই প্রলুব্ধ হইয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর-প্রাপ্তির সহিত যে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই—তাহা ঠিক। ঈশ্বর-প্রাপ্তি গাছের ফল নয় যে সিদ্ধাই বা বিভূতি লাভ করিয়াই, তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। ভগবদ্বিভূতি হইল সাধনার অগ্রসর হইবার শক্তি, আর সিদ্ধাই হল আংশিক শক্তি। সাধনা ছাড়িয়া শক্তির অপ-প্রয়োগ করা কোটী কোটী জন্মের তপস্যা-সিদ্ধ না হইলে কি সিদ্ধাই বা বিভূতিতে সেই মানব-বুদ্ধির আগোচর, দুষ্প্রাপ্য বস্তু ভগবৎ-পাদপদ্ম এত সহজে লাভ করিতে পারে? তবে প্রাথমিক শিক্ষা যে সময়ে সময়ে উচ্চ শিক্ষার কার্যে লাগে—তাহা স্থির নিশ্চয়।

প্রাণায়ামযোগে ইচ্ছা করিলে একমাসের পথ এক দণ্ডে গমন করিতে পারা যায়। হুগলী হইতে নদীয়া বহুদূর, কিন্তু রামপ্রসাদ প্রায়ই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন—ইহা প্রাণায়াম যোগের ফল ভিন্ন আর কি বলিব। আজকাল আমরা নবাবিষ্কৃত বেলুন-যন্ত্র প্রভৃতি দেখিয়া স্তম্ভিত হই কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাধকগণ বিনা আড়ম্বরে, কাহাকেও না বলিয়া যথা ইচ্ছা, গতিবিধি করিতে পারিতেন। হায়! সে কাল গিয়েছে, তাই আজ আমরা আসল ভুলিয়া নকলে মজিয়াছি।

প্রাণায়ামযোগ ত্রিবিধ যথা—রেচক, পুরক, কুম্ভক। ভিতরের বায়ু বাহির

করিয়া দেওয়ার নাম রেচক, তারপর নূতন বায়ু আকর্ষণ করিবার নাম পুরক, আর সেই বায়ুকে নিরোধ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে স্তম্ভিত করিবার নাম কুম্ভক। ইহাতে যে শরীর লঘু হয়, বাতাসের মত সর্ব্বত্র গমন করিতে সাধকের ক্ষমতা লাভ হইয়া থাকে এবং শরীর নীরোগ ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইয়া, যে যোগাধিকারে অধিকারী হয়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সাধক প্রবর রামপ্রসাদ বিবাহের পর সস্ত্রীক দীক্ষিত হইয়া নিজ অভীষ্টদেব মাধবাচার্য্যের নিকট প্রথমেই এই প্রাণায়াম যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। গুরুর কৃপায় অচিরকাল মধ্যে ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তাঁহার নিকট অন্য যোগাঙ্গ উপদেশের আর সুযোগ ঘটিল না। মাধবাচার্য্য লোকান্তরিত হইলে পর রামপ্রসাদের যাবতীয় শিক্ষা আগম বাগীশের নিকট লাভ হইয়াছিল।

প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে সহজেই সাধকের চিত্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে, সংযত ভাবে বহুক্ষণ বসিয়া তিনি আপনার ইষ্ট সাধনার রত থাকিতে পারেন। সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ প্রাণায়ামে বিশেষ ভাবে সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন—এই সময় হইতে অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁহার সাধকবিভূতিরূপে আপনাপনি প্রকাশ হইয়া পড়িত ; তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও মা ভগবতী আপন প্রিয়পুত্র রামপ্রসাদকে কলির আদর্শ ভক্ত-সাধক রূপে সাধারণে প্রকাশ করিবার জন্য ঐ সকল বিভূতি প্রকাশ করিয়া দিতেন। কিন্তু প্রকাশ হইয়া লোক জানাজানি হইলে, তিনি বড়ই অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। প্রাণায়ামসিদ্ধ প্রসাদের বহুদূরের গতিবিধি সহজসাধ্য হইয়াছিল, তিনি একমাসের পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাইতে পারিতেন। প্রণব-মন্ত্রে দ্বাদশবার রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিলেই দ্বাদশ মাত্রিক প্রাণায়াম হইয়া থাকে। সাধক নিজের মলমূত্র দ্বারাও করিতে পারেন। দিবা ও রাত্রিকে প্রাণায়াম করিলে সাধক সর্ব্বপ্রকার দোষ পরিত্যক্ত হন। দ্বাদশ মাত্র প্রাণায়াম অধম, চতুর্ব্বিংশতি মাত্র প্রাণায়াম মধ্যম এবং একষট্‌ত্রিংশন্মাত্র প্রাণায়াম উত্তম, যোগবেত্তা পণ্ডিতগণ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধম প্রাণায়ামে শরীরে ঘর্ম্ম উদ্ভব হয়, মধ্যম প্রাণায়ামে সাধক কম্পিত হইতে থাকেন এবং উত্তম প্রাণায়াম দ্বারা সাধক স্থাণুবৎ নিশ্চল হইতে পারেন—সিদ্ধ যোগিগণ এইরূপে প্রাণ নিরোধ করিয়া থাকেন। অত্যধিক পরিশ্রম করিলেও কষ্ট বোধ হয় না। রামপ্রসাদ প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে এইরূপে প্রতিদিন রাত্রে গুপ্তভাবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগরে এবং তদীয় গুরুদেব আগমবাগীশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই ফিরিয়া আসিতেন।

রামপ্রসাদ আপন সিদ্ধাসনে বদ্ধ সিদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন পুরঃসর একাকী নির্জ্জনে প্রাণায়াম করিতেন। শাস্ত্র বলেন—এইরূপ প্রাণায়াম ভবসাগরের সেতু স্বরূপ যাঁহারা ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছেন—তাঁহাদের আর সংসার জন্ম হয় না। আসন অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা প্র্যাণায়ামযোগ সিদ্ধ হইলে.শরীরের সর্ব্বপাতক বিনষ্ট হয়। প্রসাদ উক্ত প্রকারে যোগসাধনা করিতে করিতে গগনমণ্ডল ধবলবর্ণ দেখিতে লাগিলেন, অহরহঃ তাঁহার কর্ণের নিকট ঘণ্টানাদের ন্যায় প্রবল ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, সাধকের এইরূপ অবস্থাই সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বাবস্থা। ইহার পর জগদম্বা রামপ্রসাদের সিদ্ধাসনে একদিন প্রথম দর্শন দিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। * মাতৃদর্শন লাভের পর রামপ্রসাদ আর তত যোগাভ্যাস করিতেন না। ভক্তি-পরিপ্লুত প্রাণে কেবল মাতৃগুণানুবাদ করিয়া মাতৃপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন। সেই সময় হইতে তাঁহার শরীরে একটু দৈব-জ্যোতিঃ এমনভাবে পরিস্ফুরিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই সকলকে স্তম্ভিত হইতে হইত। মানুষ এরূপ স্বর্গীয় বিভায় বিভূষিত হইবার কারণ, কেবল সাধন-বল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

রামপ্রসাদকে হঠাৎ এরূপ জ্যোতির্ম্ময় দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্য করিত, "প্রসাদদেব" বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিল,—আর যাহারা তাঁহার শত্রু ছিল,—তাহারা এই অপার্থিব উন্নতিতে হিংসা প্রকাশ করিত, কত প্রকার কুৎসা রটনা করিয়া বলিত—মদ্যপান করিলে, অখাদ্য খাইলে প্রথমে শরীরের জ্যোতিঃ ঐরূপই ফুটিয়া বাহির হয়—তারপর নানা ব্যাধির আকর হইয়া উঠে। এই সকল শত্রুর মধ্যে তর্কভূষণ মহাশয় যে একজন ছিলেন তাহা পূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে। তর্কভূষণ তাঁহাকে বেশ বুঝিতেন—তাঁহার উন্নতি দেখিয়া হিংসায় মরমে মরিয়া যাইতেন, তাই তাঁহার মত প্রাণায়াম করিতে যাইয়া দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পরে প্রসাদদেবের কৃপাতেই আবার রোগমুক্ত হন।

আসন ও প্রাণায়াম সিদ্ধ হইতে পারিলে সাধক যেমন সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হইয়া শরীর সুদৃঢ় করিতে পারেন, আবার বিনা গুরুর উপদেশে তাহা করিতে যাইলে, তেমনি অপটু হইয়া, সর্ব্বরোগের আকর হইয়া পড়েন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে—হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃশূল, কর্ণশূল ও চক্ষুঃশূল প্রভৃতি বিবিধ রোগের

* তাহার বাস্তুর দক্ষিণ পশ্চিমকোণে এখন যে একটি ডোবা বর্ত্তমান আছে, তাহার পূর্ব্ব ধারের বাগানে মায়ের সহিত প্রসাদের প্রথম দর্শন হইয়াছিল।

উৎপত্তি হইয়া থাকে। হিংস্রক জন্তুকে বশ করিতে হইলে যেমন ক্রমে ক্রমে করিতে হয়, প্রাণায়াম-যোগও তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। অদ্ভুত ক্ষমতা লাভের আশায় হট-কারিতার বশবর্ত্তী হইয়া বিনা গুরুর উপদেশে করিলে বিপরীত ফললাভ হইবে।

প্রসাদদেবের এই সকল অলৌকিক শক্তি তখন সাধারণ লোকে দেখিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ সকল অদ্ভুতশক্তি দেখিলে লোকে পাছে তাঁহাকে উচ্চ-সাধক বলিয়া খুব সুখ্যাতি করে, লোকালয়ে একটা মহাসম্মান লাভ হইলে পাছে তাঁহার অন্তর অহঙ্কারে কলুষিত হইয়া পড়ে, এইজন্য তখন তিনি সিদ্ধিলাভের পর প্রায়ই উহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আবশ্যক হইলে অতীব সন্তর্পণে, অতি নিভৃতে এই ক্ষমতার পরিচালনা করিতেন। বন্ধুবর ভজহরি সময়ে সময়ে রামপ্রসাদের এই সকল অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতেন না, কেবল মনে মনে বলিতেন—"হায়! না জানি কত কঠোর সাধন-বলে এই সকল অনায়ত্ত বিষয় প্রসাদের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, ইহা কি এক জন্মের সুকৃতির বলে লাভ করা সম্ভব হইতে পারে?"

সৎসঙ্গের এমনি অপরিসীম মহিমা, ভজহরিও প্রসাদের দেখাদেখি ক্রমশঃ জপের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। যত বেশী জপ করিতে পারিবে, ততই মনের চাঞ্চল্য দূর হইবে, হেলায় অশ্রদ্ধায় যেরূপেই হউক কার্য্য কর, কালে তাহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। যে ভজহরি আহারের একটু সময় অতীত হইলে—অসহ্য কষ্ট অনুভব করিত, রাত্রি জাগরণের ক্ষমতা যাহার তিলমাত্র ছিল না, সন্ধ্যার পর আহার করিয়াই যে শয্যায় আশ্রয় লইয়া নাসিকাধ্বনি করিত, সংসারে আপনার বলিতে কেহ না থাকিলেও যাহার সংসারাসক্তি অতিশয় প্রবল ছিল, সেই ভজহরি আজ কাল সমস্ত দিন অনাহারে, অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া জপ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সংসারের আসক্তিও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। রামপ্রসাদের সংসারকেই সে আপনার সংসার বলিয়া ভাবিত এবং তাঁহার পরিজনবর্গকেই আপনার পরিজন মধ্যে গণ্য করিত; রামপ্রসাদের সাধনানন্দে পাছে কোনরূপ ব্যাঘাত পড়ে, তজ্জন্য সে তাঁহার সাধন-পথের সহায়রূপে সময়ে সময়ে অনেক কার্য্য সমাধা করিত। ভজহরি অতীব আগ্রহের সহিত ইহা করিত, কখনও দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করিত না। এই গুণেই রাম-প্রসাদ তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহার পারত্রিক উন্নতি বিষয়ে অবস্থামত অনেক উপদেশ প্রদান করিতেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গুরুমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

এখন ভজহরি প্রায়ই রামপ্রসাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তবে সকল বিষয়ে তাহার ন্যায় অল্পজ্ঞানী লোকের যোগদান নিষেধ; সে সকল বিষয়ে যোগদান করিত না, সে সময় সে আপন মনে ভগবানের নাম জপমালা করিত।

একদিন তর্কভূষণ মহাশয় প্রসাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন; কিন্তু তাহার তিনদিন পূর্ব্ব হইতে রামপ্রসাদ ত্রিরাত্র-সাধনায় তাঁহার সিদ্ধাসনে আবদ্ধ থাকায় দর্শন লাভ হইল না, কাজেই কিয়ৎক্ষণ ভজহরির সহিত বহির্বাটীতে আসিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত্যাভিমানী তর্কভূষণ মহাশয় এখন রামপ্রসাদের গুণে বড়ই মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া দৃঢ় ধারণা হওয়ায় প্রসাদের বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। সে দিন তর্কভূষণ ও উভয়ে বসিয়া রামপ্রসাদের অতুলনীয় সাধন-ভজনের বিষয় তোলপাড করিতে লাগিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে উত্থাপিত হইল যে, বিনা দীক্ষায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইলে সমস্তই পণ্ড হয়। শুধু লেখা পড়া জানিয়া নিজের বুদ্ধি অনুসারে এ কার্য্যে উন্নতি হওয়া দূরে থাক, বরং ঘোর অবনতি এমন কি, শারীরিক বিষম ব্যাধির উৎপত্তিও হইয়া থাকে। কৃতকর্ম্মা গুরুর সাহায্য ব্যতীত এ গুরুতর বিষয়ে কেবল আত্মশক্তি প্রয়োগ—বৃথা প্রয়াস মাত্র. তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন—"আমি এইরূপ অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঘোর অনর্থের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম। নানাবিধ শাস্ত্রপাঠ করিয়া নিজেকে একজন মহাপাণ্ডিত মনে করিয়া যোগাযাগের গুরুতর বিষয়ে নিজে আয়ত্ত করিতে অভ্যাস করিয়াছিলাম। শেষে কাজে কিছুই অগ্রসর হইতে না পারিয়া জটিল ব্যাধির আক্রমনে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ সংশয় হইবার উপক্রম হইল। পূর্ব্বাপর প্রাতঃস্মরণীয় সাধক, শক্তিপুত্র রামপ্রসাদের প্রতি আমার বড়ই জাতক্রোধ ছিল। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় আমি শাস্ত্র-বুদ্ধি অনুসারে কত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু একটীতেও সফলকাম হইতে পারি নাই। একদিন হঠাৎ রামপ্রসাদকে দেখিয়া তাঁহার সহিত কলহ করিলাম, নানাপ্রকার অকথ্য কথনে তাহাকে হীন করিবার প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু পরম কারুণিক, সরলপ্রাণ রামপ্রসাদ আমার সে সকল

কথায় তিলমাত্র দুঃখিত বা হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করিলেন না। মানুষের যাহা অসহ্য, যে অপমান সহ্য করিতে মনুষ্য প্রকৃতি চিরকালই অক্ষম, রামপ্রসাদ তাহা অম্লান-বদনে সহ্য করিলেন, উপরন্তু অমানুষিক ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ভেদী সঙ্গীতে আমার ন্যায় মহা পাষণ্ডের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। জানি না, সেই সঙ্গীতের কেমন এক আকর্ষণী শক্তিতে আমার হৃদয় স্তম্ভিত হইল, মন গলিয়া গেল—আমি রামপ্রসাদের দেবভাবে অভিভূত হইয়া তাঁহার নিকট অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি ত' পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রতি রোষশূন্য ছিলেন, এইবার আমার ভেদ বুদ্ধির কর্ম্মদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আমার হৃদয়ে যথার্থ জ্ঞানের বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন—আমি ধন্য হইলাম। সেই দিন হইতে আমি ক্রমশঃ রোগ-মুক্ত হইয়া এখন সাধন-পথের সরল সন্ধান কতক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। তাই বলি—বিনা গুরুর উপদেশে এ পথে উন্নতি করা কাহারও সাধ্য নাই, প্রথমে গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতেই হইবে। আমি গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও ভেদভাবে বাতুল হইতেছিলাম; এক্ষণে পরম গুরু রামপ্রসাদের কৃপায় আমার অন্ধকারময় সাধনপথ আলোকময় হইতেছে।

ভজহরি বলিল,—"দেখুন, আমি ত' বাল্যকাল হইতেই পিতৃ-মাতৃহীন নিরাশ্রয়, আমাদের কুলগুরু কোথায় এবং তাঁহার নাম কি, কিছুই জানি না, সে পক্ষে উপায় কি হইবে, কেমন করিয়া সে অভাব পূর্ণ করিব ?"

তর্কভূষণ। ভাই! তুমি যে আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছ এবং তোমার পরমজ্ঞানী আশ্রয়দাতা তোমাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে তোমার অভাব পূরণ হইবার কোন গোলযোগ ঘটিবে না, তুমি অচিরেই তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন কর।

ভজহরির প্রশান্ত হৃদয়-সাগর তোলপাড় করিয়া দিয়া তর্কভূষণ মহাশয় সেদিন গৃহে গমন করিলেন। ভজহরি আপনার পরকাল চিন্তা করিয়া বড়ই অস্থির হইতে লাগিল। জগতে মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া যদি যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভে বঞ্চিত হইলাম, তবে আমাতে আর পশুতে প্রভেদ কি ? শাস্ত্র বলেন :—

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥"

ধর্ম্মের উৎকর্ষতা সাধন করিতে পারে বলিয়াই মানুষ সকল জীবের শ্রেষ্ঠ, যদি তাহা না করিতে পারিলাম, তবে পশুতে আর আমাতে প্রভেদ কি ? রামপ্রসাদ কত জন্মের পুণ্যফলে এইরূপ মাতৃশক্তিলাভ করিয়াছে, আমি বাল্যকাল হইতে, ভাগ্যহীন বলিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে ত' চলিবে না, যতটুকু

পারি এ জন্মে ত' অগ্রসর হইয়া যাওয়া দরকার? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভজহরি প্রসাদের দর্শনলাভে উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিল। সেদিন তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা এক প্রকার নাই বলিলেও হয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি কি এক দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার মনঃপ্রাণ বিচঞ্চল হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই সুস্থির করিতে পারিতেছে না, প্রসাদের দর্শন না পাইলে তাহার এ অস্থিরতা উপশম হইবার নহে। একবার মনে করিল—আজ ত' তৃতীয়দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে, আজ ত' বন্ধুবরের আসিবার দিন, একবার তাঁহার সাধন-পীঠে অগ্রসর হইয়া দেখি না, কেন এত বিলম্ব হইতেছে। আবার মনে করিলেন, না, যখন নিষেধ আছে, তখন কোন ক্রমেই যাওয়া উচিত নয়। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায় ভজহরি অস্থির হইয়াছে, এমন সময় সাধকচূড়ামণি রামপ্রসাদ সাধন-মন্দিরায় মত্ত হইয়া টলিতে টলিতে গৃহে আসিলেন। ভজহরি আগ্রহ সহকারে কঠিয়া দাঁড়াইয়া মহাপুরুষকে অভ্যর্থনাচ্ছলে বলিলেন—"এস ভাই এস!" সন্ধ্যার পূর্ব্বে তোমার আসিবার কথা, কিন্তু দেরী হইতে দেখিয়া এই আমি তথায় যাইবার উপক্রম করিতেছিলাম।"

রামপ্রসাদ। ভাই! যাওয়া আসার কি ঠিক আছে। পাগ্‌লীবেটী যে কখন কিরূপ ভাবে রাখে, কিরূপ খেলা খেলায় তাহার ত' স্থিরতা নাই। মা বাপ পাগল হ'লে তার ছেলেও পাগল হয়। আসিবার সময়ে বাগানের ধারে একটা গিরগীটে দেখে আশ্চয্য হ'লাম। সেটা ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে। সেই বহুরূপী গিরগীটেটার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার বহুরূপিণী পাগ্‌লী মায়ের কথা মনে প'ড়লো, বেটীও যে এই গিরগীটেটার মত কত রূপ ধরে—তাহার সংখ্যা নাই। এই জন্য ভেদবুদ্ধি, সাধনপথের নিম্নপন্থী সাধকগণ তাঁহাকে কি ভাবে ভাবিবে—স্থির ক'র্ত্তে না পেরে—দিশেহারা হয়।

এদিকে রামপ্রসাদ বাটীতে আসিয়া ভজহরির সহিত কথা কহিতেছেন, শুনিয়া পুত্রকন্যাগণ কাছে আসিল। পিতা সকলকে একে একে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। পুত্রটীর লেখাপড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কত উৎসাহ প্রদান করিলেন। আজ তিনদিনের পর স্বামী আহার করিবেন—সর্ব্বাণী নানাপ্রকার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, ক্ষুদ্র বধূটী তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। সতী সর্ব্বাণী অন্নপূর্ণার ন্যায় অতি সত্বর পরিপাটীরূপে সমস্ত প্রস্তুত করিয়া স্বামী-পুত্র ও বন্ধুদ্বয়কে ভোজন করাইলেন। ভজহরিও তাঁহাদের সহিত ভোজন কার্য্য সমাধা করিয়া লইল। ভজহরির এখন আর ভোজনের প্রতি তত আসক্তি নাই, পূর্ব্বে যেমন আহারের সামান্য বিলম্ব

হইলে, তাহার বিরক্তি বোধ হইত—এখন সেভাব একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; আহার না করিলে জীবনধারণ হইবে না, তাই যথাসময়ে চারিটি আহার করেন। তিনি ত' আর রামপ্রসাদের মত সিদ্ধপুরুষ নহেন, যে তিনদিন অন্তর আহার করিবেন? তবে প্রসাদের প্রসাদে ক্রমশঃ যে তাহার উন্নতি হইতেছিল, ক্রমশঃ সে যে কষ্টসহিষ্ণু হইতেছিলেন—তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না।

রামপ্রসাদ আহারাদির পর বহির্বাটীতে আসিলেন। সর্ব্বাণী তাঁহার শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়া যাইলেন—পুত্র রামদুলাল মুখশুদ্ধির জন্য তাম্বুল আনয়ন করিলেন। তৎপরে রামপ্রসাদ শয়ন করিলে সতী সর্ব্বাণী তদীয় ভুক্তাবশেষ প্রসাদরূপে গ্রহণ করিলেন, বধূমাতাকেও খাইতে দিলেন।

ভজহরি রামপ্রসাদের নিকটেই ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিত। রামপ্রসাদ প্রকৃত অগ্রণী ছিলেন—সংসার-আশ্রমে তাঁহার ন্যায় সিদ্ধপুরুষ আর কেহ ছিলেন বলিয়া কখন শুনা যায় না। সংসার-কার্য্যে কখন তিনি বিরক্ত-ভাব প্রকাশ করিতেন না; জগতের সমস্ত কার্য্য মায়ের, তিনি যাহা করাইতেছেন—তাহা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না। জগৎ সৃষ্টি যখন তাঁহার কার্য্য, মর্ত্ত্যের প্রত্যেক কার্য্যই যখন তাঁহার লীলার উপকরণ, তখন ইহা কি মন্দ হইতে পারে? মা যে আমার ইহার প্রত্যেক অনু-পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এ জগৎ যে মা-ময়, তবে সংসারে কার্য্য কেন মন্দ হইবে এবং তাহা কেনই বা করিব না? তাঁহার কার্য্য করিতেছি, সৃষ্টি-কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেছি, ইহাতে দোষ কি? যে দোষ বলে—সে সংসার কি, কিরূপভাবে সংসার করিতে হয়, তাহা বুঝে না বলিয়াই ইহার সমস্ত মিথ্যা-কল্পিত বলিয়া মনে করে। মায়ের কার্য্যে মিথ্যা দোষারোপ করা কতদূর ধৃষ্টতা—তাহা তাহারা বুঝে না। সংসারকার্য্যে প্রসাদের মনোভাব এইরূপ ছিল বলিয়াই, তিনি নিজের কাজের সময় ব্যতীত ওতপ্রোতভাবে ইহাতে জড়িত থাকিতেন; একদিনের জন্য কষ্ট বা বিতৃষ্ণার ভাব অনুভব করিতেন না।

আহারাদির পর দুই বন্ধুতে বহির্বাটীতে শয়ন করিয়াছেন। ভজহরির আজ নিদ্রা নাই, রামপ্রসাদের নিকট তর্কভূষণ-কথিত বিষয়ের উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সময় পাইলেই বলিবেন। এমন সময় প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভজহরি! আজ যে এখনও নিদ্রা যাও নাই। নিদ্রার সহিত যে তোমার খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, শয্যার আশ্রয় লইলেই দেবী যে তোমার প্রতি সদয় হইয়া তোমায় ক্রোড়ে স্থান দেন, নাসিকাধ্বনি করিয়া তুমি অচেতন হইয়া পড়, আজ একি ভাব?"

ভজহরি। আজ তোমাকে একটি কথা বলিব বলিয়া, এখনও নিদ্রা যাই নাই!

রামপ্রসাদ। কি কথা বলো না, তার জন্য আর ইতস্ততঃ কেন?

ভজহরি। দেখ, আজ তর্কভূষণ মহাশয় তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তোমার দেখা না পাইয়া অনেকক্ষণ আমার কাছে বসিয়া, তোমার কত সুখ্যাতি করিলেন।

রামপ্রসাদ। আচ্ছা আচ্ছা ওকথায় আর কাজ নাই, তারপর?

ভজহরি। তারপর আমার সম্বন্ধে বলিলেন—'দেখ! কেবল নাম জপ ক'র্‌লে হবে না, গুরু ভিন্ন কিছু হবে না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি কেহই গুরুর উপদেশ ভিন্ন কোন কাজ করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদও নয়, একথার সত্যতা সম্বন্ধে তুমি বরং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা ক'রো।' এখন কথা কি বল দেখি, শুধু নাম জপ ক'রে কি ফল হবে না?

রামপ্রসাদ। কথা খুব সত্য, গুরু ভিন্ন কিছু হবার উপায় নাই। শুধু জপে কিছু হয় না।

ভজহরি। তবে কি হবে ভাই! আমার ত' পৈতৃক গুরু কেহ নাই, যদিই থাকেন, তাহা হইলেই বা তাঁহার সন্ধান কোথায় পাইব? যখন তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না—তখন তোমাকে এই কার্য্য করিতে হইবে।

রামপ্রসাদ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "বল কি? এরূপ কথা আর দ্বিতীয়-বার উচ্চারণ করিও না। গুরুগিরি কার্য্য ব্রাহ্মণের চিরনির্দ্দিষ্ট—এ বিষয়ে তাঁহাদের ভগবৎপ্রদত্ত ক্ষমতা। আমি বৈদ্য হইয়া কি তাহা করিতে পারি? ব্রাহ্মণ ব্রহ্মশক্তি সম্পন্ন, তাহাদের অতুলনীয় ক্ষমতা, দেবশক্তিও তাঁহাদের নিকট হার মানিয়া যায়, আমার এমন ক্ষমতা কোথায় ভাই, যে তোমাকে বীজমন্ত্র প্রদান করি! তবে তুমি গুরুদ্বারা দীক্ষিত হইলে, আমি তোমাকে উপদেশাদি প্রদান করিতে পারি বটে।

ভজহরি। তোমার ক্ষমতা কি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কম?

রামপ্রসাদ। ছি ছি, এরূপ ধারণা তুমি কখনও মাথায় আনিও না। কম বলে কম, পর্ব্বতে আর বালুকাকণায় যত প্রভেদ, ব্রাহ্মণে আর আমায় তত প্রভেদ। ব্রাহ্মণই ত' দেবতা, পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত দেবতা আর কে আছে? এই জন্যই ত' ইঁহারা ভূদেব নামে কথিত। তুমি কি বশিষ্ঠ, জাবালী, ঋষ্যশৃঙ্গ, দুর্ব্বাসা, ভৃগু প্রভৃতির ক্ষমতা শাস্ত্রে পড়ো নাই। দেবতারা পর্য্যন্ত ইঁহাদের ভয়ে যোড়হস্ত হইতেন। আমি ত' কোন্ ছার! তুমি কাহার সহিত

কাহার তুলনা করিতেছ, চন্দ্রে আর খদ্যোতে কি তুলনা হইতে পারে ?

ভজহরি। শাস্ত্রে ত পড়িয়াছি, তবে কলির—

রামপ্রসাদ। কলির-ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘৃণা কর বুঝি ? স্বর্ণ কলিতেও স্বর্ণ, আর সত্য-দ্বাপরেও স্বর্ণ—তাহার বিভিন্নতা কোন কালেই নাই। যদি কিছু মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়—সংস্কার করিয়া লইলেই শুদ্ধ হইবে, তবে সে সংস্কারের কর্ত্তা ভগবান্, তুমি, আমি নহি। আমরা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়াই মানিব—এখন মানিনা বলিয়াই তাঁহাদের এত হীনত্ব সাধিত হইতেছে, ঠিক ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের মত মান্য কর, দেখিবে—সত্য ঠিক সত্যই আছে, মিথ্যা হয় নাই। একটা লোক খারাপ হইয়া যাইতেছে, তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া, তাচ্ছিল্য-ভাব প্রদর্শন না করিয়া, যদি তাহাকে মান্য করিয়া ক্রমশঃ তাহার পূর্ব্ব উন্নতির কথা, পূর্ব্ব খ্যাতিপ্রতিপত্তির কথা স্মৃতিপথে জাগাইয়া দাও—তাহা হইলে তাঁহার বিস্মৃত স্মৃতি আবার চিত্তপটে অঙ্কিত হইবে, সুপ্ত-শক্তি আবার জাগিয়া উঠিবে, তখন তাহার স্বতঃই মনে হইবে, এত দোষী হইয়াও যখন এত মান্য, তখন নির্দ্দোষী হইলে আরও কত হইবে। আমাদের শক্তিধর পূর্ব্বপুরুষগণ না জানি ইহা অপেক্ষা কত মান্য পাইতেন! এইরূপ করিলে ব্রাহ্মণ-শক্তি আবার জাগিয়া উঠিবে, নতুবা আমাদের দ্বারাই একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

ভজহরি। তবে এখন কি করা যাইবে ভাই, আমার কি কোনও উপায় হইবে না।

রামপ্রসাদ। তোমার যদি ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মা নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।

ভজহরি। যখন গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিলে মন্ত্র কিছুতেই ফলপ্রদ হয় না, তখন উন্নতির কোন উপায় নাই।

রামপ্রসাদ। মনের মত গুরুকরণ এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক, নতুবা যার তার নিকট শোনা কথায় মন দৃঢ় হইবে না, জপে আস্থা জন্মিবে না; কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ভক্তির সহিত কখন জপ করিবার শক্তি জন্মিবে না। গুরু সাক্ষাৎ শিব—তাহাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে না, তিনি মনুষ্য নহেন। তিনি তোমার হৃদয়ে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিবেন, তাহার বলে তুমি ক্রমশঃ সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। আমারও গুরুদেব ছিলেন তুমি ত' জান ?

ভজহরি। হাঁ জানি, আচ্ছা আমাদের মঠে একজন সন্ন্যাসী আসেন তাঁহার দ্বারা মন্ত্রগ্রহণ করিলে হয় না ?

রামপ্রসাদ। গৃহী-ব্যক্তির সন্ন্যাসী গুরু করা উচিত নহে, কারণ আবশ্যক

হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, সন্ন্যাসী একস্থানে স্থায়ী নহেন। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যহই গুরু-পুরোহিতের আবশ্যক, নতুবা জীবন-পথ সুগম হয় না।

ভজহরি। তুমি ভাই! ঠিক বলেছ, তিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাতে আমাদের মত সামান্য জ্ঞানী তাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তিনি কখন খুব বেশভূষা করিয়া আসেন, আবার কখন বা পরিবার কাপড় পর্য্যন্ত থাকে না, কখন পাগলের ন্যায় থাকেন, কখন ভাল মানুষ। তাই বলি—এরূপ গুরুসঙ্গ সংসারীর পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

রামপ্রসাদ। তুরীয় অবস্থাপন্ন আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ :—

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্ বাপি চ বালবদ্ বা
পিশাচবদ্ বাপি চরত্যবন্যাম্।

গৃহীর পক্ষে এরূপ মহাত্মার নিকট দীক্ষিত হওয়ায় লাভ নাই; ক্ষতিই বেশী। কারণ প্রতিপদে যখন তোমাকে গুরুর শরণাপন্ন হইয়া সন্দেহ দূরীকরণ করিতে হইবে, এমন অবস্থায় যদি তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তখন উপায় কি হইবে?

ভজহরি। আচ্ছা ভাই? আত্মোন্নতি নিজের কার্য্যের উপর যখন নির্ভর করে, তখন যদি গুরু-করণ নাই রয়, তাতে ক্ষতি কি?

রামপ্রসাদ। ভগবৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইবার পথ আছে, কোন পথে যাইলে তুমি নির্ব্বিঘ্নে এবং সত্বর যাইতে পারিবে, তাহা বলিয়া দিবে কে? গুরুই এই পথের প্রদর্শক? এই শাস্ত্রে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে :—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বং নমামি।

তুমি কি জান না—গুরুকে প্রণাম করিবার সময় মন্ত্র আছে :—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মা ত' আমার সকল ভূতেই বিরাজিত, শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও ব্যক্ত আছে—ভগবতী চিৎস্বরূপে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, কিন্তু সে ধারণা কাহার আছে? সদ্গুরুর

কৃপা হইলেই এই সমস্ত গোল—সরল হইয়া যায়।

ভজহরি। আচ্ছা, আমাদের যে এই এত ঋষি ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই কি গুরু ছিল?

রামপ্রসাদ। সকলেরই ছিল, নতুবা ফল হয় না। একটা কথা বলি শুন—শুকদেব ছিলেন জান ত' তাঁর মত জ্ঞানী ঋষি আর কেহই ছিলেন না। মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুভয় নিবারণ করিয়া, ভবসাগর পার করিতে তিনিই "ভাগবত-তরণী" লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন

ভজহরি। হ্যাঁ, তাঁর কি গুরু হয় নাই নাকি?

রামপ্রসাদ। গুরু কেন হইবে, তিনি ত' ১৬ বৎসর বয়স অবধি মাতৃগর্ভে বাস করিয়া তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়াক্রান্ত হইবার ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন, গর্ভমধ্যে পিতা বেদব্যাসের মুখে তত্ত্ব কথা শুনিয়া তিনি পরম তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন তাই গর্ভচ্যুত হইয়া আর সংসারে মুগ্ধ না হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

ভজহরি। তিনি গুরুকরনে অসমর্থ হওয়ায়, কি ক্ষতি হইয়াছিল?

রামপ্রসাদ। ক্ষতি ব'লে ক্ষতি, অতবড় একজন পরমহংস, যাঁহার সমকক্ষ ত্রিজগতে কেহ ছিল না; তিনি দেবসেবায় সম্মানিত হন নাই।

ভজহরি। সে কিরূপ ভাই। বল না, আমার শুনিতে বড়ই আগ্রহ হইতেছে।

রামপ্রসাদ। তিনি প্রত্যহই দেবসভায় যাইতেন, সকলকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন বটে, কিন্তু দেবগণ সকলেই পৃথক্ আসনে বসিয়া তাহা শুনিতেন। শুকদেব গোস্বামী একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা আমার সহিত একাসনে না বসিবার কারণ কি?" দেবগণ বলিলেন,—"দেব! আপনি সকল অংশেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনার কেহ গুরু নাই, আপনি দীক্ষিত নহেন! এই জন্য আমরা একাসনে উপবেশন করি না।" শুকদেব গোস্বামী রাগান্বিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—,—"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! আচ্ছা কল্য রজনী প্রভাতে যাহাকে দেখিব তাহাকেই গুরু করিব। গুরু না করায় আমি এত হেয়?" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সম্মুখে এক ধীবরকে দেখিতে পাইলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—"যাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইব, তাহাকেই গুরু করিব।" কাজেই সেই ধীবরকেই তিনি গুরু করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইয়া মোহচ্ছন্নভাবে বলিলেন—"হায়! কি বিপদ, একজন ধীবর আমার গুরু হইল?" কিন্তু

কি করিবেন, আর ত' উপায় নাই। গুরুদেব চলিয়া গেলেন, শুকদেব প্রণাম করিয়া আশ্রমে আসিলেন; তৎপরে অপরাহ্ণে আবার দেবসভায় গমন করিলেন, সেদিন কিন্তু আর আসন-পার্থক্য রহিল না, সকলেই একাসনে উপবেশন করিয়া সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। শুকদেবের প্রাণে কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে একটা তীব্র দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক অহরহঃ দংশন করিতেছে, হায়! আমার গুরু হইল একজন ধীবর, কেহ যদি শুনে বা দেখে—তাহা হইলে কিরূপ অপমানিতই হইতে হইবে? পরম জ্ঞানী শুকদেবের চিত্তও মোহ-অহংকারে কলুষিত হইয়াছে, দেবাদিদেব মহাদেব ভিন্ন জগতে যে আর কেহ গুরু নাই; গুরু যিনিই হউন তিনিই শিব ভিন্ন আর কেহ নহেন। হায়! অভেদ বুদ্ধি শুকদেবেরও আজ-ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তিনিও মোহমুগ্ধ হইয়াছেন, ইত্যবসরে সেই ধীবর টাকু ঘুরাইতে ঘুরাইতে, জাল স্কন্ধে দেবসভায় আসিয়া উপস্থিত। শুকদেব লজ্জিত হইলেন কিন্তু কি করিবেন, দায়ে পড়িয়া গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে হইল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখেন যে, সে ধীবর আর নাই, সম্মুখে তুষার পর্ব্বতসম্ভব-বরবপু-ধারী, ফণীফনা-বিভূষণ, ত্রিনয়ন সদাশিব উপস্থিত। দেবগণ শুকদেবের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, সকলেই হাসিয়া আকুল হইলেন। এইবার শুকদেবের মোহ ঘুচিল, তিনিও লজ্জায় বদন অবনত করিলেন।

মহাদেব বলিলেন,—"বৎস। তোমার ন্যায় পরম জ্ঞানীও যখন মোহাভিভূত হয়, তখন সংসারী জীবের পক্ষে মোহপ্রাপ্ত হওয়া আর বিস্ময়ের বিষয় কি? ভগবান্ শঙ্কর শুকদেবকে চৈতন্য প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন! শুকদেব গোস্বামীও সময়ে সময়ে এরূপ হইতেন, কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি আপন আত্মার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মজ্ঞানী হইতে পারিয়াছিলেন! অতএব ভজহরি! সাধন-ভজনে সিদ্ধকাম হইতে হইলে গুরুর কৃপা একান্ত আবশ্যক।

ভজহরি। ভাই! সমস্ত বুঝিতে পারিলাম, এক্ষণে উপায় কি বল? রামপ্রসাদ। বলিয়াছি ত, যদি ঐকান্তিক অনুরাগ হইয়া থাকে, গুরু নিশ্চয়ই মিলিবে। ভগবান্ গুরুরূপে তোমাকে দর্শন দান করিয়া চরিতার্থ করিবেন! তবে মনে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করিও না, গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর, তারপর মায়ের কৃপায় আমিও সময়ে সময়ে তোমাকে কিছু কিছু সুলভ সন্ধান বলিয়া দিব।

সে দিন আর কোন কথা হইল না। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল,

কাজেই ভজহরি নিদ্রিত হইয়া পড়িল। রামপ্রসাদও মাতৃপাদপদ্মে আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুত্র দুইটী রামপ্রসাদের পার্শ্বে বহুপূর্ব্বেই নিদ্রিত হইয়াছিল, তিনি তাহাদের পার্শ্বে নিদ্রিত হইলেন।

শুনা যায়—ইহার পর ভজহরি কয়েকদিন ক্রমাগত হালি সহরের ঘাটে স্নান করিবার মানসে যাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতেন। একদিন দৈবক্রমে ঐ ঘাটে তদীয় কুলগুরুর সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যোপলক্ষে হুগলী আসিয়াছিলেন। পরিচয় লইয়া ভজহরির মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। গুরুদেব কয়েকদিন রামপ্রসাদের ভবনে থাকিয়া তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। রামপ্রসাদের মধুমাখা সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, মায়ের বরপুত্র না হইলে কি এমন প্রাণ-মাতোয়ারা সঙ্গীত মুখে রচনা করিয়া কেহ গাহিতে পারে?" তৃণাদপি সুনীচ স্বভাব, সাধন-ফলভারাবনত রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করত যথোচিত নম্রভাবে কয়দিন তাহার সেবা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মন্ত্র-জপে ভক্তি

পরদিন অতি প্রত্যুষে ভজহরি প্রাতঃস্নান করিয়া গৃহে আসিলেন। আজ তাহার মন প্রফুল্ল, বদন প্রশান্ত জ্যোতিঃপূর্ণ। তাহার মন্ত্র গ্রহণের ঠিক সময় হইয়াছিল, তাই দয়ার ঠাকুর গুরুরূপে আসিয়া ভজহরির কর্ণে বীজমন্ত্র প্রদান করিলেন। সময় হইলে, সাধকের অন্তর মধ্যে গুরুর অভাব বোধ হইলে, ভগবান্ তাঁহার সে অভাব পূর্ণ করেন। গুরু লাভের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হয় না, কিন্তু সেরূপ সদ্গুরু-অন্বেষক শিষ্য জগতে কয়জন পাওয়া যায়, কয়জনই বা গুরু-করণের জন্য হৃদয়ের যথার্থ আগ্রহ প্রকাশ করেন? শিষ্যের সেরূপ আগ্রহ, প্রাণের ঐকান্তিক অনুরাগ আজকাল আর দেখা যায় না। "গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা মিলে এক।" বাস্তবিক গুরুর অভাব নাই, কিন্তু যথার্থ শিক্ষার্থী শিষ্য বড়ই দুর্লভ! পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের গুরু অন্বেষণের ক্ষমতা ছিল না; দুগ্ধ-পোষ্য শিশু গুরু কি বস্তু কিছুই জানিত না, কিন্তু যখন আবশ্যক

হইল, অমনই ভগবান্ তাঁহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তুমি যদি সেইরূপ উপযুক্ত শিষ্য হও, গুরুর জন্য ভাবিতে হইবে না—ভগবান্ আপনাপনিই তোমার অন্তরের অভাব জানিয়া—তাহা পূরণ করিবেন।

হে সাধক! হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত কর, কর্ম্মকাণ্ডে অভ্যস্ত হইয়া তাহাকে শস্য উৎপাদনের উপযোগী কর, বীজ-প্রাপ্তির ভাবনা কি? ক্ষেত্রস্বামী শ্রীগুরু আপনি আসিয়াই তোমার উর্ব্বর ক্ষেত্র-মধ্যে বীজ বপন করিবেন। কর্ম্মকাণ্ডে অভ্যস্ত তুমি ভক্তি-বারি সিঞ্চন করিতে পারিলেই, তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম হইয়া কালে বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া যাইবে—সেই সাধন-বৃক্ষের ফল ফুলে তোমার আশা তৃষ্ণা মিটিয়া যাইবে, জীব! চিন্তা করিও না। গুরুদেবের একদিনের শক্তিপ্রয়োগে ভজহরির অবস্থা দেখিয়া রামপ্রসাদ বলিলেন—"কি ভায়া! গুরু পাইলাম না বলিয়া যে বড়ই মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলে, দেখিলে দয়াময়ীর দয়ার রাজত্বে জীবের কোন অভাব থাকে কি? অভাব হইলেই পূরণ হইবে—পিপাসিত চাতক পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক করিয়া যখন উর্দ্ধমুখে কাতরপ্রাণে "ফটিক জল" বলিয়া চীৎকার করে, তখনই বারিদবরণী মা আমার বরিষণচ্ছলে তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের তৃপ্তিপরিসাধিত করেন। তবে পাইবার জন্য তোমাকে উপযুক্তরূপে গঠিত করিতে হইবে।"

ভজহরি। ভাই! আমাদের ততদূর ত' চিত্তস্থির হয় নাই, তাই, ছট্‌ফট করিয়া মরি।

রামপ্রসাদ। ঐ ছট্‌ফটানি লোক দেখান না হইয়া, যদি প্রাণের সহিত হয়, তবেই ত' কাজ হইল।

ভজহরি। গুরু যে জীবের ত্রাণকর্ত্তা, গুরু-মন্ত্র না হইলে যে কিছুই হয় না এবং তাহা লাভ হইলে প্রাণে যে যথার্থ একটা অজানা শক্তি কোথা হইতে আসিয়া মনকে সুদৃঢ় করে, আজ আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

রামপ্রসাদ। ভাই! এইবার কাজ কর, তাহা হইলে সকল বিষয় আপনাপনিই সুগম হইয়া যাইবে।

ভজহরি। ভাই! কায ত' ক'র্ব্বো, তবে তোমার ন্যায় মাতৃ-প্রিয় সাধককে আমার জন্য একটু একটু খাট্‌তে হ'বে।

রামপ্রসাদ। তার জন্য আর ভাব্‌না কেন? আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব—অবশ্য করিব।

ভজহরি। ভাই! জপের নিয়ম কি?

রামপ্রসাদ। প্রথমতঃ জপের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়াতেই হইবে। তারপর প্রাণায়াম শিক্ষা করিয়া ঐরূপ জপ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রাণায়ামে চিত্তস্থির হইলে যখন হৃদয়াভ্যন্তরে ঘণ্টা-ধ্বনির মত প্রণব-ধ্বনি শুনিতে পাইবে, তখন ঐ শব্দের সহিত গুরুপ্রদত্ত বীজধ্বনি মিশ্রিত করিয়া দিলে, এক অপূর্ব্ব, শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তোমার কণ্ঠস্থ প্রাণশক্তির সহিত আবর্ত্তনাকারে ঘুরিয়া বেড়াইবে। খুব চেষ্টা করিয়া উহা যাহাতে বাহির হইয়া মুখে উচ্চারিত না হইয়া পড়ে—তাই করিবে। উহাই হইল প্রকৃত জপ।

ভজহরি। মরি মরি, কি সুন্দর! তারপর ভাই। তারপর?

রামপ্রসাদ। আমাদের দেহে কয়টি চক্র আছে—জানত? ঐরূপ জপে প্রতিচক্রে তোমার বীজ-ফুল ফুটিয়া উঠিবে। তখন আমার মনোময় ফুলে সাজাইতে হইবে, তাঁহার চরণে অঞ্জলি ঢালিয়া দিতে হইবে। কুলকুণ্ডলিনী নামে প্রফুল্লতা করিতে হইলে, ইহার তুল্য পুষ্পাঞ্জলি আর নাই, এ ফুলে তিনি যত সন্তুষ্ট, এত আর কিছুতেই নহেন। ইহাই হইল—সাধকের নিত্য বস্তু, বাহ্যিক পূজা লোক-শিক্ষার জন্য।

ভজহরি। আজ আমার জন্ম সার্থক হ'লো, প্রসাদ! মায়ের প্রিয় পুত্র শ্রীরামপ্রসাদ! নিরস্ত হইও না ভাই। সুধাবর্ষণ করিয়া তোমার এই অধীনস্থ বন্ধুর অন্তরাত্মার সৎকার সাধন কর।

রামপ্রসাদ। বাজীকরের প্রস্তুত আতস বাজীতে অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন ফুট্ ফুট্ করিয়া ফুল ফুটিতে থাকে, নিভিয়া যায়—আবার ফুটিয়া উঠে, ঐরূপ জপে বীজাগ্নি সংযোগ করিলে আমাদের দেহাভ্যন্তরে সেইরূপ ফুলের ফুলশয্যা হইয়া যায়, জপের প্রবলতা অনুসারে ফুল সকলের স্থায়িত্বও লাভ হয়।

ভজহরি। ভাই! তোমার এই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা তিরোহিত হইয়াছে। বল ভাই! বল?

রামপ্রসাদ। ভাই! কেবল আমি বলিয়া যাইব, তুমি শুনিয়া যাইবে, তাহাতে ফল কি? ইহা শুনিতে মধুর বটে কিন্তু কার্য্যে করা বড় কঠিন, ইহা সামান্য অধিকারীর পক্ষে নহে। তবে প্রথমে তুমি ক্রমশঃ জপের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা কর, জপের সংখ্যা বাড়াইলে তবে তুমি স্থির হইতে পারিবে। চিত্ত বশীভূত হইলে পর ঐ সকল কার্যে অগ্রসর হইলে তবে এই গুরুতর বিষয় আরম্ভ করিতে সক্ষম হইবে। ভাই! জগতে ধন সঞ্চয় করিতে হইলে কত চেষ্টা—কত কৌশল, কত প্রাণান্ত করিতে হয়, তবে পার্থিব ধনে ধনবান্ হওয়া যায়। আর এ অপার্থিব ধনের, এ অতুলনীয় আনন্দের অধিকারী হইতে

হইলে কি তোমার সামান্য পরিশ্রমে হইবে? পার্থিব ধনে পৃথিবীর বিষয়েই তুমি ধনবান্ হইতে পার, অতুল সুখলাভ করিতে পার, কিন্তু ত্রিজগতে যাহার তুল্য সুখ আর নাই, পার্থিব অতুলধনের আনন্দ—যে আনন্দের সহিত কোন প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না, তাহা লাভ করা কি এত সহজ-সাধ্য হ'তে পারে।

ভজহরি। না না—তা কি হইতে পারে? তবে এখন জপের সংখ্যা বাড়াইতে আরম্ভ করি কেমন?

রামপ্রসাদ। হ্যাঁ। তাহা হইলে ক্রমশঃ তোমার চিত্ত প্রশান্ত হইবে, তোমার ধারণা করিবার শক্তি জন্মিবে, নতুবা যত শুনিবে ততই খারাপ হইবে।

ভজহরি বন্ধুর বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া পূর্ব্বদিন প্রাপ্ত গুরুমন্ত্র হৃদয়ে জপমালা করিতে নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিল।

রামপ্রসাদ প্রতি কথাতেই বলিতেন—কলিতে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কর্ম্ম না করিলে ভক্তি আসিতে পারে না, এইজন্য তিনি কর্ম্ম করিবার উপদেশ অগ্রে প্রদান করিতেন। রামপ্রসাদ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে এজন্মে এত শীঘ্র সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিশ্বজননীর চাক্ষুষ দর্শন, পুত্রের ন্যায় তাঁহার সহিত কথোপকথন, প্রসাদের ন্যায় একনিষ্ঠ সাধকের সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু কলিতে তোমার আমার মত অন্নগতপ্রাণ জীবের পক্ষে যোগ-সাধন করা ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করা বড়ই দুরূহ, এজন্য এখন কর্ম্ম করিতে করিতে ভক্তি লাভ করিতে পারিলেই জীব কৃতার্থ হয়, তাহার মনুষ্য জন্ম সফলতা লাভ করিতে পারে। কলিতে একজন্মে কেবল ভক্ত রামপ্রসাদই, ভক্তির উচ্ছ্বাসই তাঁহার প্রত্যেক বিষয়ে মাখামাখিরূপে জড়িত ছিল। এইজন্য বলিতে হয়—কলির জীবের পক্ষে ভক্তি-পথ অতি প্রশস্ত এবং ধর্ম্ম কর্ম্মের দ্বারা তাহা লাভ করা সহজ সাধ্য। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিমার্গই মাকে পাইবার সহজ উপায়। ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিলে—তিনি যত সহজে গলিয়া যান, তত আর কিছুতেই নহেন। তজ্জন্য আমরা দেখিতে পাই—ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পর শ্রীচৈতন্য, নানক, রামানুজ, রামানন্দ, কবির, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই ভক্তিপথের পথিক এবং ভক্তি-মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এই যে পরা ভক্তি—ইহা কথার কথা নহে। ভক্তি করিলেই ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভক্তি অনুরাগ মিশ্রিত না হইলে সে ভক্তির আকর্ষণী শক্তি থাকে না। চুম্বকে লৌহ আকর্ষণের মত তাঁহাকে টানিতে হইলে, নিজেকে তাহার মত করিতে হইলে, ভক্তি একান্ত অনুরাগ মিশ্রিত করিতে

হইবে। অনুরাগ মিশ্রিত ভক্তি থাকিলেই তুমি অতীব ক্ষুদ্র হইলেও সেই মহামহীয়সী, অনন্ত শক্তির পাত্রী আদ্যাশক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে। ভক্তিপথে মন যখন ভগবানের প্রতি অনুরাগী হয় এবং সেই অনুরাগ গাঢ় হইয়া যখন ভাব-সমাধিতে পরিণত হয়, তখন বিষয়-বাসনা, জাগতিক অসার কামনা, আপনাআপনিই মন হইতে উড়িয়া যায়। মনের এই অবস্থাই শুদ্ধির অবস্থা, ইহাকেই চিত্ত-শুদ্ধি কহে। ইহা যোগ দ্বারা বা ভক্তির দ্বারা লাভ হউক—ফল একই। এইজন্য বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকা একমাত্র প্রেম ভক্তির বলেই বলিতে পারিয়াছিলেন—"শূন্য হৃদয়োপরি, আও আও মুরারি মধুর মুরলী বাজা।" কেবল অনুরাগ মিশ্রিত প্রেম শক্তির বলেই তাঁহার একমাত্র অভীষ্টদেবতা, হৃদয়ের ধনকে ঐরূপ আহ্লাদের সহিত ডাকিতে পারক হইয়াছিলেন। মনোবাসনার লয় না হইলে হৃদয় কখন শূন্য হইতে পারে না, সাধারণ জীবের জীবনই বাসনা বা ঐ বাসনা চরিতার্থের আশা। আশাহীন জীবন—শূন্যময়, অতএব মৃত। ভক্ত প্রেমভক্তির আগুনে জাগতিক নশ্বর বাসনা-কামনা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে—তাই তার হৃদয় শূন্য। ভক্তহৃদয় কামলীলায় লালায়িত নহে, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজ সেই ভক্ত শ্রীরাধাকে কামুকী স্ত্রীলোক বলিয়া কত নিন্দা করে। এত বড় একটা আদর্শ নারীচরিত্রে অনভিজ্ঞ শিক্ষিত সমাজের এরূপ কটাক্ষপাত যে কতদূর নিন্দনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহার কিছু জানি না, তাহার সমালোচনা বিড়ম্বনা নয় কি? ভাব-সমাধিস্থ যোগীর সমাধিভঙ্গের পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, সমাধি লাভের সময় হৃদয় কিরূপ নির্ব্বিকার, নিশ্চল হইয়া যায়। সেই বিকাররহিত, কামনা-শূন্য হৃদয়ই ব্রহ্মময়ীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। শ্রীমতী প্রাণধনের প্রতি ভালবাসার আতিশয্যে, তাঁহার চিন্তায় একেবারে তন্ময় হইয়া, সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। সমাধিস্থ যোগীর হৃদয়ে যেমন ওঁকারের মধুরধ্বনি উত্থিত হয়, শ্রীমতীও হৃদয়ে তেমনি মুরারির মধুর মুরলী রব শুনিতেন এবং অহরহঃ তাই বলিতেন—"শূন্য হৃদয়োপরি, আও আও মুরারি, মধুর মুরলী বাজা"। শুধু কি এই। শ্রীমতী আরও কতবার বলিয়াছেন—"নয়ন সলিলে বসন তিতায়ল, সাধ কি সাগর হিয়া'পরি শুখাল।" ইহা কি শূন্য হৃদয়ের পরিচয় নহে? ইহাকেই কি নির্ব্বিকার চিত্ত বলে না? মরি মরি কি প্রেম-ভক্তির গভীরতা! প্রভু! প্রাণধন, প্রাণনাথ, তোমার দেখ্‌বার জন্য নয়নজলে বসন ভিজিয়া গেল, সাধের সাগর হিয়ার উপর শুখাইয়া গেল। এ অবস্থায় সাধকের চিত্ত কি আর বিকারগ্রস্ত থাকিতে পারে? অতএব এই নির্ব্বিকার হৃদয়ই ভগবানের আসন! শ্রীরাধার মত প্রাণ দেওয়া সাধককে

বৃন্দাবনেরই কেহ কেহ চিনিতে পারে নাই, তা আমরা ত' কোন্ ছার! তাই তাঁহাকে তাঁহার শাশুড়ী ননদী, কুলটা আখ্যা প্রদান করিয়া কত নিন্দা করিত। শ্রীরাধা তাহাতে মরমে মরিয়া যাইতেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভক্তপ্রাণের অন্তর্দাহ বুঝিতে পারিয়া, তাহা অপনোদনের জন্য একদিন কপট রোগী সাজিলেন। তাঁহার পীড়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রাণা যশোদা চারিদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। চতুর-চূড়ামণি চতুরালি করিয়া অন্য দিক দিয়া বৈদ্য সাজিয়া আসিয়া বলিলেন—"আমি রোগের সমস্ত কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। কোন সতীর দ্বারা সহস্র ছিদ্র কলসে যমুনার জল আনিয়া ইহার গাত্রে ছিটাইলে, ব্যাধি দূরীভূত হইবে। সতী ভিন্ন ইহা কেহ আনিতে পারিবে না। বিষম বিপদ সহস্র ছিদ্র কলসে কেহ কখন জল আনিতে পারে কি? যে যায় সেই অসতী হয়, কাজেই সকলে দুঃখে-অপমানে বৈদ্যরাজের বদনে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন যশোদা বলিলেন—"কেহই ত পারিল না, বৈদ্যরাজ! আমায় অনুমতি করুন।" কৃষ্ণগত-প্রাণা সতী সিমন্তিনী যশোদার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু লীলাময়ের এ লীলা ত যশোদার জন্য নহে, ইহা যে কলঙ্কিনী শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জনের জন্য, তাই বলিলেন—"মাতৃদত্ত ঔষধে গুণ হয় না," তবে আমি গণনা করিয়া বলিতেছি—"এক সতী বসতি করে গোকুলে। গৌরবরণা ধনি রাধা তারে বলে॥"

বৈদ্যের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল; জটিলা, কুটিলা কত গালাগালি দিতে লাগিল; কিন্তু কি হইবে—যখন বৈদ্যরাজ বলিতেছেন, তখন আর কথা কি? শ্রীমতীকে ডাকিয়া আনা হইল। শ্রীকৃষ্ণের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া শ্রীমতী, কৃষ্ণ চিন্তায়, বিভোরা, তাঁহার মর্ম্মস্থল দগ্ধ হইতেছে, হৃদয় কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে, যে যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া প্রাণ দিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছে! তাঁহার অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে যাহা হয়, রাধার আজ তাহাই হইয়াছে! রাধার প্রাণ শূন্য, হৃদয় শূন্য—শূন্য দেহে শূন্য প্রাণে কলের পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহাকে ঘটনাস্থলে লইয়া আসা হইল। সহস্র ছিদ্র কলসী কক্ষে দেওয়া হইল—তন্ময়ভাবে শ্রীরাধা যমুনায় যাইয়া গাহিলেন—

"এখন যা করহে ভগবান,
অসম্ভব সব, তোমাতে সম্ভব,
একবার ছিদ্র ঘটে আসি হও অধিষ্ঠান।
ছিদ্র ঘটে যদি বিপদ ঘটে হরি,
যদি আন্তে নারি এই বারি,
তবে ওহে দুঃখহারি! এই বারিতে ত্যজিব প্রাণ।"

শ্রীরাধার এখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; তিনি এখন নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া প্রাণময়ের অস্তিত্বে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন! তিনি সহস্র ছিদ্রপথে দেখিতেছেন—তাঁহার প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কলঙ্ক মোচনের জন্য, তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সহস্ররূপে ছিদ্র পথে অবস্থিত, রাধিকার ত সতীত্বের অহঙ্কার নাই—আমিত্ব-রূপ অহমিকা যে ভক্তহৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না! অতএব "ভগবান্ যা কর।" এই প্রাণের আহ্বানে কি আর ভক্তবৎসল স্থির থাকিতে পারেন? তাই প্রত্যেক ছিদ্রে ছিদ্রেশ্বর হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, শ্রীরাধা ভাবমগ্না হইয়া অনায়াসেই যমুনা হইতে জল আনিয়া দিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহাই ভক্তের ভক্তিবল, এরূপ ক্ষমতা কি আর কাহারও আছে? আমাদের মন সহস্র ছিদ্র ঘট বিশেষ, ইহার যে কত দিকে গতিবিধি, তাহার কি স্থিরতা আছে? সমাধিস্থ হইয়া,—তন্ময় হইয়া, সেই স্বরূপে এই ছিদ্রগুলি বুজাইয়া দাও, তুমি অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। বহু বিকারে বিকৃত মনকে ভক্তিবারি বিধৌত নির্ব্বিকার করিতে পারিলেই ত সে পবিত্র মানস-আসন মায়ের চিরপ্রিয় অবস্থান ক্ষেত্র। হৃদয় শূন্য হইলে যে কি হয়, সে ভাবের বিষয়ে সাধক-চূড়ামণি রামপ্রসাদ গাহিলেন :—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি জয়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে, জ্যেষ্ঠপুত্র, তত্ত্ব কথা তায় শুনাবি।

নিবৃত্তি লাভ হইলে—চিত্ত কামনা শূন্য হইলে, বিবেক আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, বিবেক কিনা মাই সৎ, আর যাবতীয় বস্তুই অসৎ অর্থাৎ মায়াময় নশ্বর। এই কথার সত্যতা রক্ষার জন্য আমার বহুদিন শ্রুত একটি গান মনে পড়িল :—

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্তে যার ইচ্ছা
তাকে আগে শাক্ত হ'তে হয়।
শক্তি হলে প্রকাশ,
সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান অপমান বলিদান দিয়ে কর রিপু জয়।
রিপু জয় হলে হয় জ্ঞানের বৃদ্ধি,
তখন অনায়াসে হয় ভূতশুদ্ধি,

সিদ্ধি হয় তখন, নইলে মন,
অ, আ, ই, ঋ ক'র্ত্তে হয়।
সিদ্ধি হ'লে মন, বৈষ্ণব লক্ষণ,
তখন হিংসা আদি হবেরে বারণ,
বিবেকী যখন, হবে মন, তখনরে ভক্তির উদয়।
কাঙ্গাল বলিছে ভক্তি হয় তখন,
ওরে ভেদ জ্ঞান না থা-ক যখন,
হয় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, জগৎ দেখি ব্রহ্মময়।

"ভক্তি ভাবের ভাবুক রামপ্রসাদ এই ভাবে বিবেকী হইয়া ব্রহ্মময়ী মায়ের সাধন করিতেন। অতএব তিনি জগতের সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন না কেন? শ্রীমতীর ভক্তিভাব শ্রীরামপ্রসাদ ঠিক একরূপ ভাবেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণ জগৎ দেখিয়া আত্মহারা হইতেন, ভক্তবীর শ্রীরামপ্রসাদ মাময় জগৎ দেখিয়া মাতৃসত্বার আপন অস্তিত্ব হারাইতেন; সেই জন্য কালীর আদুরে বেটা শ্রীরামপ্রসাদ কলির শ্রেষ্ঠ-সাধক, তাঁহার অসাধারণ সাধন-ভজনের জন্যই বিশ্বেশ্বরী মা এইরূপ প্রগাঢ় ভাবে বাঁধা পড়িয়াছিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শরতে মাতৃদর্শন

বর্ষার পর শরতের শোভা বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে, বর্ষার মেঘমলিনতা কাটিয়া গিয়াছে। দুঃখের অপগমে সুখোদয়ের ন্যায় প্রকৃতির কোলে আবার সুখ-সূর্য্যের সমুদ্ভব হইয়াছে। জীব-জীবন আনন্দ-মগ্ন হইয়া বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপিণী, আনন্দময়ীর দর্শন জন্য উৎফুল্ল ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। মাতৃভক্ত বাঙ্গালীর হৃদয় আজ শক্তি-মন্ত্রে উদ্বোধিত, মায়ের চরণ-প্রান্তে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালী-হৃদয়ের জড়তা অপসারিত হইয়াছে; সকলেই চৈতন্যময়ীর চৈতন্যে সচেতন হইয়া কাতরপ্রাণে তাঁহার আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে। এই সময় তিন দিনের জন্য ত্রিনয়না মা মর্ত্ত্যে তাঁহার প্রভূত শক্তির বিস্তার করিয়া থাকেন। যদিও জগতের প্রত্যেক বস্তুই তাঁহার শক্তিতে শক্তিমন্ত, তাঁহার শক্তি না পাইলে যদিও জগৎ থাকিতে পারে না, তথাপি এই তিন দিন তিনি সাধারণ

ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য, সকাম সাধকের কামনা পূরণের জন্য দুর্গতিহারিণী, জগত্তারিণী দুর্গা রূপে চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া মূর্ত্তি মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন্। প্রবাদ আছে—এই সময় ভগবতী কৈলাসের মণিমন্দির ছাড়িয়া মর্ত্ত্যধামে পদার্পণ করেন। ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি-পূজার সার্থকতা সম্পাদন করিতে ঠিক এই সময়ে দেবী প্রতি বৎসর মর্ত্ত্যবাসীকে এইরূপ করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই মর্ত্ত্যে দুর্গোৎসব হিন্দুর মহাপূজা, সকল কাম্য-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, কলিতে ইহার অনুষ্ঠান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

ভারতে এমন একদিন ছিল, যখন হিন্দুর প্রতি ঘরে ঘরে বারমাসে তের পার্ব্বণের অনুষ্ঠান হইত, এই সকল কাম্য কর্ম্মের আনন্দ উৎসবে একসময় পল্লী-সমাজে সুখের আনন্দ উৎস প্রবাহিত হইত। আপামর সাধারণ সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত; দুর্গোৎসব হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, এ সময় কেহ বা ঘটে, কেহ বা পটে, কেহ বা প্রতিমায় পূজার আয়োজন করিয়া আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে। রামপ্রসাদ যখন আমাদের দেশ পবিত্র করিয়াছিলেন, তখন ত দেশে ধর্ম্মের এতদূরগ্লানি উপস্থিত হয় নাই, তখন গৃহে গৃহে এই সকল পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুজীবন পবিত্র করিত।

নদীয়া রাজভবনে ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আলয়ে বিশেষ জাঁক জমকের সহিত এই দুর্গোৎসব সমাহিত হইত; দেশ বিদেশ হইতে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া রাজ-ভবনে উৎসবামোদে মত্ত হইত। বর্দ্ধমানরাজ দান-বীর মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল; পরস্পরের আলয়ে পরস্পরের নিমন্ত্রণের আদান প্রদান হইত। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রও একজন সাধক ছিলেন। আজকাল রাজা মহারাজাদিগের নিকট অর্থই যেমন সর্ব্বস্ব বলিয়া বিবেচিত হয়—নামের শেষ ভাগে যেমন কতকগুলি বর্ণমালা সংযোগ করিয়া মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন, তখন সেরূপ ছিল না, তাঁহারা নিজেকে ধর্ম্মধনে ধনী করিয়া মনুষ্যত্ব সম্পন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এইজন্য তখন জমীদার মহলে প্রকৃত ধার্ম্মিক মহাত্মারও অভাব ছিল না। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী এবং তদীয় পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ ধর্ম্মালোচনার জন্য বিশ্ববিখ্যাত। তখনকার নরপতি গণ এসকল বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, ধর্ম্ম কর্ম্মের পবিত্রতা বুঝিতে পারিতেন বলিয়া প্রজাবর্গও ক্ষমতানুসারে তাহার প্রতি আস্থাবান ছিল, তাই প্রতি পল্লীতে, হিন্দুর ঘরে ঘরে দেবদেবীর আরাধনা হইত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাপূজায় ব্রতী হইয়াছেন, কাজেই রামপ্রসাদকে তথায়

যাইবার জন্য আদেশ হইয়াছে, কিন্তু রামপ্রসাদ কেমন করিয়া তথায় যাইবেন? মহাষ্টমীর শুভ বাসর তাঁহার সাধন-সিদ্ধির প্রধান ও প্রকৃষ্ট মুহূর্ত্ত, এই শুভ সময়ে এরূপ শুভ-সংযোগ ছাড়িয়া, সিদ্ধাসনে মায়ের দর্শনলাভ ছাড়িয়া তিনি জাগতিক তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতে পারেন কি? সাধক সাধন-ভজনে যে অতুল আনন্দ উপভোগ করেন, জগৎ বিনিময় করিলেও কি সে পবিত্র আনন্দের কণিকা মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়! অতএব রামপ্রসাদ এ শুভ মুহূর্ত্ত উপেক্ষা করিয়া রাজ-ভবনে যাইতে পারিলেন না। তবে পরম শুভানুধ্যায়ী মহারাজের প্রীত্যর্থে তদীয় পুত্র রামদুলাল ও ভজহরিকে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ পাঠাইয়া দিলেন। মহাষষ্ঠীর দিবস রামদুলাল ও ভজহরি কৃষ্ণচন্দ্র-ভবনে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহাসমাদরে সাধক-পুত্র রামদুলাল ও তদীয় সহচর ভজহরিকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। রামপ্রসাদ যে কেন আসিলেন না, তাহা কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় একনিষ্ঠ কর্ম্মী সাধকের বুঝিতে বাকী রহিল না; প্রসাদের ন্যায় বীরভক্ত কি এমন শুভদিন বৃথা আমোদ প্রমোদে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া নষ্ট করিতে পারেন? মহারাজ তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং বিশেষ সন্তোষ সহকারে রামদুলাল ও ভজহরির সৎকার সাধন করিতে লাগিলেন। দেশ বিদেশ হইতে কত বড় বড় লোক আজ রাজবাটীতে সমাগত, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সকলের নিকট প্রসাদপুত্র রামদুলালের পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলেন। সাধকের পুত্র বলিয়া রামদুলালকে সকলেই আদর আপ্যায়ন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠির দিন সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষমূলে উদ্বোধনের পর দেবীর আমন্ত্রণাদি অধিবাস কার্য্য সমাধা হইল। কৃষ্ণচন্দ্র সাধক ছিলেন, দেবীর আবির্ভাবের কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইল না দেখিয়া ক্ষুণ্ন মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইল কিন্তু কই, দেবী ত কটাক্ষপাত করেন নাই, মূর্ত্তি মধ্যে অধিষ্ঠিতা হন নাই? আমার প্রাণ তবে এ বৎসর কেন এরূপ হইল, ভক্তিভাব-হীন হৃদয় বলিয়া কি মা আমার প্রতি কৃপা করিলেন না! কৃষ্ণচন্দ্র নিজ জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কিন্তু এ সময় ত দেবী মর্ত্ত্যে পদার্পণ করিবেনই, সে বিষয়ে ত সন্দেহ নাই, তবে বেটি আজ কোন্ ভাগ্যবানের প্রতি প্রসন্ন হইল। মহারাজ প্রতিবাসী কয়েকজনের বাটীতে প্রতিমা দেখিয়া আসিলেন, কিন্তু তাহাতেও দেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া বোধ করিলেন না, কাজেই উচাটন মন—প্রাণ লইয়া মহারাজ ছদ্মবেশে বাটীর বাহির হইলেন; বন্দোবস্তানুসারে রাজবাটীর পূজা সমভাবে চলিতে লাগিল, তাহার কোনরূপ ত্রুটী হইল না।

মহারাজ গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর অতিক্রম করিয়া প্রতি পূজা-বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিতেছেন—কেবল প্রতিমা, কেবল খড়মাটী সাজসজ্জা ভূষিত মাটীর প্রতিমা, মায়ের কটাক্ষপাত বা আবির্ভাব তাহাতে হয় নাই। সাধকশ্রেষ্ঠ মহারাজ এইরূপে দেখিতে দেখিতে ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়াছেন। এদিকে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রেরও সেই ভাব হইয়াছিল, তিনিও পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া দেবী-দর্শনে জীবন সার্থক করিবার জন্য ছদ্মবেশে বাটীর বাহির হইয়াছেন, পথিমধ্যে দুইবন্ধুতে মিলিত হইলেন একাকী অপেক্ষা দুইজনে পথ অতিবাহিত করায় আনন্দ হইতেছে বটে, কিন্তু তাঁহারা দুইজনেই বিশেষ দুঃখিত, কীর্ত্তিচন্দ্র বলিতেছেন "ভাই! এবার ব্যাপার কি? এবার কি বেটী কৈলাসের মণিমন্দির পরিত্যাগ করেন নাই নাকি?" কৃষ্ণচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন—"তাও কি হয়, চিরকাল যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাঁহার কৃত সেই অকাট্য নিয়মের কি পরিবর্ত্তন হয়? শরতে শারদীয়ার আগমন মর্ত্ত্যে অবিসংবাদী সত্য, মর্ত্ত্যবাসীকে ধন্য করিতে, ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে ভক্তবৎসলার মর্ত্ত্যে আগমন, এ সময় স্থির, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। মর্ত্ত্য-ধাম এখন তত ভক্তহীন হয় নাই, তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না, চলুন—গ্রামান্তরে গমন করি।" এই বলিয়া অপর একখানি গ্রামে গমন করিয়া প্রতি পূজাবাটী পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, কিন্তু তথায়ও সমভাব, দেবীর দর্শন পাইলেন না। কয়েকদিন অনবরত পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়াছে, তাহাতে নৈরাশ্যের সমাবেশ হইয়া যেন আর পদ হইতে পদান্তরে যাইতে পারিতেছেন না; বেলাও সায়াহ্নের সমীপবর্ত্তী, দুই বন্ধুতে একটী প্রান্তর প্রান্তে বৃক্ষমূলে হতাশ ভাবে উপবেশন করিয়া নিজেদের অদৃষ্টকে, ভারতবাসীর মন্দ-ভাগ্যকে ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। তখনও দিবাকর, দিবার কার্য্য শেষ করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হয়েন নাই, সামান্য বেলা আছে। রাজদ্বয় অলসভাবে, মুদিতনেত্রে ধর্ম্মহীন দেশের প্রতি মায়ের কৃপাহীনতা, তাঁহার কোপ দৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিয়া আকুল হইতেছেন, এমন সময় অদূরে গ্রামের প্রান্তভাগে কাঁসরধ্বনি শ্রুত হইল। উভয়েই প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"চল চল, নিকটে পূজাবাটী আছে, চল, আজ তথায় আশ্রয় লওয়া যাইবে, নতুবা আর পথ ভ্রমণ করিতে পারা যাইবে না। আজ মহাষ্টমী, আজ যদি কোথাও মায়ের দর্শন না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব—দেবী, তাঁহার পুত্রগণের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। মর্ত্ত্যের মহাপূজায় আর তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনের শুভ সুযোগ হইবে না।" এই বলিয়া দুই বন্ধুতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে পূজাবাটিতে উপস্থিত হইলেন। এক দরিদ্র দ্বিজের বাটীতে পূজার

আয়োজন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ স্বহস্তে বন্যবৃক্ষ-পল্লবে একখানি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে স্বহস্ত নির্ম্মিত মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পার্শ্বে এক খানি ভগ্নকুটির ব্রাহ্মণের থাকিবার জন্য আছে। অতি দীনভাবে তণ্ডুলের খুদ এবং অপক্ক কদলীর দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া পাত্রাভাবে পত্রে তাহা রক্ষা করিয়াছেন। পূজার বাহ্যিক আয়োজন তেমন কিছু দেখিবার নাই, সাধারণ চক্ষে দেখিলে বাল্যক্রীড়া বলিয়াই বোধ হইবে। সন্ধ্যা-পূজার ভোগ ও আরত্রিক শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ ধ্যানোপবিষ্ট; লোকজনের কোন সমাগম নাই। কিন্তু একি এ! আজ ত্রিলোকেশ্বরী যে জগতের বিলাসলালসা ছাড়িয়া, এই দরিদ্র ভগ্নকুটিরে সমাগতা, জগতে কত ধনী-ভক্ত উপাদেয় দ্রব্যসম্ভারে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদনে ব্যস্ত, কিন্তু মা আমার সে সকল তুচ্ছ করিয়া দরিদ্রের ভক্তিমাখা মা মা বুলি শুনিতে প্রণতি-চন্দন চর্চ্চিত প্রেম পুষ্পে পূজিত হইতে, আজ এই নির্জ্জন ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত। ভাই! দেখ, দেখ বেটী আজ উদর পুরিয়া অপক্ক কদলী ও তণ্ডুলকণা খাইয়া কেমন পরিতৃপ্তির সহিত হাস্য আস্যে বিরাজমানা। এই জন্যই বলিতে হয়—মায়ের সন্তোষ সাধনের জন্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই; যেখানে বাহ্যিক চাকচিক্য সেইখানে ভিতর অন্তঃসার-শূন্য; প্রাণের ডাকে ডাক, প্রাণ উৎসর্গ কর, প্রাণ দিয়া প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, দেখিবে প্রাণময়ী মা আমার জগতের সমস্ত তুচ্ছ করিয়া তোমার হইবেন, তোমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া প্রাণময়ীরূপে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। দেবীর উদ্বোধনে চাই প্রাণ, চাই ভক্তি, চাই প্রেম, চাই হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ব্রহ্মকটাহভেদকারী মা-মা শব্দ। সাধক! দেখ দেখি, কর দেখি একপ আবাহন—দেবী জাগে কি না? তোমার মাটীর মূর্ত্তি সাড়া দেয় কি না, তোমার অভীষ্টফল লাভ হয় কি না?

আমাদের প্রাণ কোথা, ভক্তি কোথা? তবে উদ্বোধন কি কথার কথা! কটা মন্ত্রের আড়ম্বরই কি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা? না, তাহা নহে, প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, তবে দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইবে—নতুবা সমস্ত ব্যর্থ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কীর্ত্তিচন্দ্র মাতৃদর্শন পাইয়া পরম উল্লসিত চিত্তে মাতৃপিঠের প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া সেই ত্রিতাপহরা, দুর্গতিনাশিনী ভক্তবৎসলার ভবারাধ্য, নয়ন-মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণের ধ্যানাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূজার এই কয়দিবস তাঁহারা এই স্বর্গ-সদৃশ পবিত্র পুরীতে অবস্থান করিয়া পবিত্র হইবেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহবাসে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবেন—বলিয়া মনস্থ করিলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সমাধিস্থ ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহারাজদ্বয় সময় বুঝিয়া মণ্ডপ সম্মুখে গমন করত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ব্রাহ্মণ অনায়াস লব্ধ দুইটী অতিথিকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন—"আসুন, আসুন, আজ আমি ধন্য হইলাম। 'অতিথি নারায়ণ'। বিনা চেষ্টায় আজ আপনারা অধীনকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন; আজ আমি ধন্য, আমার পূজা ধন্য, আমার বাস্তু পবিত্র হইল।" পাঠক! দেখিলেন—ভক্তের প্রাণ কি কোমলতার, কি নম্রতার আধার। এরূপ না হইলে কি মরে অমরের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে?

ছদ্মবেশী মহারাজদ্বয় বলিলেন—"প্রভো! আমাদের নিকট এরূপ অনুনয় বিনয় করা উচিত নহে, আমরা আপনাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ।"

ব্রাহ্মণ। কিছু নয় বাবা! অতিথি, যে বয়সেরই হউন, তিনি গৃহীর নিকট দেবতার ন্যায় পূজ্য।

মহা। আমাদের জন্য আপনাকে সময় নষ্ট করিতে হইবে না, আপনার কাজকর্ম্ম সমাধা করুন। আমরা অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে, এই স্থানেই অবস্থান করিতেছি।

ব্রাহ্মণ। বাবা! আমার বসিতে দিবার স্থান নাই, তোমরা নিজগুণে সন্তুষ্ট চিত্তে এই প্রাঙ্গণের একস্থানে উপবেশন কর।

মহা। ঠাকুর! কোন চিন্তা করিবেন না, মাতৃপদার্পণে এস্থান স্বর্গাপেক্ষাও পবিত্র হইয়াছে, আমরা এই বৃক্ষতলে উপবেশন করিতেছি, আপনি কার্য্য করুন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সন্ধ্যা হইল। অন্তঃপুর হইতে একটি দেবীস্বরূপিণী নারীমূর্ত্তি সন্ধ্যাকালীন আরত্রিক কার্য্যের আয়োজন করিয়া দিয়া গেলেন: ইনি ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী, অগ্নি পাংশুজালে আচ্ছাদিত হইলেও যেমন আপন জ্যোতিঃ বিকির্ণ করে। দরিদ্রতা হেতু এ দেবীমূর্ত্তিও তদ্রূপ, অদ্ভুত প্রভাবিশিষ্টা, দেখিলে স্বতঃই চরণে পতিত হইতে ইচ্ছা করে।

ব্রাহ্মণ পুনরায় দেবীর সন্ধ্যাকালীন ভোগ প্রদানানন্তর আরত্রিক শেষ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সে ধ্যান ভঙ্গ হইতেও দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। মহারাজদ্বয়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে কেবল সেই মূর্ত্তির প্রতি অবলোকন করিতেছেন, আর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পূজাদি শেষ করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। যে সকল অতি সামান্য দ্রব্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহাদের দেওয়া হইল। দেবীর প্রসাদে সেই সামান্য দ্রব্যের সামান্যত্ব ঘুচিয়া উপাদেয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে! এ সকল উৎসর্গীকৃত

দ্রব্যের মধুরতার কি আর তুলনা আছে? দেবতারাও এ ভোগ্য উপভোগ করিতে সর্ব্বদা লালায়িত। মহারাজদ্বয় মহা পরিতৃপ্তির সহিত এই সকল উদরস্থ করিয়া পূজামণ্ডপের একস্থানে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। এইরূপে কয়দিন তথায় অবস্থান করিয়া বিজয়োৎসব সমাধা করত বিদায়ের সময় ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"ঠাকুর। আপনার ত বড় কষ্ট দেখিতে পাইতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা! কষ্ট আর কি? অনুভব করিলেই কষ্ট, নতুবা—সমস্তই সুখ।"

মহারাজদ্বয় ব্রাহ্মণকে দরিদ্রতার কঠোর দংষ্ট্রে চর্ব্বিত দেখিয়া, বহু জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন এবং মাতৃ-পূজার বিশেষ ভাবে আয়োজন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! যে পবিত্র ভক্তির উৎস ব্রাহ্মণের হৃদয়-কন্দর পবিত্র করিত, জানি না, ধন-গরিমার প্রখর উত্তাপে তাহা শুকাইয়া যাইবে কি না! স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামদুলালকে ভজহরির সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং আগামী শ্যামাপূজার মধ্যে তিনি কুমারহট্টে আসিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসুন্দরের কথা

রামদুলাল ও ভজহরি রাজবাটীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদর আপ্যায়নের কথা সকলের নিকট শতমুখে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূজার সময় দেশ ছাড়িয়া দুই বন্ধুতে দেশান্তর গমন করিয়াছিলেন, পুত্র এ কথা পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন। প্রসাদ শুনিয়া প্রাণের সহিত রাজদ্বয়কে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে তাঁহার একজন প্রকৃত হিতৈষী এবং উপযুক্ত বন্ধু, তাহা এতদিনে বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিলেন এবং মঙ্গলময়ী জননীর নিকট বন্ধুবরের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল না, তাঁহাকেও একজন বিশেষ মাতৃভক্ত জানিতে পারিয়া তাঁহার দর্শনলাভ জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আসিলে তাঁহার নিকট এই অভিপ্রায় জানাইবেন—বলিয়া স্থির করিলেন। বন্ধুর বাক্য যে বন্ধুর নিকট রক্ষিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

ভজহরি ও রামদুলালের বাটীতে আসিতে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়াছিল। পথ ভ্রমণে শরীর শ্রমকাতর হইয়াছিল বলিয়া রামদুলাল আহারাদির পর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই, শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভজহরি এখন আর সেরূপ নাই, সে এখন বেশ কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়াছে; কয়েকদিন প্রসাদের সঙ্গ করিতে পারে নাই বলিয়া, সে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, আজ বাটীতে আসিয়া আহারাদির পর প্রসাদের সঙ্গে কত মনের কথা কহিতে লাগিল। রামপ্রসাদ বলিলেন—"রাজবাটীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ভজহরি, বেশ মোটা হ'য়েছো দেখ্‌ছি?"

ভজহরি। ভাই! এখন আর এ সকল তত ভাল লাগে না। পূর্ব্বে নিমন্ত্রণের বড় আগ্রহ ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তাদৃশ নাই, উহাতে বৃথা সময় নষ্ট, আর শরীরের কষ্ট—ইষ্টলাভ কিছুমাত্র নাই।

রামপ্রসাদ। সংসার-ধর্ম্ম ক'র্ত্তে গেলে, এ সকল না করিলেও ত চলে না?

ভজহরি। সে জন্য গিয়েছিলাম, দুই একজন না গেলে মহারাজ মনে ক'র্ব্বেন কি? মহারাজের ন্যায় পবিত্র-চেতা সাধুলোকের দর্শনও ত একান্ত প্রার্থনীয়।

রামপ্রসাদ। সে পক্ষে আর সন্দেহ আছে? অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়া এরূপ ধর্ম্ম-প্রকৃতি-সম্পন্ন, নির্ম্মল-স্বভাব আর কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়? বর্দ্ধমানের মহরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল কি?

ভজহরি। হাঁ, কিন্তু তিনি রাজবাটীতে পদার্পণ করিয়াই স্বরাজ্যে গমন করিলেন, কথাবার্ত্তা কিছুই হয় নাই; তবে মহারাজের বাহ্যিক ভাব দেখিয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে তাঁহাকেও একজন সাধুপুরুষ বলিয়াই বোধ হইল।

রামপ্রসাদ। রাজবাটীর পূজা কিরূপ দেখিলে?

ভজহরি। পূজায় খুব ধুম; বহুলোকের সমাগম, আহারাদিরও খুব আয়োজন, লোকের সাদর-সম্ভাষণ খুবই বেশী, এ সকলের ভার কবিবর ভারতচন্দ্রের উপরই ন্যস্ত ছিল। তুমি তথায় না যাওয়ায়, তিনি কতবার তাহার জন্য অনুযোগ করিলেন, শেষে বলিলেন,—রামপ্রসাদ আসিল না কিন্তু তাহার পুত্র আসিয়াছে, আজ ইহাকে লইয়াই আমরা আনন্দ করিব।

রামপ্রসাদ। পণ্ডিত ভারতচন্দ্র সামাজিক কাজ কর্ম্মে নেতৃত্ব গ্রহণের একজন বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি, এইজন্য তিনি মহারাজের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ?

ভজহরি। আচ্ছা ভাই প্রসাদ! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত যখন বর্দ্ধমান রাজার এত বন্ধুত্ব; তখন তাঁহারই সভাপণ্ডিত রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজবাটীর বিষয় লইয়া "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিলেন কেন? ইহাতে ত রাজবাটীর অনেকটা কলঙ্ক ঘোষণা করা হইয়াছে!

রামপ্রসাদ। ভাই, "বিদ্যাসুন্দরের" রচনায় কবিবরের কৃতিত্বের সীমা পরিসীমা নাই, সাধারণ লোকে উহার মর্ম্ম বুঝে না বলিয়া উহাকে একটা কুৎসিত ঘটনা বলিয়া মনে করে। যাহারা উহা বুঝিতে পারে—তাহারা ভারতচন্দ্রকে একজন মহা-সাধক ভিন্ন আর কিছুই বলিবে না; নতুবা ভারতচন্দ্রের ন্যায় একজন প্রবীণ পণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি কখন প্রাতঃস্মরণীয় রাজ-পরিবারের অযথা কলঙ্ক ঘোষণা করিতে পারেন?

ভজহরি। তবে "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য এরূপ ভাবে লিখিত হইল কেন?

রামপ্রসাদ। ভারতীর বরপুত্র ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" একখানি অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য-পূর্ণ মহাকাব্য। ইহাতে ছন্দ, অলঙ্কার এবং ভাষার পারিপাট্য কবি যেরূপ দেখাইয়াছেন—বোধ হয়, আজিকার দিনে আর কেহ সেরূপ পারিবে না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহাকে একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইবে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন উহা পাঠ করিলেন, তখন ভারতচন্দ্রকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া পরিশেষে বলিলেন—"ভারতচন্দ্র! তুমি যে মহাপণ্ডিত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; তবে তুমি আদি-রসের কিছুই জান না। ভারতচন্দ্র হাসিতে লাগিলেন এবং ভিতরে ভিতরে মহারাজের এই উক্তির বিরুদ্ধে "বিদ্যাসুন্দর" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উক্ত গ্রন্থ সমাপন হইলে, একদিন হস্ত লিখিত সেই পাণ্ডুলিপিখানি একখানি বৃহৎ স্বর্ণথালে রক্ষা করিয়া তদীয় কন্যার দ্বারা মহারাজের নিকট উপহার পাঠাইয়া দিলেন।

ভজহরি। ইহার কারণ কি, স্বর্ণথালে করিয়া পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠান হইল কেন?

রামপ্রসাদ। পাঠাইবার কারণ তিনি কন্যাকে বলিয়া দিলেন, মা? যদি রাজা জিজ্ঞাসা করেন যে—ইহা থালে করিয়া আনিলে কেন? তাহা হইলে তুমি বলিও—"মহারাজ! ইহা রসে ভরা, পাছে গায়ে পড়ে—এই জন্য পাত্রে করিয়া সাবধানে আনিয়াছি।"

কন্যা রাজ-সদনে উপস্থিত হইলে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে কোলে করিয়া নিকটে বসাইলেন। পণ্ডিত-প্রদত্ত উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! বইখানি হাতে করিয়াই ত আনিতে পারিতে, তবে থালায় করিয়া আনিলে কেন?" কন্যা পিতার কথামত রাজাকে বুঝাইয়া দিল। মহারাজ হাস্য করিতে করিতে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া বালিকাকে বিদায় করিলেন এবং উহা পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন, বুঝিতে

পারিলেন—সেদিনকার কথার প্রতিশোধ দিবার জন্যই ভারতচন্দ্র এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, লেখা সার্থক হইয়াছে, এরূপ আদিরসাত্মক কাব্য এখন আর যে কেহ লিখিতে পারিবে—তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। ইহাতে বাহ্যিক যেরূপ আদি রসের ছড়াছড়ি, ভিতরে তদ্রূপ সাধন-ভজনের গুপ্ত প্রণালী লিপিবদ্ধ, ধন্য ভারতচন্দ্র! মহারাজ সেইদিন ভারতচন্দ্রকে ডাকিয়া আপনার অর্ব্বাচীনতার কথা স্বীকার করিলেন এবং মুক্ত-কণ্ঠে বলিলেন—"ভারতচন্দ্র! আজ বুঝিলাম—তুমি আদিরস-রসিক মহাভাবুক। আমার বুঝিবার ভুল হইয়াছিল। সেই দিন হইতে মহারাজ তাঁহাকে আদর করিয়া "রসরাজ" বলিয়া ডাকিতেন। ভাই ভজহরি! ইহা যদি বর্দ্ধমান রাজবাটীর কেলেঙ্কারী হইবে, তাহা হইলে পরম ধার্ম্মিক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি তাহার অনুমোদন করিতে পারেন? আর এক কথা—বর্দ্ধমান রাজবংশের ইতিহাসে "বীরসিংহ রায়" বলিয়া কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। এ সকল নাম-ধাম কবির স্বকপোল-কল্পনা-প্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভজহরি। তবে বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি তুমি কিরূপ বিবেচনা কর, ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তোমার মত কি?

রামপ্রসাদ। আমার বিবেচনায় সুন্দর একজন মহা-সাধক, মহাবিদ্যার সাধনা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তান্ত্রিক সাধনার চূড়ান্ত বিষয় কবি আদিরসাত্মক কাব্যের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত করিয়াছেন।

ভজহরি। ভাই! আমিত সাধন-ভজনের বিষয় কিছু বুঝি না। তুমি অনুগ্রহ করিয়া দুই একটী বিষয় বুঝাইয়া আমার সংশয় অপনোদন কর।

রামপ্রসাদ। তুমি উহার হস্তলিপি পড়িয়াছ কি? যদি না পড়িয়া থাক, তবে ইহার সম্বন্ধে দুই একটি বিষয় বলি।

ভজহরি। হাঁ, মহারাজ যখন তোমাকে উহা দেখিতে দিয়াছিলেন, তখন আমি একবার উহার কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম; কিন্তু তুমি যেরূপ বলিতেছ, উহা পাঠে আমি তাহার সেরূপ ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

রামপ্রসাদ। দেখ, উহার প্রথমেই আছে—"কাঞ্চিপুর বর্দ্ধমান ছয়মাসের পথ, ছয়দণ্ডে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ"। ইহার অর্থ কি? ছয়মাসের পথ ছয় দণ্ডে যাইতে পারা যায়—অধুনা, এমন কোন যান সৃষ্ট হইয়াছে কি?

ভজহরি। না না—তা কেমন করিয়া হইতে পারে, ইহা অসম্ভব।

রামপ্রসাদ। সাধকের নিকট অসম্ভব কিছুই নাই, প্রাণায়াম সিদ্ধ সাধক অনায়াসেই ছয়মাসের পথ ছয়দণ্ডে যাইতে পারেন—বায়ুর অগ্রেও তাঁহাদের

গতি। এইজন্য বলিয়াছেন—অশ্ব "মনোরথ" মনোরূপী অশ্ব—মনের গতি বায়ব অগ্রে, সাধক কুম্ভকযোগে "মনোরথে" চড়িয়া আসিয়াছিলেন।

ভজহরি। বাস্তবিক, আহা! কবির কল্পনাকে ধন্য! তারপর ভাই?

রামপ্রসাদ। ভাই? তান্ত্রিক সাধনার সমস্ত বিষয় অতি গুহ্য, সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। যে সকল প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতি নাই—সেই সকল কথায় বলিব।

ভজহরি। আচ্ছা ভাই, তাই বল।

রামপ্রসাদ। দেখ! সুন্দর রাজপুত্র, বৰ্দ্ধমানে যখন আসিলেন—তখন মালিনীর কুটিরে রহিলেন কেন? রাজপুত্র কখন কুটিরে থাকিতে পারেন না—তত কষ্ট তাঁহার সহ্য হয় কি? তথায় থাকিবার কারণ সতন্ত্র।

ভজহরি। স্বতন্ত্র কি, মালিনীর রাজবাটীতে গতিবিধি ছিল, তাহার সহিত আলাপ করিলে, সত্বর কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এই অভিপ্রায়েই বোধ হয়, তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ। তাহা কি ঠিক, অভিসন্ধি যদি খারাপই হয়, তাহা হইলে ভাল একস্থানে জাঁকজমকের সহিত বাসা লইয়া, গোপনে মালিনীকে হস্তগত করিলেই হইত। অত কষ্ট সহ্য করিয়া, সেই সামান্য জীর্ণ কুটিরে কি সুন্দর হেন বিশিষ্ট রাজপুত্রের থাকিবার স্থান হইতে পারে?

ভজহরি। তবে কি ভাই, তিনি কেন ওরূপ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ। তান্ত্রিক সাধনার—পঞ্চমকার সাধনপদ্ধতিতে যে পাঁচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের আবশ্যক হয়, মালিনী তাদের মধ্যে একজন। অতিরিক্ত সহিষ্ণু না হইলে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না, এইজন্য সাধক প্রাণপণ কষ্ট স্বীকার করিয়া মালিনীর বাটীতেই ছিলেন।

ভজহরি। ধন্য কবির কবিত্ব, আর ধন্য সাধকের সাধনানুরাগ, তারপর ভাই!

রামপ্রসাদ। ভাই! আর বেশী অগ্রসর হওয়া যায় না—সাধক ভিন্ন অন্য কেহ সে ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবে না, বৃথা তন্ত্রশাস্ত্রের মহিমা নষ্ট হইবে, আর কাজ নাই, রজনীও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, ইহাতেই অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে—আর না, তবে এই মাত্র বুঝিয়া দেখ,—যে সুন্দর ব্যভিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল, চরিত্র-হীনতার অতলতলে ডুবিল, যাহার পাপাচরণের কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়, সেই পাপিষ্ঠ যখন শ্মশানে নীত হইল, মহারাজের আদেশে যখন জহ্লাদগণ কর্ত্তৃক খড়্গাঘাতে বিনষ্ট হইতে চলিল—সেই সময় বরাভয়দায়িনী মা আমার পুত্রশোকে উন্মাদিনীর ন্যায় আলুথালুকেশে, বিগলিত

বেশে, দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন কেন, ত্রিলোকেশ্বরী বিশ্বজননীর প্রকোপ কটাক্ষে, জহ্লাদের প্রাণ চমকিত হইল কেন, তাহারা পলায়ন করিয়া রাজসদনে গমন করিল কেন? শেষে মা আমার সুন্দরকে কোলে করিয়া কালভয়নিবারণী মূর্ত্তিতে শ্মশানের আসন সমুজ্জ্বল করিলেন কেন, আর রাজা তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াই বা কেন শেষে আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সেই পাপীকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিলেন? যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কত যুগযুগান্তর ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন, তেত্রিশকোটী দেবতা যাঁহার করুণা-কণা লাভের জন্য লালায়িত, একজন মহাপাপী পাষণ্ড, অকথ্য পাপ সঞ্চয় করিয়া তাহা অনায়াসে লাভ করিল—ইহা কি সম্ভব। অতএব ইহা সাধনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। "চোর পঞ্চাশতের" প্রত্যেক শ্লোকের কতপ্রকার অর্থ সম্বলিত করিয়া কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাহা বুঝিয়াছ কি? অতএব ভারতচন্দ্র কর্তৃক "বিদ্যাসুন্দর" বর্দ্ধমান রাজভবনের কুৎসা—এ ভ্রান্তিমূলক ধারণা কখনও মনোমধ্যে স্থান দিও না। প্রাতঃস্মরণীয় বর্দ্ধমান রাজবংশ মহা ধার্ম্মিক এবং দাতার বংশ এবং সে বংশে যাবতীয় পুণ্যাত্মারই জন্ম। তথায় বিদ্যার ন্যায় পাপিষ্ঠার স্থিতি অসম্ভব।

ভজহরি আর কোন কথা বলিতে পারিল না। এতদিন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর * বিষয়ে সে যে অমূলক ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল—এতদিন পরে সাধক রামপ্রসাদ কর্ত্তৃক তাহার মূলোচ্ছেদ হইল। ভজহরি মাতৃপদে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে শয়ন করিল। তৎপরে আমাদের মাতৃপ্রাণ সাধক রামপ্রসাদ মাতৃ-আরাধনায় রত হইল।

* বিদ্যাসুন্দর কোন বঙ্গীয় কবির নিজস্ব সম্পত্তি নহে। সংস্কৃত ভাষায় বররুচিই ইহা প্রথম প্রণয়ন করেন, তৎপরে শ্রীকবিবল্লভ "কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর" নাম দিয়া গৌড়ীয় ভাষায় ইহা প্রকাশ করেন, তৎপর বঙ্গভাষায় শ্রীপ্রাণরাম চক্রবর্ত্তী ও রামপ্রসাদ ইহা প্রকাশ করেন, সর্ব্বশেষে ভারতচন্দ্র স্বকবিত্বে গ্রথিত করেন। ইহাতেই বুঝা যায় রামপ্রসাদের ন্যায় মাতৃভক্ত সাধক যখন ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন ইহা কেবল কুৎসিত ব্যভিচার পূর্ণ নায়ক নায়িকার প্রেম নহে। যাহারা ইহাকে সামান্য বিষয় বলিয়া ধারণা করে, তাহারা ইহার কিছুই বুঝে না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দীপান্বিতা অমাবস্যা

বৎসরান্তে আবার সেই দীপান্বিতা উপস্থিত। মহাকাল-হৃদাবাসা মহাকালীর পূজা-আয়োজন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া আজ সাধকের হৃদয় আনন্দোদ্বেলিত। প্রথম যে দিন আমাদের সিদ্ধি-সাধক রামপ্রসাদের প্রস্ফুটিত হৃদয়পদ্মে মাতৃশক্তির জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, সাধক যে দিন কৃপাময়ীর কৃপালাভ করিয়া মানবজীবন ধন্য করিয়াছিলেন, আজ আবার সেই দিন সমাগত, কয়েক বৎসর ধরিয়া এইদিনে সুনিপুণ সাধক স্বহস্তে চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ীমূর্ত্তি গড়িয়া, তাঁহার সিদ্ধাসনে প্রগাঢ় বিশ্বাসভরে, ভক্তিপ্রাবল্যে মাতৃচরণে নিজের প্রাণাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। রামপ্রসাদ শ্যামা-মূর্ত্তি গঠনে সাতিশয় সুনিপুণ ছিলেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানবান হইয়াও শ্যামা-পূজার দিন স্বহস্তে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, ইহাতে তিনি যে কিরূপ অব্যক্ত আনন্দলাভ করিতেন, তাহা যখন তিনি নিজেই প্রকাশ করিতে পারিতেন না, তখন আমার ন্যায় নগণ্য লেখকের সে বিষয় বর্ণনা করিবার সাধ্য কোথায়।

এ দিন রামপ্রসাদের সংসারেও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকটিত হইত। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এমন কি ভজহরি পর্য্যন্ত কি যে এক অভাবনীয় আনন্দ-মদিরা পানে বিভোর হইত—তাহা না দেখিলে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সর্ব্বাণীর ত কথাই নাই—স্বামীর ন্যায় তিনিও আজ ভাবে বিভোর, শ্যামার প্রেমতরঙ্গে আত্মহারা, আহার নিদ্রা এ দুইদিন তাঁহার মনে থাকত না, স্বর্গীয় আনন্দ-সুধাপানে তিনি যেন সদাই প্রমত্ত, জ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরী বিবাহিত হইলেও, এই পূজার সময় পরমানন্দ উপভোগ করিয়া প্রাণ সুশীতল করিতে তিনি স্বামীর সহিত পিতৃভবনে আগমন করিতেন। রামদুলাল, তদীয় পত্নী, কনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরী, কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন পর্য্যন্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়া আত্মহারা হইত। সাধন-ভজনের মহিমা না বুঝিলেও পবিত্র ঔরসে জন্মহেতু অতি ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণের প্রাণেও ভক্তিভাব উপস্থিত হইত, তাহারাও মা মা রবে আত্মহারা হইয়া পিতামাতার ন্যায় আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইত। পবিত্র সাধক-বংশের পুত্রকন্যাগণের এ ভাব যে জন্মার্জ্জিত—তাহার আর বিচিত্র কি? আর প্রসাদের ত কথাই নাই—যিনি সদাই মাতৃপ্রেমে উন্মত্ত, বিষয় বাসনা বিমুখ, এ শুভদিনে তাঁহার যে কিরূপ ভাব, পাঠক তাহা জ্ঞানচক্ষে নিজে নিজেই দর্শন করুন

—আমার বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। রামপ্রসাদ প্রাতঃকাল হইতেই তাঁহার বাগানে সেই সিদ্ধাসনে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত; উত্তর-সাধক ভজহরি মহাত্মা রামপ্রসাদের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে তাঁহারই মাতৃপূজার আয়োজনে সাহায্য করিতেছে। তাহারও আজ ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, যে নামে জীবের সকল ভাবনা তিরোহিত হয়, ভবক্ষুধা দূরে যায়—তাঁহার পূজার সময় কি সামান্য ক্ষুধাতৃষ্ণার ভাবনা আসিতে পারে?

আজ প্রাতঃকাল প্রতিমা গড়িবার সময় হইতেই প্রসাদের মন ভাব-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে, মাতাল যেমন মদ খাইয়া অনবরত টলমল করে, হেলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, ভাবোন্মত্ত প্রসাদ মাতালও আজ সেইরূপ, তাহার উপর প্রাণের ভাব-তরঙ্গে আজ অজস্র সঙ্গীত কুসুম ফুটিয়া উঠিতেছে; সিদ্ধাসনের গগন-পবনও সেই পবিত্রাদপি পবিত্র সঙ্গীতে পরম বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া চারিদিক পবিত্র করিতেছে, রামপ্রসাদ স্বহস্তনির্ম্মিত প্রতিমার প্রতি চাহিয়া ভাবমগ্ন হইয়া গাহিলেন,—

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মাসনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদাযোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে পটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন॥
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন॥

মা! ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, তুমি কেমন এবং কত বড়, কি রূপের রূপসী, ষড়দর্শনে যখন তাহার মীমাংসা করিতে পারে না, তখন আমি কোন্ ছার যে তোমার সেরূপের বর্ণনা করি বা সে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি। ভগবান্ শঙ্করই যখন বলিতে পারেন না—তুমি কিরূপ, তোমার আকৃতি প্রকৃতি কি প্রকারের, তখন আমি কি বলিব? আমি এইরূপ মূর্ত্তি পূজা করিয়া সন্তরণে সিন্ধুপারের আশা করিয়াছি বলিয়া যত পণ্ডিত লোকে হাসিয়া কত কথা বলে, কিন্তু মা! আমার প্রাণ বুঝিলেও মন বুঝে না সে অন্তরে বাহিরে এইরূপ দেখিতে চায়, কিন্তু তুমি ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় নাই? তবে মূর্ত্তি পূজা ক'র্‌লে যে তোমার পূজা

করা হয় না, তাহা কে বলিল—ইচ্ছাময়ী তুমি, ইচ্ছা করিয়া ঘটে পটে বিরাজ কর, আবার যোগীগণের হৃদয়পদ্ম-বনে শিবশক্তিরূপে রমণ করিয়া থাক, মা তোমার তত্ত্ব পাওয়া ভার।

ক্রমে বেলা অপরাহ্ন হইল, তথাপি প্রসাদ সেইরূপ তন্ময়; কাহারও সহিত কথা নাই, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত নাই, যেন তিনি এই রাজ্যের লোক নহেন; যেন অন্য কোন পররাজ্যে আপনমনে উন্মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছেন, যখন চাহিয়া আছেন, একদৃষ্টে একদিকেই চাহিয়া আছেন, চক্ষের পলক পড়ে না, যেমন কোন হৃত-বস্তু প্রাপ্ত হইলে, লোকে একান্ত আগ্রহের সহিত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকে—এ চাহনীও সেইরূপ ভাবের। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখনও সেই ভাব। কয়েকটী দ্রব্যের অনটন হইয়াছে, ভজহরি একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু এ অবস্থায় জিজ্ঞাসা করায় না করায় সমান, তখন তাঁহার ত বাহ্যজ্ঞান নাই। ভজহরি মনে মনে ভাবিতেছেন—এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকের আর এ সকল বাহিক পূজা করা কেন? সমস্ত দিনই যখন মাতৃদর্শন হইতেছে, কখন বাহ্যিক বিষয়ে এত আড়ম্বরের আবশ্যকতা কি? পুত্রকন্যাগণের এবং সাধারণ লোকের শিক্ষা হেতুই বুঝি, এইরূপ করিয়া থাকেন। এইবার প্রসাদ পুনরায় গাহিলেন,—

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ ॥
হরিহরি ধনমদ, ভাব পদ কোকনদ,
কালের নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ।
কালী কৃপাময়ী নাম পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক।
শ্রীরামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা, ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই ক'রে, করে হাঁক ॥

প্রসাদের এইবার একটু চৈতন্য হইয়াছে। আমি থাকিতে দুই একটী দ্রব্যের অভাব থাকিবে কেন এইবার বলি বলি করিয়া ভজহরি বলিলেন—"ভাই! এইবার ত পয়সার আবশ্যক, তুমি বল, সাধন ভজনে আবার পয়সার দরকার কি? ধূপ ধূনা নাই যে, রাত্রে পাওয়া ত সঙ্কট।"

রামপ্রসাদ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভাই! সময় আগত-প্রায়, একবার বাটীতে দেখিয়া আইস, ধূপ ধূনা পাওয়া যায় কি না, যদি না পাওয়া

যায়, তাহাতে আর ক্ষতিই বা কি ; ইহার আবশ্যক অতি সামান্য, যদি একান্ত নাই পাও—তাহাতে কি পূজা হইবে না ?"

ভজহরি আর কিছু বলিল না—ধূপ ধুনা আয়োজনের জন্য গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। রামপ্রসাদ ভজহরির মুখে ধনের আবশ্যক শুনিয়া গাহিলেন :—

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদ্‌ছে গো তোর ধন বিহনে ॥
সামান্য ধন দিবি মা তারা, প'ড়ে রবে ঘরের কোণে,
যদি দিস্ মা তোর ঐ অভয় পদ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে।
গুরু আমায় কৃপা ক'রে মা, যে ধন দিলেন কাণে কাণে,
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র মা, তাও হারালেম সাধন বিনে।
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, ক'র্‌বে তোমার নিজগুণে,
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা ব'লে স্থান পাই যেন ঐ চরণে ॥

সঙ্গীত শেষ হইতে না হইতে ভজহরি ধূপ ধুনা লইয়া উপস্থিত হইল এবং সময় সন্নিকট দেখিয়া সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিল। ভক্তবীর প্রসাদ মাতৃপূজায় উপবেশন করিলেন।

আজিকার এ পূজা সকামভাবে অনুষ্ঠেয়, নিজের জন্য ত বটেই, পরিবার-পরিজনের জন্যও বটে, তাই এ পূজায় কামনা-বাসনা আছে, আসন-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি আছে, আর আছে মন-মন্ত্র-মূর্ত্তি, এই ম-কার-ত্রয় লইয়াই আজ পূজার আয়োজন হইয়াছে, ইহাব দ্বারা সাধক প্রাণ দিয়া প্রতিমায় মায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করত উদ্বোধন করিবেন, চৈতন্যরূপিণী মা আমার সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ত সদাই ক্ষিপ্রহস্ত, সদাই হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন—ভক্ত কখন কি চায়। তথাপি এ জড় আবরণের মধ্য দিয়া সাধক তাঁহার মহিমাচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিতে চায় বলিয়াই—আজ দীপান্বিতার অমাবস্যায় সাধকের এ আমন্ত্রণ-আবাহন।

মনকে সরল ও ভক্তিযুক্ত করিবার জন্যই মন্ত্রের প্রয়োজন, মন্ত্রের অর্থ ভাল করিয়া বোধগম্য হইলে মন সহজেই ভক্তিযুক্ত হয় ; মন্ত্রের দ্বারা ভক্তিময় মনকে প্রাণের সহিত সংযুক্ত করিয়া মূর্ত্তি সংলগ্ন করিতে পারিলেই প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা উত্তমরূপে সমাহিত হয়—এইরূপে দেবীর আরাধনা করিতে পারিলেই প্রতিমা-পূজা সার্থক। সেই প্রাণযুক্ত মূর্ত্তি সাধকের সকল পূজার সফলতা প্রদানে সমর্থ, নতুবা শুধু খড়মাটীর মূর্ত্তি কি কাহারও উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয় ? সোরা, গন্ধক, কয়লা এই তিনটী স্বতন্ত্র থাকিলে যেমন কোনও শক্তি সমন্বিত

হইতে পারে না; ইহা একত্র সংযোজিত হইলে যেমন অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন বারুদ প্রস্তুত হয়, সেইরূপ মন, মন্ত্র ও মূর্ত্তি একত্র সমন্বয় করিয়া শক্তিমন্ত হইতে পারিলে, সাধক সাধনপথ প্রস্তুত করিতে পারে। তার পর সাধনা দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে চিন্তাশক্তির সাহায্যে যত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে—যত বেশীক্ষণ ধারণা করিয়া সমাধিস্থ থাকিতে পারিবে, ততই সাধ্য বস্তুর সন্নিকট হইতে পারিবে। প্রসাদ প্রথমতঃ অর্ঘ্যাদি প্রদান করিয়া মন, মন্ত্র ও মূর্ত্তির সমন্বয় করত মায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন, ভজহরি প্রদীপ জ্বালিয়া দিল, ধূনা গুগ্‌গুলের গন্ধে সাধন-স্থল পরিপ্লুত করিল। তৎপর সাধক দক্ষিণা কালিকাকে ধ্যানে ধারণা করিবার জন্য মন্ত্র পাঠ করিলেন :—

করাল-বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতা॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকাং।
মহামেঘ-প্রভ ং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী—গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাং।
কর্ণাবতংসতানীত—শব যুগ্ম ভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হর্ষন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারাবিস্ফুরিতাননাং।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাং।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াং।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাং।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং।
মুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাং॥

ধ্যান সমাপ্ত করিয়া সাধক বলিলেন—"মন! আর কেন, এইবার সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জননীর প্রেমনীরে অবগাহন কর, তোমার ত্রিতাপতপ্ত দেহ সুশীতল করিতে হইলে এমন শান্তিবারি আর কোথাও পাইবে না; এ জলে ডুবিলে, পার্থিব জলে ডুবিবার ন্যায় মৃত্যু হইবে না বরং নব জীবন লাভ

করিয়া ধন্ত হইবে। ভাই! বহুদিন আশা করিয়া বসিয়া আছি—আমার এ আশায় ছাই দিও না, এ সাধে বাদ সাধিও না।" এই বলিয়া গাহিলেন :—

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্ত কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনী-কূলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে শিবযুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক হল্‌দী গায় মেখে যাও, ছুঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত প'ড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে মিল্‌বে রতন পলে পলে॥

তখনও মনের উপর রামপ্রসাদের কর্তৃত্ব আসে নাই; মন তখনও একটু উড়্ উড়্ করিতেছে দেখিয়া বিনতি সহকারে বলিলেন :—

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি.
ওরে জান নাকি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি,
ও রে পড় বাবা আত্মা রাম আত্মজনের কর গতি॥
উড়ে, উড়ে, বেড়ে, বেড়ে, বেড়িয়া কেন বেড়াও ক্ষিতি,
ও রে গাছের ফলে ক'দিন চলে, কররে চার ফলের স্থিতি।
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন শুন যুক্তি,
ও রে বসে মূলে কালী বলে, গাছ নাড়া দাও নিতি নিতি॥

মরি মরি গানের কি গভীরতা, মনের প্রতি সাধকের কি উপদেশ কুশলতা, শুনিলে পাষাণের মন পর্য্যন্ত নত হয়, মনের মন ত কত নরম—বশ না হইবে কেন? এইবার প্রসাদ মনে প্রাণে প্রাণায়াম যোগ করিয়া জপ আরম্ভ করিলেন, তারপর সরল মনকে শক্তিমন্ত করিয়া সহস্রার পদ্মস্থিত শিবশক্তির চরণ তলে উপস্থিত করিয়া সুধাপানানন্দে সমাধিস্থ হইলেন। বাহ্যজ্ঞান নাই, বাহ্য চৈতন্ত নাই, ডাকিলে আর সাড়া পাওয়া যায় না, যেন মৃত দেহ, ভজহরি প্রসাদের এই ভাব দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। অপরাপর সময়ে রামপ্রসাদ

ভজহরিকে সাধনার সময় কাছে রাখিতেন না, কিন্তু তাহার মন্ত্র গ্রহণ হওয় অবধি, মন্ত্রে তাহার মনঃসংযোগ হইয়াছে দেখিয়া এখন হইতে প্রায় তাহাকে কাছে কাছে রাখিতেন তবে যে দিন দেবীর সাক্ষাৎকারের আশা করিতেন—সে দিন বলিয়া দিতেন। আজ মানস নয়নে দেখা, মনে প্রাণে মায়ের সহিত কথা কাজেই ভজহরির আজ তথায় থাকিতে নিষেধ নাই। ভজহরিও জপে বসিয়াছিল, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণ, কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিল না, তাই অবাক হইয়া প্রসাদের ভাব দেখিয়া কখন কাঁদিতেছে, কখন হাসিতেছে, আবার কখন বলিতেছে—"মা! দাসের প্রতি কি প্রসন্ন হইবে না; আমার কি কখন এ শুভ-সংযোগ হইবে না? কিন্তু মা, আমিও ছাড়িবার পাত্র নই, যখন প্রসাদ হেন বন্ধু পাইয়াছি, তখন একটা হেস্ত নেস্ত করিবই করিব।" এই বলিয় মনকে আশান্বিত করিতে লাগিল।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ—যখন প্রকৃতি সম্মোহন মন্ত্রে বিমোহিত, দীপান্বিতার দুর্ভেদ্য অন্ধকার যখন প্রকৃতির ভীষণতা বৃদ্ধি করিয়া মানব-মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিতেছে, যে সময় সাধারণ জীবজগতে কেহই জাগরিত নাই,—ঘুমঘোরে গতচেতন হইয়া শয্যা-পৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত আছে। সে সময় জাগ্রত কেবল সেই, যাহার অন্তর জাগতিক ভয়ে পলায়ন করিয়াছে, সেই নির্ভীক-চিত্ত, মাতৃভক্ত সাধকই এই ভীষণ সময়ে একাকী জাগ্রত; মায়ের প্রতি যার অটল, অচল বিশ্বাস, মা ভিন্ন যে জগতে আর কিছু চায় না—আর কিছু জানে না, সেই এই ভয়ানক সময়ে মাতৃদর্শন-লোলুপ হইয়া জাগ্রত। রামপ্রসাদ প্রায় দুই তিন ঘণ্টা সমাধিস্থ হইবার পর ধীরে ধীরে বাহ্য-চৈতন্য লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি আজ ধ্যানে যেন সেই সত্যযুগের শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। আজ যেন জগৎ-পালিকা কালিকা সংহারিণী মূর্ত্তি ধরিয়া, উন্মত্তা উলঙ্গিনীবেশে দৈত্য-সমরে অবতীর্ণা। কিন্তু তথাপি ভক্তের আহ্বান ত তাঁহার ঠেলিবার ক্ষমতা নাই, তাই আসবপানোন্মত্তা, রণরঙ্গিণী মা আমার টলিতে টলিতে, বীরপদভরে মেদিনী কম্পিত করিতে করিতে, বীরভক্ত প্রসাদের নিকট আসিয়াছেন, সমাধি অপসারিত হইবার পর বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তিনি মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন;—উলঙ্গিনী মা, তাহাকে কোলে পাইয়া যেন বিহ্বল ভাবে নৃত্যপরা, সঙ্গিনী ভৈরবীগণও নাচিতেছেন; ভাব দেখিয়া প্রসাদ গাহিলেন;—

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে,
ললিত চিকুর আসব-আবেশে।

বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ-গরাসে।
(কেরে) কালী শরীর রুধিরে ভাসে।
(যেন) কালিন্দীর জলে কিংশুক হাসে।
কেরে নীলকমল শ্রীমুখকমল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে।
কেরে নীলকান্ত, মণি নিতান্ত, নখর-নিকর তিমির নাশে।
কেরে রূপের ছটায়, তড়িৎ ঘনঘোর রব উঠে আকাশে,
দিতিসুতচয় সবার হৃদয় থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
মাগো কোপ কর দূর, চল নিজপুর, নিবেদি শ্রীরামপ্রসাদ দাসে। *

মা ! ত্রিদিবেশ্বরি ! স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল যাঁর নখদর্পণে ; যিনি এই ত্রিলোকের দুঃখ-সুখ-বিধাত্রী, তাঁর এমন বেশ কেন মা। কেন আসব-আবেশে লেংটা হ'য়ে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াও মা, কুবের যাঁর ভাণ্ডারী, তাঁর আবার বসন ভূষণের অভাব কি। তবে মা তুমি দিগম্বরী কেন, আমরা সব ছেলেপিলে রয়েছি—আমাদের কাছে উলঙ্গিনী কেন জননী! রামপ্রসাদ মাকে লেংটা থাকিতে দিবেন না, তাই বসন পরাইবার ছলে গাহিলেন,—

মা বসন পর

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি গো।
কালীঘাটের কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী গোকুলে গোপিনী গো।
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী,
কত দেবতা ক'রেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো।
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মা গো কে ক'রেছে পূজা,
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত জবা গো।
ডানি হাতে বরাভয়, মাগো বামহস্তে অসি,
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড ক'রেছো রাশি রাশি গো।
অসিতে রুধির ধারা মাগো, গলে মুণ্ডমালা,
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা গো।
মাথায় সোণার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।

---

* রামকেলি—আড়া।

মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে,
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো।*

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আজ প্রসাদের পূজা সকাম, তাই তিনি আজ চন্দন চর্চ্চিত জবাফুলে মায়ের পূজায় রত, পূজা সকাম হইলেও প্রসাদের অন্তরের ভাব অতি গভীর, সে ভাব সাধারণ মানবের হৃদয় ধারণা করিতে পারে না। আজ লৌকিক আচারে, স্ত্রী পুত্র পরিবারের মঙ্গলোদ্দেশে পূজা, কাজেই সকাম হইবেই, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন সাধকের পক্ষে নিষ্কাম পূজাই বিহিত, তিনি বাহ্যিক কোন বিষয়ে ত আস্থাবান নহেন, বাহ্যিক কোনও বস্তুতে ত মায়ের মনস্তুষ্টি করিতে তাহার প্রাণ চায় না? তাই অন্তর লইয়া, অন্তরের যাবতীয় মনোময় ভাব লইয়া ব্রহ্মভাবের ভাবুক সাধকশ্রেষ্ঠগণ ব্রহ্মময়ীর মানস পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু সাধারণের নিকট সে কেমন করিয়া চলিবে? তাই প্রসাদ আজ সকাম ভাবে পাদ্য, অর্ঘ্য, ফল, পুষ্প, নৈবেদ্য, বসন, ভূষণ প্রভৃতি দিয়া মায়ের পূজা করিলেন। এইজন্য এই পূজায় সাধক মায়ের নিকট তাঁহার হিতার্থে আয়ুঃ, যশ, মান, ধনজন, পুত্র, সুখশান্তি আরোগ্য প্রভৃতি কামনা করিলেন। ব্রহ্মময়ীর নিকট এরূপ কামনা আমাদের পক্ষে নিন্দনীয় নহে, অকৃতী অধম আমরা, দীন হীন দরিদ্র আমরা, রোগ-শোকে ক্লিষ্ট আমরা, বিশ্বেশ্বরীর নিকট প্রার্থনা না করিলে দিবে কে, আর পাইবই বা কোথায়? মা দিলে ফুরাইবে না, আর লোকে দিলে কুলাইবে না, তবে মার নিকট আমি চাহিব না কেন? প্রসাদ আজ কেবল নিজের জন্য নহে, পুত্র পরিজনদেরও জন্য দীপান্বিতা অমানিশায় সকাম ভাবে দেবীর পূজায় বসিয়াছেন।

গৃহেও পূজার আয়োজন হইয়াছে, সর্ব্বাণী তথায় পুত্রকে লইয়া পুরোহিতের দ্বারা পূজায় ব্রতি হইয়াছেন, সে পূজারও খুব ঘটা। রামপ্রসাদ যদিও আজ নিজ পূজার জন্য সিদ্ধাসনে আসিয়াছেন, কিন্তু বাটীর সেই সকাম পূজার কথা অহরহঃ তাঁহার মনে জাগিতেছে বলিয়া আজ সকাম ভাবেই আরাধনা করিতেছেন। ব্রহ্ম নিরাকার কিন্তু মানব নয়নের গোচরীভূত হইতে হইলে তাঁহাকে সাকার-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেই হইবে—নতুবা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় কই, তাহার জড়চক্ষুর দর্শন সাধ মিটে কই, কাজেই মূর্ত্তি পূজার আবশ্যক এবং তাহাও সকামভাবে করিতে হইবে। সকামভাবে মূর্ত্তি-পূজা সামান্যাধিকারীর পক্ষে হইলেও মহাত্মা সাধকগণ সময়ে সময়ে সাধারণের হিতার্থে এরূপ

* লজ্জা—আড়া ঘোমটা।

পূজারও অনুষ্ঠান করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রভূত আনন্দ লাভ হইত। বৈদ্য হইয়া লোকালয়ে বা নিজের গৃহে তিনি স্বহস্তে কখন দেবীর পূজা করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করা হয় এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়, এ সকল কার্য্য সমাজ-বিরুদ্ধ এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এইজন্য পুরোহিতের দ্বারা তিনি গৃহের পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিজের তৃপ্তি সাধনের জন্য আপন সিদ্ধাসনে আসিয়া মায়ের ছেলে মায়ের দর্শন লাভ করিলেন; প্রসাদের অন্তর কখন আনন্দময়ী শূন্য থাকিত না, তথাপি তিনি ইচ্ছা হইলেই এরূপভাবে আপন সিদ্ধাসনে পূজার আয়োজন করিতেন, ইহা তাঁহার খেয়ালের মধ্যে পরিগণিত হইত। এজগতে মাতৃসেবা ভিন্ন আর তাঁহার অন্য কাজ ছিল না, এইজন্য তিনি ত সর্ব্বদাই গাহিতেন :—

ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ ক'রে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শোন কর্ণপটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুহলে প্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে। *

যাঁহার হৃদয়ে এইরূপ গভীর ভাব, তাঁহার নিকট সাকার-নিরাকার কি, আর সকাম-নিষ্কামই বা কি? সংসারের মধ্যে বাস করিয়া যিনি এইরূপভাবে সাধন ভজন ক'র্ত্তে পারেন—তিনি বীরসাধক। বোঝা ঘাড়ে ক'রে যদি অপর কাজ কর্ত্তে পার, স্ত্রী পুত্র সংসার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে যদি হংসের জলমিশ্রিত দুগ্ধের মধ্য হইতে সার গ্রহণের মত সেই সারাৎসারকে বাছিয়া লইতে পার, তবেই না তুমি যথার্থ সাধক—সাধনায় তুমি দৃঢ় চিত্ত হইয়াছ! নতুবা যথায় কোন প্রলোভন নাই, কোন আসার বস্তু নাই, সেখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা আর বেশী কথা কি? তুমি সংসারে থাক—সংসারের কাজকর্ম্ম কর কিন্তু সংসারভাব যেন তোমাতে না থাকে, যেমন জলে নৌকা থাকুক কিন্তু জল যেন নৌকায় না প্রবেশ ক'র্ত্তে পারে, তাহা হইলে আর ডুবিবার ভাবনা থাকবে না। শ্রীরাম প্রসাদ এইভাবে সংসার ক'র্ত্তেন, কাজেই তাঁহার পতন হইত না, এরূপ ভাবে সাকার নিরাকার বা সকাম-নিষ্কামে যায় আসে কি? "ভাব যার হৃদয়ে জাগে,

* পিলু বাহার—যৎ

কি ক'রবে তার সংসার ভোগে। ভাবে হৃদয় ভরপুর থাকিলে, সংসারের কাজ-কর্ম্মে থাক, আর যে কোন ভাবেই ব্যস্ত থাক, তখন সে সমস্ত কাজ মায়ের কাজ বলিয়া, মা-ময় ভাবে তাহা সমাধা করে কাজেই গায়ে কাদা না মাখিয়া মাছ ধরিতে পারে, পাঁকাল মাছের মত পাঁকের মধ্যে থাকিয়াও সে পাঁক মাখে না, প্রসাদ সেইরূপেই সংসার করিতেন, যখন যেরূপভাবে ইচ্ছা তিনি ভবানীর ভজনা করিতেন। সিদ্ধাসনের পূজা রজনীযোগের তৃতীয় প্রহর মধ্যে সমাপ্ত করিয়া প্রসাদ শেষ যামে বাটি গমন করত তথাকার পূজায় আবার মন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজবাটীতে প্রসাদ

বঙ্গদেশের মধ্যে নদীয়ার রাজবংশ অর্থাৎ মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ, নাটোর রাজবংশ অর্থাৎ মহারাণী ভবানীর বংশ এবং বর্দ্ধমান রাজবংশ অর্থাৎ মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের বংশ—সিদ্ধ বংশ; এই সকল বংশে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবংশ পবিত্র করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাই বিশ্ব জননীর প্রিয়পাত্র শ্রীরামপ্রসাদের সহিত তাঁহার এত সদ্ভাব এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন যে কোন কার্য্য করিতেন, সাধন-ভজনের সম্বন্ধে তাঁহার যে কোন বিষয় অভিপ্রেত হইত, সাধকপ্রবর রামপ্রসাদকে তাহা অগ্রে অবগত করাইয়া পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রামপ্রসাদের তুল্য শ্রেষ্ঠ সাধক তখন আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই।

একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সম্মতিক্রমে রাজবাটীতে ৺কালিকা-দেবীর পূজা করিবেন, তাহাতে রামপ্রসাদকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে—এইরূপ স্থির করিয়া দিন ধার্য করিলেন। মহারাজ পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া রামপ্রসাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়া গেল, তথাপি তিনি উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এদিকে পূজার সময়

উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া মহারাজ নিজেই মাতৃপূজায় মনোনিবেশ করিলেন। পূজার শেষভাগে মহারাজ যখন প্রসন্নময়ীকে প্রসন্না করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনে নয়ন-মন চরিতার্থ করিতেছেন; সেই সময় প্রসাদ আচম্বিতে আসিয়া রাজবাটিতে উপস্থিত হইলেন এবং পূজা-গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, বাহিরেই মায়ের রূপ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। ভিতরে মহারাজ মায়ের যেরূপ রূপ ও ভাব দর্শন করিতেছেন, ভক্তবৎসলা জননী প্রসাদকেও বাহিরে সেইরূপ ভাব দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করিলেন। প্রসাদ আর পূজা-গৃহে প্রবেশ না করিয়া তন্ময়ভাবে সেই রূপের সহিত মনপ্রাণ মিলাইয়া ভাবতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গান এরূপ ভাবে গাহিতেছেন, তাহাতে এরূপ ভাবে প্রসাদের মন-প্রাণ সংযুক্ত হইয়াছে, যে তাহার অন্য বাহ্য-জ্ঞান কিছুই নাই; কণ্ঠ হইতে স্বর-লহরীর উচ্চারণ ব্যতীত তাঁহাকে চৈতন্যহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ তখনও গৃহমধ্যে তন্ময়ভাবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ত্রিদিবেশ্বরীর রূপ-সুধাপানে বিভোর। মহারাজ যখন ভাব-সমাধি হইতে ধীরে ধীরে বাহ্য-চৈতন্য লাভ করিলেন, তখন প্রাসাদের সুধা মাখা সঙ্গীত তাঁহার শ্রবণ-বিবর পবিত্র করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ সাধক-প্রবরের সেই গভীর ভাবপূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া পূজা-গৃহে লইয়া গেলেন, তখনও প্রসাদের কণ্ঠে মাতৃনামের সেই ভুবনভুলান সঙ্গীত-সুধা সমুত্থিত হইতেছিল :—

মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তমোনাশা বামা কে?
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা, ব্রহ্মকটা ঠেকেছে ॥
রূপসী শিরসি শশী, হররাণী এলোকেশী,
বিরাতি করুণা রাশি, কুলবালা নাচিছে ॥
দ্রুত চলে, আশু টলে, বাহুবলে দৈত্য দলে,
ডাকে শিবা, কব কিবা, দিবা নিশা ক'রেছে :—
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টমতি সুকঠিন,
রামপ্রসাদে, কালীরবাদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া সিদ্ধেশ্বরী মায়ের চরণে প্রণত হইলেন। তারপর প্রাণ ভরিয়া উভয়ে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া দেহ মন সুশীতল করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে পাইলে রাজকার্য্য, এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন, রামপ্রসাদের ন্যায় সাধুসঙ্গ তিনি অহরহঃ প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু তাঁহাকে ত সকল সময় ইচ্ছামত পাওয়া যাইত না, তিনি যে

নিজের ভাবেই বিভোর থাকিতেন, নিজেই আত্মহারা হইয়া ভুবনমোহিনী মায়ের রূপ-সাগরে সাঁতার দিতেন, কুল পাইতেন না, ভাবও হারাইতেন না—তাই সন্তরণেরও বিরাম ছিল না। মা যাহাকে আপনার করিয়াছেন, আপন প্রেমে উন্মত্ত রাখিয়াছেন সংসার বিষয়ে সে ত নগণ্য, সাংসারিক কাজ-কর্মে আর তাহার আস্থা কোথায়? লোকের আবাহন আমন্ত্রণ, লোকের সন্তোষ সাধন বা সদ্ভাব সংরক্ষণ—সে কেমন করিয়া করিবে? যার নিজস্ব কিছুই নাই—সে পরস্ব কেমন করিয়া দেখিবে—তাই রামপ্রসাদ ইচ্ছা স্বত্ত্বেও মহারাজের কথার অবাধ্য হইতেন, আহ্বান করিলেও উপস্থিত হইতে না পারিয়া মহারাজের প্রাণে দাগা দিতেন। কিন্তু রতনে রতন চিনে,—মহারাজ প্রসাদের এ ব্যবহারে ব্যথিত না হইয়া বরং প্রার্থনা করিতেন—"মা! আমার এরূপ ভাব কবে হবে, কবে আমি পার্থিব সকল বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার প্রাণের ভক্ত প্রসাদের ন্যায় তুমি-ময় জীবন যাপন করিব। এ দাসের প্রতি কি তোমার সেরূপ করুণা হইবে না মা?"

অন্ত পূজার পূর্ব্বে মহারাজ ঠিক বুঝিয়া'ছলেন—প্রসাদ আসিবে না, সে বোধ হয়—সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে, ভোলানাথের ভুল ধরা-ভক্ত প্রসাদ নিশ্চয়ই মাতৃনামে, মাতৃপ্রেমে বিভোর হইয়া এ সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়াছে, অতএব আর আসিবে না, কিন্তু পূজান্তে প্রসাদকে যখন তাঁহার পূজা-গৃহের বাহিরে বসিয়া মাতৃ গানে দিগন্ত পরিপূরিত করিতে শুনিলেন—তখন তাঁহার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মাতৃদর্শনের পর তদীয় প্রিয়-পুত্রের দর্শন নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া মহারাজ উন্মত্তভাবে দৌড়িয়া আসিয়া সাধক-শ্রেষ্ঠ প্রসাদকে ভিতরে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন—"ভাই! আজ যে তুই আস্‌বি, আমি কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করি নাই; যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই হতাশ হইয়া শেষে একাকী মায়ের উদ্বোধন করিলাম।"

রামপ্রসাদ। আপনি যা মনে ক'রেছিলেন—তা ঠিক, এখানে আসিবার কথা আমার আদৌ মনে ছিল না। যখন আহারাদির পর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গানে মত্ত হইয়াছি, সেই সময় মা-ই আমাকে বলিয়া দিলেন—"প্রসাদ! আজ ত তোমার এখানে থাকিবার কথা নয়, কৃষ্ণচন্দ্র যে আজ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, আমার যে আজ তথায় যাইবার দিন, তুমি এখনও এখানে স্থির হইয়া বসিয়া কেন?"—চৈতন্যময়ীর চৈতন্যে প্রবুদ্ধ হইয়া আমি তখনই উঠিলাম—এবং এখানে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বলা বাহুল্য যে এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রসাদ যে রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাহা যোগ-

বলের সাহায্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মহারাজ বলিলেন,—"আচ্ছা প্রসাদ! গুরুদেব তোমাকে মন্ত্র সজীব করিয়া অভিষিক্ত করিয়া যান নাই, তবে তুমি এরূপ সজীব মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া এত শীঘ্র সাধন পথে অগ্রসর হইলে কিরূপে?"

রামপ্রসাদ বলিলেন,—"তখন যদিও তিনি আমাকে সম্যক্ প্রকারে কৃতার্থ করিতে পারেন নাই বটে—কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার দয়া এখনও সমভাবে বর্ত্তমান, এখনও ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহাকে সূক্ষ্মদেহে অথবা মূর্ত্তিমানরূপে দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হই, ডাকিলেই তিনি আসেন এবং আমাকে কৃতার্থ করেন।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি যে আগমবাগীশের এত প্রিয়পাত্র ছিলেন, কই তিনি ত একদিনের জন্যও তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দেন না, আর প্রসাদের উপরেই তাঁহার যত দয়া। এইজন্য মহারাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রসাদ! গুরুদেবের দর্শন কি সশরীরে পাইয়াছ, না স্বপ্নে?"

রামপ্রসাদ। ভিন্ন দেহ আশ্রয় করত একবার মাত্র দর্শনদানে দাসকে সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তারপর শব-সাধনের সময় একবার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দাসের উত্তরসাধকের কাজ করিয়াছিলেন।

মহারাজ। রামপ্রসাদ! বড়ই কৌতূহল হইতেছে। যদি বাধা না থাকে, একবার সেই প্রভুর করুণার কথা প্রকাশ করিয়া আমার কর্ণকুহর পবিত্র কর।

প্রসাদ বলিলেন—"মহারাজ। অপরের নিকট প্রকাশ করা নিষেধ হইলেও আপনার ন্যায় সাধকের নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করিতে বাধা কি? অমাবস্যায় পূর্ণিমা দর্শনের পর আপনার এস্থান হইতে যাইয়া আমি আর কোথাও বড় যাইতাম না, আসনাদি প্রস্তুত করিয়া কেবল সাধ্যানুসারে নিজের কাজ করিতাম। জননী-ই আমার প্রথম ও প্রধান গুরু, তাঁহার আদেশ আমি দেবাদেশ অপেক্ষাও মান্য করিতাম, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন।"

মহারাজ! হ্যাঁ, তা খুব জানি, তাহা না হইলে কি আর এত উন্নতি কেহ করিতে পারে; জননীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী না ভাবিলে, কি বিশ্বজননীকে পাওয়া যায়? সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া পার্থিব জনক-জননীকে দেবভাবে ভাবিতে না পারিলে, ত্রিদিবের ঈশ্বর-ঈশ্বরীর স্নেহ লাভ করা সুকঠিন। সামান্য নায়ক নায়িকার প্রেম যে বুঝে না, সে স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী হইতে যাইবে কেমন করিয়া তারপর কি হইল প্রসাদ!

রামপ্রসাদ। আমার দ্বিতীয় গুরুদেব পূজনীয় মাধবাচার্য্য, অকালে স্বর্গারোহণ করিলে, আমি মহাত্মা আগমবাগীশের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, এখানে আসিয়া কতবার তাঁহার সঙ্গলাভ করত উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম, তারপর বাটী গিয়া যখন তাঁহার প্রদর্শিত পথে সাধন-ভজন করিতেছিলাম। সেই সময় আপনি হঠাৎ একদিন আগমন করিয়া বলিলেন—"গুরুদেব দেহ রক্ষা করিয়াছেন"—শুনিয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, কিন্তু পরক্ষণে তাহার অভয়বাণী শ্রবণ করত শোকে মুহ্যমান না হইয়া আপনাকে ত বলিয়াছিলাম—"মহারাজ! তিনি যে স্থানেই থাকুন না কেন, সাধনা করিয়া সে দেবতার দর্শন পাইবেই।" তারপর আপনি চলিয়া আসিলেন,—আমিও ক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁহার চিন্তা করিতে এবং সাধ্যানুসারে তাঁহার আত্মার দর্শন লাভ ক'রিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। একদিন সাংসারিক অভাব হেতু মায়ের কথায় আমি বাজারে * দ্রব্যাদি খরিদ করিতে যাইলাম। পরণে একখানি ছয়হাত ধুতি, কাঁধে একখানি গামছা।

আমি বাজার করিতে বাহির হইয়া হাজিনগরের ঘাটে আসিয়া পরপারে যাইবার জন্য খেয়া নৌকার অপেক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময় নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থবৃক্ষের * তলে একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। সাধু দীর্ঘ জটাজুটধারী এবং দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই গুরুদেবের স্মৃতি মনে পড়িয়া আমার প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল, আর থাকিতে পারিলাম না, নিকটে গিয়া ভক্তি গদগদচিত্তে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম।

মহারাজ। সাধু বাঙ্গালী-না হিন্দুস্থানী?

রামপ্রসাদ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি কথায় বোধ হইল, তিনি হিন্দুস্থানী এবং যজ্ঞসূত্র দেখিয়া বুঝিলাম—ব্রাহ্মণ। আমি প্রণাম করিবামাত্র তিনি "আনন্দরহো" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"এ বেটা, হাম্‌কো ধুনিকাবাস্তে থোড়া লকড় লায় দেও।"

মহারাজ। সেখানে কাঠ কোথায় পাইলে?

রামপ্রসাদ। সেখানে কাঠ পাইবার ত সম্ভাবনা নাই, তবে এদিক ওদিক

* তখন বাজার করিতে যাইতে হইলে হালিসহর হইতে হাঁটিয়া হুগলী সৈয়েদচাঁদের বাঁধাঘাটের অপর পারে অর্থাৎ হাজিনগর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া খেয়া নৌকায় পার হইয়া হুগলীর চক্‌বাজার হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে হইত।

* ঐ পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহারই দক্ষিণদিকে এখন হাজিনগরের পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে।

তাকাইয়া দেখিলাম, ঘাটে একটী বৃষকাষ্ঠ পোতা আছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া আনিলাম এবং নিকটবর্ত্তী একজন কুমারের গৃহ হইতে দা এবং কোদালীর সাহায্যে বৃক্ষতলের কিয়দংশ স্থান পরিস্কার করিয়া তাহার উপর ধুনি প্রস্তুত করিয়া দিলাম। সাধু গঙ্গা হইতে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া ধুনির নিকট বসিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন—"বেটা, তেরা নাম কেয়া!" আমি আমার নাম বলিলাম। আমার নাম শুনিয়া সাধু তিনবার রাম, রাম, রাম, বলিয়াই সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় আমি তাঁহার মুখে নানা প্রকার দেবভাবের আবির্ভাব দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহার এই সমাধির অবস্থা অপনোদিত হইল। সমাধি ভঙ্গের পর আমাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে বসিতে থাকিতে দেখিয়া সাধু বলিলেন,—'বেটা, হামারা বহুত উমের হুয়া, হামি বহুত তীর্থ দর্শন কিয়া, আব্‌তক হাম্ শিষ্য নেহি কিয়া। হাম্ তেরা' উপরমে বহুত প্রসন্ হুয়া, আভি তোম্‌কো সিদ্ধ মন্ত্র দেকে সংসারসে ছুটি লেঙ্গে।" আমি সাধুর এই কথা শুনিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম।

মহারাজ। মন্ত্রগ্রহণ কি সেইখানেই করিলে?

রামপ্রসাদ। হ্যাঁ, কিন্তু মন্ত্রগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভাবিতে লাগিলাম। আমি মায়ের বিনা অনুমতিতে কখন কোনও কাজ করি নাই; আজ জীবনের এত বড় একটা মহৎকার্য্য করিব, কিন্তু তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিব না।

মহারাজ। সেখানে মাকে কিরূপে পাইলে?

রামপ্রসাদ। মহারাজ, আশ্চর্য্যের কথা শ্রবণ করুন,—আমি এরূপ ভাবিতেছি, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী সাধু তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন,—"বেটা, ডরো মৎ, তোম্ মাতৃভকৎ হ্যায়, তোমরা মাতৃমন্ত্র ঠিক হোগা, তোম্ তুমারা মাতারিকো হুকুম লেনেকো বাৎ ভাব্‌তা, আচ্ছা এক্ কাম্ করো, তুম গঙ্গাজীমে আস্নান করো, তুমারা মাতারিকো উদ্দেশ্‌মে প্রণাম করকে, এসব বাৎ সম্‌ঝায় দেও, আউর ব'লো আপ্ হাম্‌কো হুকুম দেদিজিয়ে।" সাধুর এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া আমি গঙ্গাগর্ভে অবগাহন করিলাম—ডুব দিয়াই দেখি, যে জলের ভিতরে আমার জননী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"বাবা! ইনিই তোমার মুক্তিদাতা গুরুদেব, তুমি স্বচ্ছন্দে ইহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর!" আমি মহানন্দে জল হইতে উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্রে দৌড়িয়া যাইয়া সাধুর চরণে লুটাইয়া পড়িলাম। সাধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কেঁওরে বেটা তেরা মাতারিকো হুকুম মিলা।" আমি করযোড়ে বলিলাম

"হাঁ প্রভু! তারপর মহাত্মা সাধু সেই প্রজ্জলিত ধূনির সম্মুখে আমাকে সজীব-মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সিদ্ধমন্ত্র কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমি সংজ্ঞা হারাইলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আমি অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম।

মহারাজ। রামপ্রসাদ! আমি এতদিন জানিতাম না যে গুরুদেব, মৃত্যুর পরও তোমার প্রতি সমভাবে কৃপা করিতেছেন, তোমার সঙ্গে আরও অনেকবার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে কিন্তু তুমিত এ কথা আমার নিকট প্রকাশ কর নাই; যাহা হউক, গুরুদেবের অশেষ করুণা, তোমার ন্যায় সৎপাত্রে এরূপ করুণা অসম্ভব নহে—তারপর কি হইল প্রসাদ?

রামপ্রসাদ। আবার চৈতন্য হইলে পর, সাষ্টাঙ্গে গুরুপদে প্রণাম করিলাম এবং বলিলাম,—"প্রভো! অদ্য মে সফলং জন্ম, অদ্য মে সফলা ক্রিয়া"। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন,—"বাবা! ধূনি আউর আসন্ হিঁই রহনে দেও, আব্ চলো হাম্ তুমারা মাতারিকো দর্শন করেগা।" আমি ধন্য হইলাম এবং আনন্দ-গদ-গদ-হৃদয়ে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিলাম। বাজার করা আর হইল না। বাটী আসিয়া সন্ন্যাসী-প্রবরকে বসাইয়া মাতার পদধূলি লইতে গেলাম, জননী যেন আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিলেন। আমাকে পদধূলি লইতে দেখিয়াই বলিলেন,—"বাবা! তোমার সিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করা হইয়াছে কি?" আমি তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য বলিলাম,—"মা! এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?" তিনি বলিলেন,—"বাবা! ইষ্টমন্ত্র জপের সময় আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কোন এক সাধু মহাত্মা, তোমাকে কৃপা করিয়া সিদ্ধবীজ প্রদান করিবেন, তুমি আমার আদেশ প্রার্থনা জন্য যেন ইতস্ততঃ করিতেছ, আমি যেন গঙ্গাস্নানে গিয়া তোমাকে তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে আদেশ দিলাম। তার পর তুমি যেন মন্ত্র গ্রহণ করিলে এবং যখন তোমার চৈতন্য লোপ হইল, ঠিক সেই সময় আমি সাধুকে স্বপ্নে দেখিলাম, তারপর আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জপ শেষ করিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য মন বড় চঞ্চল হইল এবং যতই তোমার আসিতে বেলা হইতে লাগিল, ততই আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।"

মহারাজ।—প্রসাদ! তোমার জননী সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তি—তাহাতে আর সন্দেহ নাই; নতুবা হঠাৎ তোমার এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইবে কেন? তারপর প্রসাদ!

রামপ্রসাদ।—তার পর মাকে বলিলাম—"মা! আমার দীক্ষা গ্রহণ হইয়াছে। তুমি যা বলিলে—সমস্তই ঠিক।" মা বলিলেন—"বাবা, আমার

ভাগ্যে কি সে দেবতার সাক্ষাৎকার হইবে না? আমি বলিলাম,—"কেন হইবে না! তিনি যে তোমার সহিত দেখা করিবার জন্ত বাটীতে আসিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া মা আগ্রহ সহকারে দৌড়িয়া যাইয়া যেমন সাধুর পদধূলি লইলেন, সাধুও পদধূলি লইয়া বলিলেন,—"তুম্ যব্ রামপ্রসাদ কা মাতারী, তব হামারা মাতারী, তব্ হামারা মাতারী, আউর জগৎ কা মাতারী, তুম্ হাম্‌কো নেহি জান্তা, হাম্ তোমারা বেটা হায়।" তার পর সাধু আব্‌দারের সহিত বলিলেন—"এ মায়ী! হামারা ভুক্ লাগা, হাম্‌কে কুচ্ খিলাও।" সাধুর এই কথাতে মা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, সাধ্যানুসারে তাঁহার সেবা করিলেন। তার পর সাধু ধুনির নিকট যাইলে, আমিও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিলাম এবং একমাস ধরিয়া তাঁহার নিকট হইতে সাধন ভজনের নিয়ম সকল জানিয়া লইতে লাগিলাম, যখন আমার সমস্ত সন্দেহ দূরীকরণ হইল, তখন সাধুদেব একদিন হঠাৎ বলিলেন,—"এ রাম দেখো, হামারা সব করম্ হোগেয়া, কাল অমাবস্যা হ্যায়, হাম্ পূজা করকে আপনা স্থান চলেঙ্গে। আউর তুম্ হামারা কায়াকো সৎকার করকে, আপন ঘর মে যাকে সাধন ভজন করো। দেবীকে সাৎ তুমারা দর্শন হোগা।" হঠাৎ এই কথা শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম এবং বলিলাম—"বাবা! আমার সাধন-ভজনের কিছুই হইল না, আপনি চলিয়া যাইবেন, তবে আমার কি গতি হইবে বাবা!" তিনি বলিলেন—"হাম্ দেহ ছোড়্‌নেকা বাদ তুম্‌কো দর্শন দেগা, জিস্ ঘড়ি তোমরা দরকার হোগা, হাম্‌কো স্মরণ করো, হাম্ কভি সূক্ষ্মদেহে, কভি শরীর ধারণ করকে তুম্‌কো দর্শন দেগা, আউর উপদেশভি দেগা।" আমি আর কোন কথা না বলিয়া পরদিন পূজার আয়োজন করিলাম। পূজা শেষ করিয়া সাধু অৰ্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে অবস্থিত হইলেন, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মরিবার সময়ে আমারও ঐরূপ মৃত্যু হইবে বলিয়া, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। তারপর আমি তাঁহার দেহ সৎকার করিতে শ্মশানে লইয়া গেলাম; এই সময়ে অনেক সুলক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

মহারাজ। প্রসাদ! কোন্ কোন্ সময় তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল?

রামপ্রসাদ। শব সাধনার সময় তিনি বড়তির বিলের শ্মশানে আমার সহায় ছিলেন, তাঁহারই কৃপায় আমি শাস্ত্রোক্ত সব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ভজহরি আমার সঙ্গে গিয়াছিল বটে, কিন্তু সাধনার সময় সে অন্যস্থানে রাত্রিযাপন করিয়াছিল। গুরুদেব সেদিন শরীর ধারণ করিয়াই আমার উত্তরসাধকের কার্য্য করিয়াছিলেন। অন্যান্য সময়ে সূক্ষ্মদেহে দর্শন হইত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, প্রসাদের প্রতি গুরুদেবের সাতিশয় কৃপার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কলিতে প্রসাদের প্রতিই যে জগজ্জননীর অদ্ভুত করুণা প্রদর্শিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এদিকে রজনী প্রভাত হয় দেখিয়া প্রসাদ বলিলেন…'মহারাজ! অদ্য আদেশ করুন, বিদায় হই।"

মহারাজ বলিলেন—"প্রসাদ! তোমার ন্যায় সিদ্ধ-পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ করিতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না, তবে কেহ পাছে দেখে, পাছে সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই জন্য বাধ্য হইয়া পৃথক্ হইতে হইতেছে। প্রসাদ! মায়ের প্রিয়পাত্র প্রসাদ! আমারও সমস্ত কার্য্য প্রায় ফুরাইয়া আসিল, আমিও সত্বর স্বস্থানে প্রস্থান করিব, দেখো ভাই! সেই শেষ দিনে যেন একবার তোমার মত সাধকের দর্শন লাভে চরিতার্থ হইতে পারি।"

রামপ্রসাদ আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিলেও কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন। তিনি বলিলেন—"মহারাজ। আপনি আমাদের দেশের মধ্যে রাজর্ষি জনক-তুল্য, অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়া, বিত্ত বিভবে অমিত প্রভাবশালী হইয়াও আপনি সাধকাগ্রগণ্য হইয়াছেন অধুনা এরূপ সৌভাগ্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে না; এত প্রলোভন সম্মুখে থাকিতেও যখন আপনার চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত হয় না, তখন আপনার তুল্য সাধু আর কে আছে? প্রলোভনের বস্তু কাছে না থাকিলে নিবৃত্তি আপনি আসে, কিন্তু থাকিয়া যাহার নিবৃত্তি হয়—তিনিই মহৎ, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী; অতএব ধন্য আপনার সাধনানুরাগ, ধন্য আপনার ভক্তি-প্রাবল্য, আপনি হিন্দুরাজ-গণের শিরোভূষণ। "কলির গতই ধন্য," মহারাজ! আপনি ঠিক সময়ে সংবাদ দিলে আমি নিশ্চয়ই আসিব, তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না।" এই বলিয়া রামপ্রসাদ ক্ষুণ্ণমনে মহারাজকে অভিবাদন করিয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী দিক্‌পালগণ অচিরে শ্রবণ করিলেন, প্রকৃতি যেন প্রিয়-পুত্রের ভাবী বিরহে কাতর হইয়া পড়িলেন; চন্দ্রমাশালিনী রজনী যেন অকস্মাৎ অন্ধকারময়ী হইল। পরদিন হইতে প্রকৃতি ভীষণ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, দারুণ ঝড ও বৃষ্টিতে দেশ তোলপাড হইতে লাগিল। কত লোকের গৃহ ভগ্ন হইল, কত বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইল, একজন মহাপুরুষের দেহ রক্ষার পূর্ব্বে বা পরে প্রায়ই প্রকৃতির এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে—ইহা স্বাভাবিক। হালিসহরের সকলেরই ক্ষতি হইয়াছিল, সে দৈব-দুর্ব্বিপাকে কেহই বিপদগ্রস্ত হইতে বাকী ছিল না, কেবল রামপ্রসাদের গৃহ, লঙ্কাকাণ্ডে বিভীষণের গৃহের

ন্যায় রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ দৈব-দুর্ব্বিপাক কেবল তাঁহার কোন ক্ষতি করে নাই। মা সর্ব্বমঙ্গলা যাঁর অন্তর-ফলকে সদা প্রতিফলিত, বিপত্তারিণী মা যাঁহার সহায়, জাগতিক বিপদ কি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে? বরং সে বিপদের দিনে গ্রামের বহুলোক রামপ্রসাদের আশ্রয়ে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। সেদিন মাতৃনামে রামপ্রসাদের অচল অটল বিশ্বাস দেখিয়া, সেই দুর্দ্দিনে প্রসাদের কণ্ঠ হইতে মাতৃনামের গগনভেদী চীৎকার শুনিয়া এবং তাঁহার সে দিনকার সেই মধুরী-সম্পন্ন অপরূপ-মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহাতে বরাভয়দায়িনী কালিকার আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ করিয়াছিল। আর একদিন তিনি এইরূপ স্বর্গীয় সুষমায় বিমণ্ডিত হইয়াছিলেন। জীবনের সেই মহামাহেন্দ্রক্ষণে, যে শুভক্ষণে শবসাধনায় সিদ্ধিলাভের পর অতি প্রত্যূষে, তিনি দীপ্তিমান দিনমণির ন্যায় গৃহে আসিয়া জ্যোতিঃপূর্ণ দেহে জননীকে প্রণাম করিতে যাইয়া মাতৃদেহে ৺জগদম্বার আবির্ভাব দর্শন করিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেদিন প্রসাদ তখনও স্নান করেন নাই, এমন কি শবের কোন কোন অংশ ছিন্ন হইয়া তখন তাঁহার অঙ্গে লাগিয়াছিল; কারণানন্দে তখন তিনি উন্মত্ত—আনন্দে বিভোর। সেদিন সাগ্রহে আদর্শপুত্রকেই ক্রোড়ে লইয়া সিদ্ধেশ্বরী মাতা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেই দিনের আনন্দময় ভাবের সহিত অন্যকার ভাবের কোনও প্রভেদ নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রসাদের বেড়া বাঁধা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সে দিনকার দৈব-দুর্ঘটনায় অনেক গ্রামবাসী প্রসাদের সামান্য গৃহে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। প্রসাদের উপর মায়ের এরূপ স্নেহকরুণার আধিক্য দেখিয়া এবং তৎপরদিবস হইতে রামপ্রসাদের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়া, গ্রামবাসী সকলে তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিতে লাগিল। সেদিন প্রকৃতির যেরূপ ভীষণ ভাব দেখা গিয়াছিল, তাহাতে প্রলয় হইবে বলিয়াই সকলের বিশ্বাস হইয়াছিল, কিন্তু প্রসাদ বলিলেন,—"আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না, পুত্রের প্রতি মায়ের কখনও করুণার হ্রাস হয় না, আমরা বুঝিতে পারি

না বলিয়াই অনিষ্ট হইতেছে মনে করি, কিন্তু মা আমার কোন্ অনিষ্টের মধ্যে দিয়া যে জগতের কিরূপ মঙ্গল বিধান করেন, কি অঘটন ঘটাইবার জন্য যে তিনি কিরূপ লীলাখেলা খেলেন—সামান্য বুদ্ধির মানব আমরা তাহা বুঝিতে পারি না বলিয়া—তাঁহার প্রতি দোষারোপ করি, কিন্তু বুঝিয়া দেখি না যে করুণাময়ীর করুণাকণা বিস্তারের ব্যতিক্রম হইলে কি জীবজগৎ এক তিলমাত্র স্থির থাকিতে পারে! কটাক্ষে যাঁর প্রবল বহ্নি জ্বলিয়া উঠে, নিমেষে যিনি সমস্ত ধ্বংস করিতে সমর্থ, তাঁহার এতদিন ধরিয়া দুর্ব্বিপাক সৃষ্টি করিয়া লয় করিবার আবশ্যক কি? যখন হঠাৎ এরূপ কোনও একটা কিছু হয়, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, মঙ্গলময়ী মা, সেই অমঙ্গলের মধ্যে দিয়া আমাদের কোন পরম মঙ্গল সাধন করিবেন। অমঙ্গল না হইলে ত জীবের মনে মায়ের প্রতিমূর্ত্তি জাগে না, তাঁহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করে না—তাই চৈতন্যরূপিণী অমঙ্গল দেখাইয়া, অশেষ দুঃখ প্রদান করিয়া আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করত মঙ্গলের পথ, মহাসুখের পথ সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেন। ইহাই তাঁহার লীলামাহাত্ম্য! এই যে দেশে এত অজন্মা হইয়াছে, খাদ্যশস্যের অভাবে যে দরিদ্র কৃষিজীবিগণের কষ্টের একশেষ হইয়াছে, এই বৃষ্টিজলে সেই রিষ্টিনাশ করাই যে মায়ের উদ্দেশ্য, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তারপর প্রসাদ উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন :—

একবার ডাক্ কালীতারা ব'লে,
জোর ক'রে র'স্‌নে।
ও তোর ভয় কিরে শমনে।

এই গান গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তেমন যে সপ্তাহ-ব্যাপী দুর্য্যোগ, প্রভাত হইতে না হইতেই কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল, সকলে রামপ্রসাদের কালীনামের সাধনভজন দেখিয়া অবাক। অগ্নিতে জলক্ষেপ হইলে যেমন তাহা সহসা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, প্রসাদের মাতৃনামের তীব্রতেজে তেমন যে প্রলয়কারী দুর্য্যোগ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। গ্রামবাসী যেমন ভীত চিত্ত হইয়া প্রসাদের শরণাপন্ন হইয়াছিল, দেবীর বরপুত্র রামপ্রসাদও তেমন দেবীর শক্তিতে সেই সকল অমঙ্গল ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। প্রকৃতি আবার শান্তভাবে ধারণ করিল, পরদিন নভোমণ্ডল আবার বালার্ক-কিরণ-রঞ্জিত হইয়া জীবজীবনে অশেষ আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। এজগতে সাধনবলের তুল্য বল আর নাই। মানুষ সাধন বলে অসাধ্যও সাধন করিতে সক্ষম হয়,—কিন্তু হায়! আজ আমরা মানুষ হইয়া আর সেই মনুষ্যোচিত ক্ষমতা লাভের

প্রত্যাশা না করিয়া, কেবল পাশবিক বলে ক্রমশঃ পশুভাবাপন্ন হইতেছি। কেবল অর্থবলই মহাবল ভাবিয়া পরমার্থ-বলহীন হইয়া অধঃপাতে যাইতেছি। সম্মুখে সাধনভজনের অমিত শক্তি-মাহাত্ম্য সন্দর্শন করিয়াও চৈতন্যলাভ করি না, ভুলেও একবার সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া আমাদের নিজস্বশক্তিলাভের জন্য প্রয়াস পাই না। আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি—সে আজ বেশী দিনের কথা নহে, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে সাধকপ্রবর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাধনার কি অদ্ভুত ক্ষমতাই দেখাইয়া গিয়াছেন, নিরক্ষর-নিঃস্ব-ব্রাহ্মণ কেবল মাতৃনাম মহামন্ত্র বলে জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জগৎ-বাসীকে কি কুহকবলেই না মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কি অত্যদ্ভুত ভাবেই না বিভোর করিয়া দিয়াছেন! এখন আর তেমন কেহ নাই, তাই পরমহংসদেবের এত মহিমা, কিন্তু পূর্ব্বে ঐরূপ কত শত পরমহংসদেব হিন্দুর প্রত্যেক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কত অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম—আমরা কাঞ্চন হারাইয়া কাচে মজিতেছি, সঠিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করিতেছি, ধর্ম্মহীন হইয়া আপনি মজিতেছি, দেশকে মজাইতেছি। এখন ত ধর্ম্ম একেবারে নাই বলিলেই হয়, এ সময় পরমহংসদেব যখন এত অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আর রামপ্রসাদ যখন জন্মিয়াছিলেন—প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তখন ত দেশের অবস্থা এত শোচনীয় হয় নাই, ধর্ম্মকর্ম্ম ত এত লোপ পায় নাই—তখন যে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী হইবে—তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

রামপ্রসাদ গৃহে আসিয়া অবধি এ কয়দিন গ্রামবাসীর কাজকর্ম্মে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। পরোপকারী না হইলে সাধক হইতে পারে না। বিশ্বেশ্বরীকে পরিতুষ্ট করিতে হইলে তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের সেবা আগে শিক্ষা করিতে হয়—দশের সেবা করিতে না পারিলে দশভুজার দর্শন, তাঁহার কৃপালাভ অসম্ভব। রামপ্রসাদ সাধ্যানুসারে সেই বিপদের সময় গ্রামবাসীর নানাপ্রকারে উপকার করিয়াছিলেন। নিজের সহোদরাধিক স্নেহে কাহাকেও অর্থ দিয়া, কাহাকেও শারীরিক সাহায্য করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সে বৎসর দারুণ দুর্বিপাকের পর গ্রামে চাষ আবাদের সূত্রপাত হইলে কয়েকমাস পরে বুঝিতে পারা গেল, এবার চাষ আবাদের যেরূপ সূত্রপাত হইতেছে—তাহাতে চারি পোয়া ফসল নিশ্চয়ই হইবে—রামপ্রসাদের সেদিনকার কথা সকলের মনে উদিত হইতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন—এবার দেশের মহোপকার সাধন করিবার জন্য মায়ের এরূপ কোপদৃষ্টি, এরূপ অমঙ্গলের সূত্রপাত, এই অমঙ্গল

মঙ্গলেরই নিদানভূত জানিও, মা আমার কখন কাহারও অমঙ্গল করেন না! রামপ্রাদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিতে চলিল দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ভক্তিভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল।

রামপ্রসাদ এইবার নিজের কাজে সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। আঃ মহারাজের সেই হৃদয়ভেদী বাক্য মানসপটে সতত জাগরূক হইয়া তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিতে লাগিল। হায়! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবেন; তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মনিরত, ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক সাধু মহারাজ দেশ হইতে অপসারিত হইলে নিশ্চয় দেশের একটা ঘোর অভাব উপস্থিত হইবে। এদেশে গুণের আদর করিতে, শিক্ষিত বিপ্রগণের অভাব-অভিযোগ পূরণ করিতে ধাৰ্ম্মিকের পার্থিব অভাব হইতে মুক্ত করিয়া স্বভাবে পরিচালিত করিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত ত আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না; দেশ হইতে এরূপ মহারাজের লোকান্তর হইলে নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু তাহার আর উপায় কি, সময় শেষ হইলে ত তাঁহাকে যাইতে হইবে? সিদ্ধ সাধক কৃষ্ণচন্দ্র যখন নিজ মুখে একথা প্রকাশ করিয়াছেন—তখন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই; তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন—তাঁহার শেষ দিন নিকটবর্ত্তী, তাই তিনি আসিবার সময় আমাকে বারবার এ কথার উত্থাপন করিয়া বলিলেন—"প্রসাদ! শেষ সময়ে যেন আমার নিকটে উপস্থিত থাকিও?" নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিতে হইবে—এ জীবনে তাঁহার ঋণ কি আমি পরিশোধ করিতে পারিব?

রামপ্রসাদ দুই এক সপ্তাহ অন্তর প্রাণের বন্ধু ভজহরিকে রাজভবনে পাঠাইয়া মহারাজের তত্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র প্রাণের সুহৃদ প্রসাদের নিকটই তাঁহার মৃত্যুর কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তারপর এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরে কেহ জানিত না। মহারাজ ভিতরে ভিতরে সকল বিষয়ে একপ্রকার ঔদাস্যভাব প্রকাশ করিয়া নিদানের দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সকল কার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকর্ম্মেই এখন তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত, প্রার্থী হইয়া আসিলে কেহই এখন রিক্ত-হস্তে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। মহারাজের ন্যায় একজন অকপট সুহৃদকে চিরতরে ছাড়িয়া দিতে হইবে ভাবিয়া প্রসাদ সময়ে সময়ে বড়ই চিন্তান্বিত হইতেন, কিন্তু সে চিন্তা বেশীক্ষণ থাকিত না, পরক্ষণেই মনে করিতেন—চিন্তা কিসের, মায়ের কাঁছে যাইবে, অহরহঃ মায়ের কোলে থাকিবে—চিরশান্তি অনুভব করিবে—ইহাতে দুঃখ কিসের? কৃষ্ণচন্দ্রের মত রাজর্ষির এইরূপ

সৌভাগ্যই ত বাঞ্ছনীয়—মনে করিয়া আবার প্রফুল্লভাব ধারণ করিতেন। আজ প্রায় এক মাস রামপ্রসাদ বাটীর সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখিতেছেন। একদিন সর্ব্বাণী প্রকারান্তরে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"সেই ঝড়ের সময় হইতে বাহির বাটীর বেড়াটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উহা আর বাঁধা হইল না; রাস্তার ধারে না হ'লে আমি এতদিন উহাকে বাঁধিয়া ফেলিতাম।"

ঝড়ের সময় বহুলোক সমাগত হইয়া এই ঘরের বেড়াটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল তদবধি আর উহা বাঁধা হয় নাই—রাস্তা হইতে ভিতরের সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্থের বাটি এরূপ আবরণহীন হওয়া ভাল নয়, ইহাতে সময় সময় সর্ব্বাণীকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইত। বেড়াটি রাস্তার দিকে না হইলে সর্ব্বাণী এতদিন তাহার সংস্কার করিয়া দিতেন, কিন্তু গৃহস্থের কুলবধূ ত আর বাহিরে আসিতে পারেন না, এই জন্য প্রকারান্তরে আজ স্বামীকে উহার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রসাদ বলিলেন—"হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক; ওটা অনেক দিন ধরে খোলা রয়েছে বটে, আচ্ছা আজই আহারাদির পর উহাকে বাঁধিয়া দিব।" এই বলিয়া সত্বর স্নানাহার করিয়া দড়ি ও দা হস্তে বাহিরে আসিলেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরীকে সাহায্য করিতে বলিলেন।

বেড়াটী চাঁচ নির্ম্মিত ছিল, কয়েকখানি চাঁচ মধ্যে দিয়া রামপ্রসাদ রাস্তার দিকে বসিয়া দড়ি লাগাইয়া দিতে লাগিলেন এবং কন্যাকে বলিলেন—"মা! তুমি এই দড়ির খুঁটটি পুনরায় লাগাইয়া দেও? কন্যা তাহাই করিতে লাগিল। পিতা পুত্রীতে এইরূপ বেড়া বাঁধা হইতেছে। রামপ্রসাদ বেঁড়া বাঁধিতেছেন, হস্ত গৃহের বেড়া বন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত বটে কিন্তু মনপ্রাণ তাঁহার মাতৃপদে সমর্পিত, শ্যামা মায়ের চরণ-মকরন্দের মধুপানে নিরত। ব্রহ্ম-জ্ঞানানন্দে বিভোর রামপ্রসাদ তখন দেখিতেছেন—জগতের সকল কাজেই জগদীশ্বরীর হস্ত বিরাজিত, কি সৎ কি অসৎ সমস্তই তাঁহার কর্ম্ম, তিনিই করাইতেছেন—তাই জীব বাধ্য হইয়া তাহা সম্পাদন করিতেছে। সকলই আমার মায়ের, সকল বস্তুতেই আমার মা অনুপ্রবিষ্ট। ছোট বড়, ভদ্র অভদ্র, সকলই আমার মায়ের সন্তান; বিশ্বপ্রসবিনী মা আমার আত্মরূপে জগতের কোথায় নাই? তবে এ আমার, আপনার ও আমার পর, এরূপ ভাব কেন ভাবিয়া মরি! যে কাজ করি—আমার বলিয়া কেন করি, আমার কি আছে যে করিব, সবই তাঁহার, সেই রাজরাজেশ্বরী ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা, তাঁহারই খাস্ তালুকের প্রজা আমি, তিনি যখন যেমন হুকুম্ করেন, আমি তাহাই প্রতিপালন করি, এই বলিয়া বেড়া বাঁধিতেছেন, আর গাহিতেছেন :—

আমি ক্ষেমার খাস্ তালুকের প্রজা।
ও সেই ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেননা আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা,
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইবে বোঝা।
ক্ষেমার খাসে আছি ব'সে নাই মহলে শুখা হাজা,
দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহল আছে তাজা।
প্রসাদ বলে শমন তুমি, ব'য়ে বেড়াও ভূতের বোঝা,
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জান না সে পদের মজা॥

কৃষ্ণচন্দ্রের কথা মনে পড়ায় যমরাজের উপর তাঁহার আক্রোশ হইল; তিনি বলিলেন—"কৃতান্ত! মহারাজকে লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, কিন্তু আমাকে কবে লইবে? দেখ, আমি এই বাজে কাজ করিতেছি ব'লে তুমি আমার উপর কোপ প্রকাশ করিবে—কিন্তু তাহা পারিবে না। যে কাজ আমি করি—তাহা তাঁহারই কাজ, আমার নিজের কিছুই নাই। প্রসাদ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত হাত চালাইতেছেন—বেড়ার গ্র'ন্থ দিতেছেন, ভিতরে কন্যাটি তাঁহার সাহায্য করিতেছে। বেড়া বন্ধনের পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া কেবল উপরে কাজ করিতেছিলেন—ভিতরে কিন্তু মনপ্রাণে মাতৃময় হইয়াছিলেন। হঠাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা মনে পড়ায় সে ভাব অন্তর্হিত হইয়া মৃত্যুর কথা মনে পড়িল বলিয়া তিনি উপরোক্ত সঙ্গীত গাহিয়া মৃত্যুপতি যমের প্রতি কটাক্ষ করিলেন। তারপর কাজকর্ম্মে অনাসক্তি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় পুনরায় গাহিলেন :—

ভূতের বেগার খাটবে কত।
তারা বল্ আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চদিকে লয়ে বেড়ায় এ দেহের পঞ্চভূত,
ওমা ষড়রিপু সাহায্য তার, হ'লো ভূতের অনুগত।
আসিয়া ভব সংসারে দুঃখ পেলাম যথোচিত,
ওমা যার সুখেতে হব সুখী (আমার) সে মন নয় গো মনের মত॥
চিনি ব'লে নিম্ খাওয়ালে, ঘুচ্‌লো না ত মুখের তিত,
কেন ভিষক্ প্রসাদ, মনে বিষাদ, হয়ে কালীর শরণাগত।

সাধকের মন, পোষা-পাখীর মত আবার স্ববশে আসিল, আবার মনের মত কাজ করিতে লাগিল; আবার পরমানন্দ রসে প্রমত্ত হইয়া সব ভুলিয়া গেল, মাতৃ-প্রেমের অগাধ নীরে ডুবিয়া আবার আত্মহারা হইল—তাই শেষে

গাহিলেন—"মন! মহামায়ার শরণাগত হয়ে, মায়ের সংসারে' এত কাতর কেন বিষাদিত চিত্তে কেন আত্মভোলাভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছ? মন মনের মত হও,—স্থির হও; মাকে ডাক্‌লে ভাবনা কিসের?" আবার সমভাবে কাজ চলিতে লাগিল. ভিতরের কাজেও কোন বাধা ঠেকিতেছে না, বাহিরের বেড়াবাঁধা কামও চলিতেছে; কারণ কন্যাটী ঠিক সমান ভাবে পিতার কাজে সহায়তা করিতেছে।

প্রসাদের আহার হইয়া গিয়াছে, কন্যাটির তখনও খাওয়া হয় নাই, এই জন্য ভিতরে মা ডাকিলেন—জগদীশ্বরি! আয় মা ভাত খেয়ে যা, অনেক বেলা হ'য়েছে; তারপর কাজ ক'র্‌বি। অবোধ বালিকা কোন কথা না বলিয়া ভাত খাইতে চলিয়া গেল; প্রসাদ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না; তিনি দড়ি গলাইয়া দিতেছেন—আর তন্ময়ভাবে গান গাহিতেছেন। এদিকে কন্যা চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু পাছে ভক্তের মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, পাছে সাধকের সাধনায় বিঘ্ন ঘটে—ভক্তের ভক্তির স্রোতে বাধা পড়ে, এইজন্য ত্রিভুবন-জননী, বিশ্ববন্দিনী, ভক্ত-বৎসলা মা আমার, অম'ন ভক্তের সাহায্যের জন্য কৈলাসের মণিমন্দির তুচ্ছ ক'রে কন্যারূপে আসিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, বেড়ার দড়ি গলাইয়া দিতে লাগিলেন, আর ভক্তের সেই প্রাণ-মাতান গান শুনিয়া প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রসাদের হৃদয়ভেদী, ভক্তি-সুধা-মিশ্রিত সঙ্গীত শুনিবার এমন সুযোগ ত মা আর কখন পাইবেন না। প্রসাদ যখন গৃহকর্ম্ম করিতেন, গানে তখন তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি আসিত; মন অতিশয় ভাব-সন্নিবিষ্ট হইত, অপর সময় অপেক্ষা গৃহকর্ম্মের সময় তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির বন্যা অত্যন্ত প্রবল রূপে প্রবাহিত হইত, তখনকার গান শু'নলে পাষাণও গলিয়া যাইত; নিকটে যাহারা থাকিত—তাহারা আর উঠিতে পারিত না, কাজেই প্রিয়পুত্র প্রসাদের গান নিবিষ্টচিত্তে শুনিবার অবসর মায়ের আর হইত না, আজ সেই সুযোগ হইয়াছে, কন্যা জগদীশ্বরী উঠিয়া গিয়াছে; তাই মা আমার আর থাকিতে না পারিয়া প্রসাদের কন্যা-রূপে আসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মরি মরি, তপস্যার কি প্রভাব, সাধনার কি অতুলনীয় মহীয়সী শক্তি। বিধি-বিষ্ণু ইন্দ্র-চন্দ্র ধ্যানে যাঁর দর্শন পান না, স্বয়ং আশুতোষ যে চরণ পাইবার জন্য সতত শ্মশানে-মশানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, হায়! সেই মোক্ষফলদাত্রী, সুরাসুরবন্দিনী, ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা আজ স্বেচ্ছায় ভক্তের মনোবাসনাপূর্ণ করিতে কন্যারূপে বেড়া বাঁধিতে আসিয়াছেন—প্রিয়পুত্রের ভক্তিভাব তিরোহিত হইলে পাছে, সে হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করে, সেই ভয়ে ভক্তাধীনা সর্ব্বাগ্রে,

সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদের নিকট সমুপস্থিতা। ধন্য রামপ্রসাদ! ধন্য তোমার সাধনভজন, ধন্য তোমার ভক্তি ভাবপূর্ণ সঙ্গীতরঙ্গের অমিতশক্তি, আজ বিশ্বের আধারভূতা আদ্যাশক্তিকেও সে শক্তি প্রভাবে তুচ্ছ বেড়া বাঁধিতে সক্ষম করিয়াছ, ইহাই না বীর সাধককের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা! ইহাই না মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত শক্তিসেবকের অতুলনীয় ক্ষমতার জাজ্জল্যমান প্রমাণ! আর এ জন্যই না বীর সাধকের নিকট দেবদেবীর কোন ছলনা খাটে না। দেবী যখন প্রসাদের সহকারিরূপে অবস্থিতা, প্রসাদের তখন হৃদয়ভাব কিরূপ উপরে উঠিয়াছে; কি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছে—পাঠক! একবার তাহা অনুভব করুন। প্রসাদ গাহিতেছেন—

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখ্‌লে না মা তনয় ব'লে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতামাতা যেম্নি দাতা, তেম্‌নি দাতা আমায় হ'লে।
ভাড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সেজন তোমার পদতলে,
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।
জন্ম জন্মান্তরেতে মা কত দুঃখ আমায় দিলে,
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে ডাক্‌বো সর্ব্বনাশী ব'লে॥

গান গাহিতে গাহিতে ভক্তের ভক্তি-স্রোত হৃদয় হইতে উথলিয়া নয়ন-ধারারূপে বহিতে লাগিল—আর, ও কি ও! মায়েরও যে সজল নয়ন, চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত, বেটিও যে সজল নয়নে প্রসাদের প্রদত্ত দড়ি টানিয়া দিতেছেন, আর গানে বিগলিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন!

ওদিকে জগদীশ্বরী আহারাদি সারিয়া পিতার নিকট আসিতেছে দেখিয়া ভগবতী অন্তর্হিত হইলেন। কন্যা আসিয়া চমকিত হইয়া বলিল—"হ্যাঁ বাবা! তুমি এতখানি বেড়া একলা কেমন করিয়া বাঁধিলে গো? সব যে শেষ হ'য়ে গেছে, আর একটুখানি বাকী! প্রসাদের চমক ভাঙ্গিল; তিনি কন্যার ডাকে সাড়া দিয়া বলিলেন—"কেন মা। তুমিই ত সঙ্গে ছিলে; তবে আর একলা কেন?"

জগদীশ্বরী বলিল,—"না বাবা! আমি ত এতক্ষণ ছিলাম না, আমি যে ভাত খাইতে গিয়াছিলাম।"

প্রসাদ এইবার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। মায়ের কারসাজী দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, হায় হায়! বেটী এতক্ষণ কাছে ব'সে থেকে, এত কাজ

ক'র্‌লে—তথাপি একবার সাড়া দিলে না গা, ফাঁকি দিয়ে গান শুনে পালিয়ে গেল—উঃ। মা হয়ে একি ছলনা! এই বলিয়া গাহিলেন :—

মন কেন মায়ের চরণ ছ'ড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া
সময় থাকিতে না দেখ্‌লে মন, ছি ছি রে তোর কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে, বাধেন আসি ঘরের বেড়া।
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু-শেষে,
মোলে দু'চার দণ্ড কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত কেবল মাত্র মায়ার গোড়া,
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সর্ব্বস্ব করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চার কোণা মাঝখানে ফাড়া।
যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকা তারা,
বের হয়ে দেখ আসি কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাধ্‌ছে বেড়া॥

সেইদিন হইতে সংসারে আর তত লিপ্ত থাকিবেন না—প্রসাদ মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। সর্ব্বাণীও শুনিয়া অপ্রস্তুত হইলেন, তিনিই ত আজ স্বামীকে বৃথা কাজে নিযুক্ত করিয়া মাতৃদর্শনে বঞ্চিত করেছেন কিন্তু কি করিবেন উপায় ত নাই, বেটী যে এরূপ ভাবে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইবে—তাহা কে জানে? সর্ব্বাণীও ক্ষুণ্ণ হইলেন, তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন—কাজের জন্য স্বামীকে বিরক্ত করিয়া এরূপভাবে আর কখন তাঁহার ধর্ম্ম-পথের কণ্টক হইবেন না। প্রসাদের মনে কিন্তু দুঃখকষ্ট কিছুই হইল না, সদানন্দময় পুরুষ প্রসাদ গাহিলেন :—

পূর্‌লো নাকো মনের আশা।
(আমার মনের দুঃখ রইল মনে)
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম, সুখের আর কিবা ভরসা।
আমি ব'ল্‌ব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা।
রামপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনা দিশা।
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে, ঘট্‌লো আমার উল্টা দশা।

প্রসাদ বেড়া বাঁধিয়া দিয়া সেই দিনই সিদ্ধাসনে গমন করিলেন। দুই তিন দিন আবার সেই ভাবে, সেই মাতৃনামের ডঙ্কা বাজাইয়া প্রণিপাত সাধনায় ব্রতী হইলেন। ভক্তের কাছে ছলনা করিয়া বেটীর রক্ষা কোথায়, পলাইবার

স্থান কই? ভক্তের হৃদয় ছাড়া যে তাঁহার থাকিবার স্থান নাই, ভক্তের মধুমাখা মা বু'ল শ্রবণ ভিন্ন তাঁহার শ্রবণ-কুহর পবিত্র করিবার আর যে অন্য উপায় নাই। কাজেই সিদ্ধাসনের আসনে প্রসাদকে মাতৃযোগে বিব্রত দেখিয়া স্নেহময়ী আবার আসিলেন, প্রসাদ ভক্তির আবেগে আবার সেই ভবারাধ্য চরণ পূজা করিয়া ধন্য হইলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণচন্দ্রের স্বর্গারোহণ

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুক্ত পুরুষ ছিলেন। পৃথিবীতে যখন কলির প্রবল প্রতাপ প্রতিফলিত হইতে লাগিল, চারিদিকেই যখন অধর্ম্মের রাজত্ব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইবার উপক্রম হইল, ধাম্মিক প্রবর নদীয়াধিপতি তখন আর এ অনিত্য সংসারে অনিত্য দেহ ধারণ ক'রিয়া বিচরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়, বিবেচনা করিলেন—তজ্জন্যই তাঁহার দেহত্যাগের ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা না হইলে জীবের জীবন দেহ কেহ পরিত্যাগ করে না, সকলেরই ইচ্ছা মৃত্যু, তবে আমাকে তোমাকে করাল কৃতান্ত নানাবিধ যন্ত্রণারদ্বারা জোর করিয়া ইচ্ছা করাইয়া লইবে, আর যাঁহারা সাধক, সাধনায় যাঁহারা সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন—তাঁহারা স্ব-ইচ্ছায়ই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন। তাঁহাদের নিকট মৃত্যুপতির কোন ক্ষমতা খাটে না, মৃত্যু-ভয় তাঁহাদের সাধন-বদ্ধ, সুদৃঢ় হৃদয়কে তিলমাত্র কম্পিত করিতে পারে না। মৃত্যু-ভয় তাহাদের, যাহাদের অবিবেকী, নীচাশক্ত মন সতত সংসার-প্রেমে মুগ্ধ, যাহারা এই ভবরূপ পান্থ-নিবাসকে চিরবাসস্থান বলিয়া বিশ্বাস করে, হৃদয়-সিংহাসন যাহাদের সতত পাপ-পিশাচের দ্বারা অধিকৃত, যাহারা ভুলেও কখন আপন পবিত্র হৃদয়-রাজ্যে প্রেমময়ী মায়ের পদস্পর্শ হইতে দেহ না, মায়ের প্রতি যাহাদের তিলমাত্র বিশ্বাস নাই, তাহারাই মৃত্যুর ভ্রূকুটী দেখিয়া ভীত-চকিত হইবে, কৃতান্তের করাল-আস্য দেখিয়া তাহাদেরই হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে থাকিবে। কিন্তু সংসারাসক্তি যাহাদের নাই, যাহাদের মানসকুঞ্জর সতত প্রেম-ময়ীর প্রেমরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছে—তাঁহারা ত অহরহঃ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, মৃত্যুর সহিত ত তাঁহারা বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা ত সর্ব্বদা তাহার আলিঙ্গন

সুখে বদ্ধ হইতে ইচ্ছুক। তাঁহাদের মন-ভ্রমর, যে অম্লান-কুসুমের মধুপানের জন্য সতত লোলুপ, যাহার সুধাপান করিলে এই ত্রিতাপতপ্ত প্রাণ সুশীতল হয়—যে স্বর্গোদ্যানে সেই সুন্দর কুসুম চিরবিরাজিত, মৃত্যু ত সেই উদ্যান-পথে লইয়া যাইবার পথ-প্রদর্শক, কোন ক্রমে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেই ত সাধকের আশা সফল হয়—অনায়াসে সেই চিরবাঞ্ছিতের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারে।

সাধক কৃষ্ণচন্দ্র দেখিলেন—রাজ্যে আর শ্রেয়ঃ নাই, মর্ত্ত্যে যেরূপ ক্ষিপ্রগতিতে ধর্ম্মলোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এস্থানে আর সুখের আশা করা বৃথা, অতএব "কলির গতই ধন্য।" মহারাজ দেহত্যাগে স্থির সঙ্কল্প করিয়া বন্ধু-বান্ধব সকলকেই সংবাদ প্রদান করিয়া একে একে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি প্রাণের বন্ধু বৈদ্যকুলভূষণ রামপ্রসাদ এবং দানবীর বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজকে স্বভবনে আনয়ন করিয়াছেন, প্রত্যহ তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালাপে কালযাপন করিতেছেন, নানাপ্রকার ধর্ম্মমূলক উৎসবামোদের আয়োজন হইতেছে, সাধকেরা জানেন—আনন্দই হইল মা আনন্দময়ীর প্রিয়বস্তু, হৃদয় আনন্দময় করিতে পারিলেই আনন্দময়ীকে সহজে পাওয়া যায়, যাঁহারা সদানন্দময় পুরুষ তাঁহারাই সদানন্দময়ীর প্রিয়সন্তান। কোথায় মৃত্যুর জন্য দুঃখ করিবেন, এ সংসার একেবারে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া কোথায় নিরানন্দে চারিদিক ভরিয়া যাইবে, না তাহার পরিবর্ত্তে আনন্দ-উল্লাস, উৎসব-আমোদের আয়োজন। মায়ামুগ্ধ সংসারী ও মায়ামুক্ত সাধকের মৃত্যুতে এইটুকু মাত্র প্রভেদ! মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সহিত সাধক-শ্রেষ্ঠ প্রসাদের ইতিপূর্ব্বে কখন সাক্ষাৎকার হয় নাই, আজ মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র আনন্দময় পুরুষ সাধকপ্রবর রামপ্রসাদকে দেখিয়া, তাহার সহিত সঙ্গ ও আলাপ পরিচয় করিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ বৎসর শারদীয়া পূজার সময় আপন ভাবে বিভোর ছিলেন, প্রসাদকে লইয়া মাতৃ-আবাহনে প্রমত্ত হইয়া গত বৎসরের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাই কীর্ত্তিচন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই কীর্ত্তিচন্দ্র! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে গত বৎসর ৺পূজার জন্য দুখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলে—এ বৎসর তাঁহার কোন সন্ধান লইয়াছিলে কি? এবার তাঁহার পূজা কিরূপ ভাবে সমাহিত হইল?"

কীর্ত্তিচন্দ্র বলিলেন,—"ভাই! ধনমদে মত্ত হইলে যেমন হইয়া থাকে, এ বৎসর সেইরূপই হইয়াছিল, সাধারণ পূজা অপেক্ষা বিশেষত্ব তাহাতে কিছুই

ছিল না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দেবীর কৃপাদৃষ্টিও এ বৎসর হয় নাই, কেবল গোলমাল, কেবল তামসিক ব্যাপারের ছড়াছড়ি, ধনলাভে ব্রাহ্মণের উন্নতি না হইয়া বরং পতন হইয়া গেল। কাহার প্রতি যে মায়ের কিরূপ দয়া তা তিনিই জানেন, আমরা সামান্য তৃণ হইয়া সে মহীরুহের সংবাদ কেমন করিয়া রাখিব বল?

রামপ্রসাদ বলিলেন,—"কোন্ ব্রাহ্মণ মহারাজ?

কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন—"সেই যে ব্রাহ্মণের বাটীতে সে বৎসর মহারাজ ও আমি অতিথি হইয়াছিলাম, তখন ব্রাহ্মণের ভয়ানক দৈন্যাবস্থা কিন্তু বেটীর কৃপা সমধিক ছিল, তণ্ডুলকণা খাইয়াই মা আমার যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, এ বৎসর মহারাজের কৃপায় ধন প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহার কিছুই নাই সকলই তামসিক ভাবে সমাধা হইয়াছে।"

রামপ্রসাদের পূর্ব্ব বৎসরের সমস্ত কথা মনে পড়িল, তিনি ভাবে মগ্ন হইয়া গাহিলেন :—

তুমি এ ভাল ক'রেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না।
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেই আছি রাজি,
এবার এবাজী ভোর গো।
এমা দিতিস্ দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হ'লো না, মজুরি চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো।
আজ তুমি কোথা, আমি কোথা মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো,
এমা, ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কাজ তোর কঠোর।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, সুধা না পেলে চকোরে গো।
এমা আমি টানি কুলে, মন প্রতিকূলে, দারুণ করম ডোর,
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো॥*

রামপ্রসাদের ক্ষমতার বিষয়, তাঁহার অতুলনীয় প্রেমভক্তির বিষয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষ ভাবে অবগত আছেন, তিনি গান শুনিয়া কেবল অনবরত

* রাগিণী সোহিনী বাহার—একতালা

নয়নজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। আর মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র, তিনি ত মায়ের বরপুত্র রামপ্রসাদকে কখন দেখেন নাই, তাঁহার মধুমাখা গান ত কখন শ্রবণ করেন নাই, তিনি ভক্তি গদ্‌গদ্‌-চিত্তে প্রসাদকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"প্রসাদ! আজ আমার নদীয়ায় আগমন সার্থক হইল; তোমার মত অকপট মাতৃ-ভক্ত সাধককে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আজ আমি পবিত্র হইলাম। প্রসাদ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার মত ক্ষমতা আমার নাই, কারণ তুমি যাঁর বরপুত্র, আমরা তাঁরই পদতলে লুণ্ঠিত হইবার জন্য ব্যাকুল, তথাপি মায়ের নিকট প্রার্থনা করি—যেন তোমার মত ভক্তকে তিনি তিলেকের জন্য চক্ষুর অন্তরাল না করেন।

প্রসাদ অশ্রুভারাক্রান্ত মুদিত নেত্রে মহারাজকে অভিবাদন করিলেন।

আজ প্রায় পঞ্চদশ দিবস মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র ও সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ নদীয়াধিপতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কলির সাধকাগ্রগণ্য প্রসাদের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজ স্বয়ং যে কত সুখবোধ করিতেছেন—তাহা বর্ণনা করা যায় না। সৎসঙ্গ স্বর্গবাসের তুল্য, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রাণারাম সহবাসের মধ্যে একদিন একটু অসুস্থতা বোধ করিলেন, তিনি প্রসাদকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"প্রসাদ! সময় হইয়াছে,—মায়ের প্রিয়তম তুমি, মাকে আহ্বান কর, আমিও জপে বসিবার উপক্রম করি"—এই বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রজনীর গভীরতম যামে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গাহিলেন:—

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিনী।
না সরে নিশ্বাস-পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক, আ.জত এ তিন লোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে, তমোরজোতে ব্যাপীনী॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি!
দিয়া সত্য জ্ঞান বোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ মা বলে ডাকি জননী॥*

সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে, মহারাজের প্রাণপাখী ললিত রাগিণী যুক্ত সঙ্গীত-ধ্বনি করিতে করিতে পৃথিবীর গগন-পবনকে সুপবিত্র করিয়া চিরতরে মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। মহারাজের মৃত্যুর সময় তাঁহার শয়নপ্রকোষ্ঠ কি

* ললিত—আড়াঠেকা।

যে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ এবং গন্ধামোদিত হইয়াছিল, তাহা সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ ও মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ অনুভব করিতে পারে নাই। স্নেহময়ী মা যেন পুত্রের সমস্ত বিষাদ অবসাদ হস্ত সঞ্চালনে দূর করিয়া দিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

প্রাতঃকালে যখন মহারাজের মৃত্যু * সংবাদ চারিদিকে বিঘোষিত হইল, তখন আর কিছুই নাই, নাস্তিকাসিদ্ধ সাধক, বিপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্রের তখন সব শেষ হইয়াছে, ভবের লীলাখেলা সমস্ত শেষ করিয়া মাতৃভক্ত তখন ত্রিদিবেশ্বরীর ত্রিদিব রাজ্যে মাতৃপদতলে চলিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজের মৃত্যুতে বঙ্গদেশে শোকের প্রবল-ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গেল, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল, ভারত-গগনের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রপাতে দেশবাসীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের মস্তকে দারুণ বজ্রাঘাত হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কীর্ত্তিচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণভক্ত রাজা ভারতবর্ষে আর কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই, করিবেনও না। আজ তাঁহাদের মধ্য একটি ভারত অন্ধকার করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। সাধক রামপ্রসাদ মহারাজের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া যুথ-বিহীন কুরঙ্গের ন্যায় চকিতনেত্রে চারিদিকে অবলোকন করিতে করিতে বাটী ফিরিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ শোকদুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তখন মুসলমান রাজত্বের শেষ—ভারতে বিষম গোলযোগ উপস্থিত, তথাপি মহারাজের আদ্যকৃত বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের লোকান্তর গমনের পর হইতে ভারতীয়-নিত্য লীলাস্থল নবদ্বীপের নাম ক্রমশঃ লোপ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। যে দিনমণির প্রদীপ্ত-দীপ্তিতে দীপ্তমান হইয়া নবদ্বীপ কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষার মধ্যমণিরূপে ভারতে প্রভাজাল বিস্তার করিত, যাঁহার দানগৌরবে, জ্ঞান ও সাধন সৌরভে নদীয়ার এত খ্যাতি—এত প্রতিপত্তি, তাঁহার তিরোধানে এককালে সমস্ত লোপ পাইয়া গেল, আলোকময় ঘনান্ধকারে বেষ্টিত হইল।

---

* ১৭৮৫ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে মহারাজের দেহত্যাগ হইয়াছিল, ইনি প্রসাদ অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

উদাসপ্রাণে প্রসাদ

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর হইতে শ্রীরামপ্রসাদ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ আনন্দিত ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, এখন যেন তাঁহার মনে আর কোনরূপ বিষাদের ছায়াপাত হয় না। প্রসাদের এখন সকল বিষয়েই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইতে লাগিল, পূর্ব্বে যাহা হৃদয়কন্দরে গুপ্ত-ফল্গুর ন্যায় অন্তঃসলিলে প্রবাহিত হইত, যে ভাব সহজে কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, এক্ষণে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল, সকলেই বুঝিতে পারিল, সকলেই তাঁহার অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এখন হইতে অবিসংবাদিত চিত্তে সকলেই তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ, সাধকাগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিল, তাঁহার প্রতি আর কাহারও বিদ্বেষ-ভাব রহিল না। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র সকলেই প্রাণপণে তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার প্রতি অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল।

রামপ্রসাদ এখন অনবরত সকলের সঙ্গ করিতে লাগিলেন। যে কাছে আসে, সকলকেই ভগবান্ ভাবিয়া ভক্তিভরে আলিঙ্গন, কখন বা প্রণাম করিয়া পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী প্রসাদের এ আত্মভোলা—অহংজ্ঞান-শূন্য ভাব যে দেখিয়াছে, তাহারই চক্ষু সার্থক হইয়াছে। প্রসাদের সে সময়কার অবস্থা কেবল মা মা বলিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিবারই অবস্থা। তাই তিনি সদাই গাহিতেন :—

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে দুনয়নে পড়্‌বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে প'ড়্‌বো লুটে আমি তারা বলে হবো সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ ;
ওরে শত শত সত্যবেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে ;
ওরে আঁখি অন্ধ দেখনা মাকে, মা যে তিমিরে তিমির-হরা ॥ *

সাধক রামপ্রসাদের এই অবস্থা কি ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা নয়! এ অবস্থায়

* রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরী।

যে তাঁহার সর্ব্বভূতে সমান জ্ঞান হইবে, বিষ্ঠা-চন্দনে যে তিনি অপ্রভেদ দেখিবেন তাহার আর সন্দেহ কি? তবে ঠিক এইরূপ মনের অবস্থা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল। এই অবস্থাই না সাধকের সর্ব্বোন্নত তুরীয় অবস্থা! নতুবা ভাবের-ঘরে চুরি করিয়া কেবল মুখে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া আস্ফালন করিলে কি ফললাভ হইবে?

এ সময় রামপ্রসাদের সাধক ভাব, কখন বা ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ, কখন বা ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছেন, তখনকার সে কমনীয় ভাব লিখিয়া বুঝান অসম্ভব, চক্ষে দর্শন না করিলে মনের পরিতৃপ্তি সাধিত হয় না। সদাই সমাধি-প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া ভজহরি তখন সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত, এ অবস্থায় ভজহরিরও বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য সঞ্চয় আছে বলিতে হইবে, নতুবা সে এরূপ সাধক চূড়ামণির অন্তরঙ্গসঙ্গী হইয়া এরূপ সাধু-জীবন যাপন করিবে কেন?

এখন তাঁহাকে বেশী দূরে যাইতে দেওয়া হইত না, বাটীর নিকটবর্ত্তী স্থানে, না হয় সিদ্ধাসনে তিনি অহরহঃ কাল যাপন করিতেন, কেহ ডাকিতে আসিলে স্ত্রী-পুত্রেরা তাঁহাকে যাইতে দিতেন না। এই জন্য সকালে বিকালে অহরহঃ তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে বহুলোক সমবেত থাকিত, সকলেই তাঁহার দর্শনে নয়ন মন সার্থক করিতে আগমন করিত। যখন প্রসাদ বাহ্যিক চৈতন্য সম্পন্ন থাকিতেন, তখন শাস্ত্র বিষয় কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এমন সরল ও সহজভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, অতি বড় গণ্ডমূর্খেরও তাহা বোধগম্য হইত। কিন্তু এ অবস্থা খুব কমই পাওয়া যাইত। তিনি কখন খাইবেন, কখন না খাইবেন— তাহার স্থিরতা ছিল না, একদিন আহারে বসিয়াই হয়ত সমাধি-মগ্ন হইলেন। তখন পরম সৌভাগ্যবতী পতিপ্রাণা সর্ব্বাণী খুব সন্তর্পণে উচ্ছিষ্টাদি ধৌত করিয়া ধীরে ধীরে হাত মুখ ধুইয়া দিয়া করযোড়ে নিকটে বসিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন এবং মনে মনে বলিতেন—"না জানি আমি কত জন্মের পুণ্যবলে এ দেবতার চরণসেবার দাসী হইয়াছি,—প্রভু! দাসীকে দাসী বলিয়া দাসীর জন্ম সফল করিলে।" যে দিন স্বামীর সমস্ত দিন এইরূপ ভাব থাকিত, সে দিন সর্ব্বাণীও আহার করিতেন না, পুত্রকন্যাগণকে খাওয়াইয়া, সমস্ত দিন পতির পদতলে বসিয়া স্বর্গের সুষমা-দর্শন করিতেন।

দেহীর দেহ থাকিলেই তাঁহাকে আহার করিতে হয়, রোগ ভোগ মলমূত্র পরিত্যাগও দেহীর ধর্ম্ম; না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। তবে সাধারণ লোকের সহিত সাধকের অনেক প্রভেদ; সাধারণ লোক আহারের পরিমাণ অল্প হইলে কৃশ হইয়া যায়,—সময় উত্তীর্ণ হইলে চারিদিকে অন্ধকার দেখে। সাধকের তাহা নয়, তিনি যোগস্থ হইলে দুই তিন দিন নিরম্বু উপবাসে থাকিয়াও

কোন কষ্ট বোধ করেন না, দৈহিক সৌন্দর্য্যের লাঘব হয় না। রামপ্রসাদের একদিন সামান্য মাত্র জ্বরভাব হইয়াছিল, তাহার জন্য সর্ব্বাণী ভাবিয়াই অস্থির, ভজহরি প্রমাদ গণিতে লাগিল। প্রিয় বস্তুর সামান্য কষ্ট হইলে যেরূপ হইয়া থাকে, ইঁহাদেরও সেইরূপ হইল। রামদুলাল বলিলেন:—"বাবা! কোন কবিরাজ ডাকিব কি"? প্রসাদেরও ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"বাবা! কিছু আবশ্যক নাই, দুই তিন দিন আহার নিদ্রা ভাল হইতেছে না বলিয়া এরূপ হইয়াছে, চিন্তা কি?" এই বলিয়া গাহিলেন:—

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত্ব, মাঝে মাঝে ঐটী খাবা॥
সৌভাগ্য-খলতে ধুয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে, তবেই ত মম ভবরোগে মুক্তি পাবা॥

শুনা যায় এই গানের পর হইতে প্রসাদ আর কোন প্রকার পীড়ার কথা প্রকাশ করেন নাই বা তাহার পরের অবস্থা দেখিয়া কোনরূপ পীড়া হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় নাই।

একদিন রামপ্রসাদ প্রাতঃকালে বসিয়া মাতৃনাম গান করিতেছে; কাছে বসিয়া রামদুলাল পাঠ মুখস্থ করিতেছে, পুত্রকন্যাগণ খেলা করিতেছে, তথাপি সে কলরবে তাঁহার ভাব-সমাধির কোন প্রকার ব্যাঘাত হয় নাই; তিনি গাহিতেছিলেন:—

তারা দিলে না দিলে না দিন, তারা তারা ব'লে গেল সারাদিন।
নানা উপসর্গে দিন যায় মা দুর্গে, পরিবার-বর্গের প্রতিশোধি ঋণ।
গেলনা গেলনা, বিষয় বাসনা, হ'লনা হ'লনা তারা আরাধনা,
শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবে শবাসনা, রটেনা রসনা ভ্রমে একদিন।
রামপ্রসাদের এই অভিলাষ তারা, পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়ন-তারা।
সদানন্দে ভাসি সদানন্দ দ্বারা, নিরানন্দ কারায় রব কত দিন।

ভক্তি আর বিশ্বাসই পরম বল। মাকে পেয়ে আদুরে ছেলের মত যখন তখন তাঁহার কোলে উঠে, তাঁহার প্রসাদ লাভ ক'র্ত্তে হলে প্রসাদের মত অচল অটল বিশ্বাসী হওয়া চাই; প্রসাদের মত ভক্তিভরে মায়ের প্রতি জোর জবরদস্তি না ক'রলে মায়ের কৃপালাভ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। আজকাল আমরা ভক্তি কাহাকে বলে জানি না, বিশ্বাসের ধার দিয়াও যাই না, অথচ বড় সাধক হইতে যাই। লোকে আমায় বড় ধার্ম্মিক বলিবে—এই সাধ, কিন্তু এ আকাশ-কুসুম আশা কি কখন পূর্ণ হইতে পারে—না কাহার হইয়াছে?

"যে পুকুরে বেশী জল নাই—তাহার জল পান করিতে গেলে বেশী নাড়াচাড়া করিলে চলিবে না—তাহা হইলে জল ঘোলা হইয়া যাইবে, আর তোমার জল পান করা হইবে না! যাহার সামান্য পুঁজি, তাহার ভক্তিবিশ্বাস আয়ত্ত করিবার জন্য ধীরে ধীরে কাজ করাই উচিত; বেশী লাফালাফি করিতে গেলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। যার বেশী পুঁজি নাই তাহার পক্ষে বেশী তর্ক বিতর্কে কাজ হয় না; তাহা হইলে ক্ষুদ্র মন চঞ্চলা হ'য়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, মায়ের দিকে অগ্রসর হতে পারে না; মাকে পেতে হ'লে প্রথম তোমাকে তর্ক বিতর্ক ছাড়িয়া বিশ্বাসের প্রতি সুদৃঢ় হইতে হইবে। বিশ্বাস প্রবল হইলে কাজ শীঘ্র হয়। আত্মশক্তির নিকট অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, তিনি মনে করিলে সবই ক'র্ত্তে পারেন। এই জন্য সকল কাজে মনকে বিশ্বাসের জন্য প্রস্তুত ক'রে রাখ। বাতাসে জল নড়িলে যেমন তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না; সেইরূপ যুক্তি তর্করূপ বাতাসে মন চঞ্চল ক'রলে—তাতে ভগবান্ প্রকাশ হইবেন কেমন করিয়া? আমাদের মনের কিছু মাত্র দৃঢ়তা সংসাধিত হয় নাই। যখন নিশ্বাস-প্রশ্বাসে সে হেলিয়া পড়ে, তখন যুক্তি তর্কের বাতাস বহিলে কি আর রক্ষা আছে, বান্‌চাল হইয়া নিশ্চয়ই পড়িবে। এই জন্য মনঃস্থির করিতে হইলে কুম্ভকযোগের একান্ত আবশ্যক।

রামপ্রসাদদেবের মন এখন সর্ব্বদাই মায়ের কাছে কাছে ঘুড়িয়া বেড়ায়, সর্ব্বদাই মায়ের নাম জপমালা করে, মা ভিন্ন জগতে যে আর কিছু সার বস্তু আছে, তা সে বুঝিতেই পারে না, কাজেই সে সর্ব্বদাই মাতৃচিন্তায় বিভোর হইয়া থাকে—তাই তাহার এখন জাগতিক সমস্ত বিষয় ভুল হয়ে যায়, প্রসাদদেব এখন আর মনের জন্য অস্থির হন না, এখন আর তাঁহার মনকে সামান্য সাধকের মত অহরহঃ বলিতে হয় না—"ও মন! তোর পায়ে পড়ি, যা বলি তা শোন্, বিরলে বসিয়ে ভাব সেই শিবের সেবিত ধন।" এখন প্রসাদের মন ত সদাসর্ব্বদাই হর-মহিষীর চরণ-তলে বসিয়া আছে; মায়ের পাদপদ্মই ত এখন সে একমাত্র সার-সম্বল করিয়াছে, তাই এখন আর বৃথা কাজে ঘুরিয়া বেড়ায় না, প্রাসাদকেও আর তাহার জন্য চঞ্চল হইতে হয় না, পায়ে ধরিয়া তাহার এত সাধ্য সাধনা করিতে হয় না, এখন জগতে এমন কোন প্রলোভনের বস্তু নাই—যাহাতে প্রসাদের মন অস্থির ভাব ধারণ করিবে। তাঁহার সমস্ত অভাব-অভিযোগ, জাগতিক সমস্ত সুখ দুঃখ মিটিয়া গিয়াছে; মানুষ যাহা পাইলে আর কিছু পাইবার ইচ্ছা করে না, যাহা লাভ হইলে মন আর অন্য লাভালাভের প্রতি ধাবিত হয় না, প্রসাদের সেই পরম বস্তু যখন লাভ হইয়াছে, তখন আর

কোনরূপ চাঞ্চল্য আসিবে কেন ? 'তিনি এখন চিরস্থির, প্রশান্ত সাগরের ন্যায় নির্বাত নিষ্কম্প। প্রলোভনের সার বস্তু কামিনী-কাঞ্চন, যাহার তুল্য লোভনীয় বস্তু জগতে আর নাই—প্রসাদের নিকট সেই কামিনী-কাঞ্চন এখন অস্পর্শীয়রূপে পরিণত হইয়াছে। এখন জনশূন্য স্থানে প্রসাদদেব যখন একাকী বসিয়া থাকেন, তখন পাড়ার কত অসূর্য্যম্পশ্য-রূপা গৃহ-ললামভূতা যুবতী রমণী তাঁহার গান শুনিতে আসেন, তাঁহার যোগবিভূতি-পূর্ণ-দেহের সেবা করিতে বসেন—প্রসাদের তাহাতে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ থাকে না, তাঁহাদের প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিয়া দেখেন না ; কত লোক কত অর্থ, কত উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী, কত ভাল ভাল কাপড় লইয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিতে আসেন। সকলেরই মনের বাসনা—প্রসাদদেব যদি অনুগ্রহ করিয়া কিছু গ্রহণ করেন—তাহা হইলে কৃতকৃতার্থ হইবে। কিন্তু নিস্পৃহ, নিষ্কামী, ত্যাগী শ্রীরামপ্রসাদ তাহা তাকাইয়াও দেখেন না—স্পর্শ করাত পরের কথা। নির্জ্জনে যুবতী স্ত্রীলোক দেখিয়া যাঁহার চিত্ত চঞ্চল না হয়—এ জগতে তিনিই ত মহাপুরুষ, তিনিই ত যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসী ; নতুবা কেবল মাত্র গৃহ-ত্যাগ করিয়া ভাবের-ঘরে চুরি করিলে কি আর সাধু পুরুষ হওয়া যায়, না দুই একটা জ্যোতিঃ বা সিদ্ধাই লাভ করিলে সাধক হইতে পারা যায় ? এই সকল প্রলোভনের বস্তু ঠেলিয়া ফেলিয়া, যে যতদূর অগ্রসর হইতে পারে—সে তত উন্নত, সে তত সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

এখন প্রসাদের যে অবস্থা তাহাতে তিনি "মা, মা" ব'লেই জগত ভুলে যান ; আহার নিদ্রা তাঁহার মনে থাকে না, এমন যে প্রিয় দেহ, তাহারই রক্ষণাবেক্ষণে, তাহারই লালন-পালনে প্রসাদের ভুল হইয়া যায়। মা বলিতে তাঁহার নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। ইহাই না যথার্থ ভাবের-ঘরে স্থিতির অবস্থা, এই ভাবই না যথার্থ সাধকের ভাব—এইরূপ মহাভাব উপস্থিত হইলেই না হৃদয়কন্দরে প্রেমের প্রবল-বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকে ? এইরূপ অবস্থা পাইবার জন্যই জীবের যত সাধনা—ভজনা, যত যোগ-তপস্যা, যত ধ্যান-ধারণা। এই অবস্থায় উপস্থিত হইবার জন্যই মানবের জন্ম, ইহজীবনে ইহাই তাহাদের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু। যে দিন দেখিবে—মা মা বলিতে বলিতে তোমার তারা বহিয়া ধারা প্রবাহিত হইতেছে ; প্রেমাশ্রু-নীরে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে—সেই দিনই বুঝিবে তুমি সাধনার চরমে উঠিয়াছ, তোমার বাহ্যিক পূজা আহ্নিকের তখন আর আবশ্যক হইবে না।

কলির প্রেমময় সাধক, ভবভাবিনীর প্রিয়পুত্র রামপ্রসাদের এই অবস্থাই হইয়াছিল—তাই তিনি অহরহঃ গাহিতেন ;—

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥
তুমি পাষাণ মেয়ে, বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও মা কাচ।
উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক ক'রে ভাবে, তার কাছে মা কোথা বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল ছাঁচ।
তুমি সেই ছাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥

পাঠক! ইহাই না ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত; এই ভাব হইলেই না মাকে নিরাকাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধকের মতে নিরাকার অর্থে আকার-হীন নহে; সমস্ত বস্তুই মায়ের আকার, জগতে যাহা কিছু সমস্তই মা-ময়; তখন আর মায়ের অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, নয়ন যাহা দেখে—যাহা নয়ন গোচরীভূত হয়, তাহাই মায়ের মূর্ত্তি—মা ভিন্ন আর কিছুই নাই—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান, নতুবা মায়ের রূপ নাই, আকৃতি প্রকৃতি নাই, জ্ঞানীর সাধনা এরূপ হইতে পারে না—এবং সে জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান পদবাচ্য হইবার উপযুক্ত নয়। যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃসত্ত্বা অনুভব করেন—তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। প্রসাদের এই জ্ঞান হইয়াছিল—অতএব তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী। তবে তিনি যে সাধন-ভজন ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন—কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া দিয়া যে কেবল চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকেন—তাহা নহে; যতদূর পারিতেন কর্ম্ম করিতেন, তারপর যখন ভাবে বিভোর হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অচল হইত, সেই সময় বাধ্য হইয়া নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতেন, আর সেই মুদিত নেত্রযুগল হইতে অনবরত প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত। সাধকের এ ভাব যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে—রামপ্রসাদ কত উচ্চ অঙ্গের সাধক। মানবজন্ম এমন ভাবে অতি-বাহিত না হইলে কি আর মানব-জন্মের সাফল্য লাভ করিতে পারা যায়?

প্রসাদের এ ভাব দেখিয়া, কত লোক তাঁহার পদধূলি লইতে আসিত, এরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় তাঁহার পদধূলি লাভ করা সহজ হইত। কিন্তু প্রসাদ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলে আর কেহ তাঁহার পদধূলি লইতে পারিত না, কারণ তিনি সকলকেই মায়ের সন্তান বলিয়া জানিতেন, সকলের ভিতরে তাঁর মা ব্রহ্মময়ী বিরাজিতা রহিয়াছেন—দেখিতেন, তাই তাঁহার নিকট ছোট বড় ভেদজ্ঞান ছিল না। রামপ্রসাদের নিকট এখন আর লোকের অভাব নাই।

প্রতিদিন তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপ লোকে লোকারণ্য হইত ; প্রাতঃকাল হইতে অর্দ্ধেক রজনী পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত, সময় পাইলে সাধকের মুখে মধুমাখা উপদেশামৃত পান করিয়া সকলে কর্ণকুহর পবিত্র করিত। ভজহরি জাতিতে কর্ম্মকার হইলেও পরম ভক্ত, প্রসাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, অনবরত তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়া সেও এখন অনেকটা কাজের লোক হইয়াছে। প্রসাদ এখন আর তাঁহার সিদ্ধাসনে তত বেশীদিন যান না, কাজের দিন ব্যতীত তিনি ঘরেই অবস্থান করেন ; ভজহরিরও খুব সুবিধা হইয়াছে, আর সুবিধা হইয়াছে—পণ্ডিত তর্কভূষণের, তাঁহার এখন পাণ্ডিত্যাভিমান তিরোহিত হইয়াছে। প্রসাদের উন্নতির অবস্থা দেখিয়া তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন—লেখাপড়ায় কিছুই নাই, কেবল অহঙ্কার লাভ হয় মাত্র, প্রসাদের মত হইতে হইলে আগে মনকে গড়িয়া তুলা চাই। এইজন্য এখন তিনিও একপ্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

বৈদ্য জাতির উৎপত্তি

রামপ্রসাদের এমন অনেক সঙ্গীত আছে—যাহা "দ্বিজ" ভণিতাযুক্ত। রামপ্রসাদ বৈদ্য-বংশোদ্ভূত, তিনি "দ্বিজ" ভণিতা প্রয়োগ করিতে পারেন কি না —এ বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ হইতে পারে—অথবা তিনি সাধক বলিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে নিজের সঙ্গীতের শেষে ঐ "সিদ্ধ" শব্দ প্রয়োগ করিতেন কি না এ বিষয়েও অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন। এইজন্য আমরা এস্থলে ঐ সকল প্রশ্নের আবশ্যক মত মীমাংসা করিতে বাধ্য হইলাম। রামপ্রসাদের যে সকল গানে দ্বিজ ভণিতাযুক্ত আছে, অনেকে বলেন—তাহা বৈদ্যসাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীত নহে। ইহার উত্তরে আমরা বলি—ঐ সকল গীত বৈদ্যসাধক রামপ্রসাদেরই স্বরচিত। যদিও আমরা রামপ্রসাদ নামে আরও দুই তিন জন সাধকের সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি বৈদ্যসাধক রামপ্রসাদের মত উচ্চধরণের সাধক যে তাঁহারা ছিলেন না তাহা ঠিক, তবে তাঁহারা যে প্রসাদের সমসাময়িক এবং সাধনপথে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

রাণী ভবানীর পালক-পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—রামপ্রসাদ

ছিল, তিনিও একজন পরম মাভক্ত সাধক ছিলেন, রামপ্রসাদত্ব ব্রহ্মচারী নামে ইনিই ঢাকা জেলার অন্তর্গত চিনীসপুরের কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতেন। শুনা যায়—ইহা ছাড়া কলিকাতায় আরও একজন রামপ্রসাদ ছিলেন। ইহারা দুই জনেই ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব—এইজন্য সকলেরই বিশ্বাস, "দ্বিজ" ভণিতাযুক্ত প্রসাদী সঙ্গীতগুলি উহাদেরই মধ্যে কাহারও রচিত হইবে। ইহা ছাড়া পূর্ব্ববঙ্গে আরও একজন কবি রামপ্রসাদ ছিলেন। প্রসাদী সঙ্গীতের মধ্যে তাঁহারও অনেক সঙ্গীত অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; অথবা কেহ কেহ, সঙ্গীত রচনা করিয়া রামপ্রসাদের গান বলিয়া প্রচার করিলে লোকে আগ্রহের সহিত পড়িবে বা গান করিবে—বলিয়া তাহা রামপ্রসাদের সঙ্গীত-শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, এ সকল কথার মীমাংসা করা এখন সহজসাধ্য নহে; তবে বৈদ্যকুলতিলক রামপ্রসাদের সঙ্গীত যেরূপ ভাবময়—সেরূপ ভাব-সংযুক্ত সঙ্গীত সাধারণ লোকের মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইতে পারে না। রামপ্রসাদের গীতাবলীর মধ্যে যেগুলি লঘু-ভাবযুক্ত, তাহা ঘটনাক্রমে বা লোকের ইচ্ছাক্রমে রামপ্রসাদের সঙ্গীতের শ্রেণী ভুক্ত হওয়া যে অসম্ভব—তাহাও বলিতে পারি না। তবে দ্বিজভণিতাযুক্ত গান হইলেই যে আমাদের বৈদ্য-সাধক রামপ্রসাদের গান নয় এরূপ ধারণা কখন সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ বৈদ্যজাতি "দ্বিজ" শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন। তাঁহারাও ব্রাহ্মণের ন্যায় উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারেন—শাস্ত্র-সম্মত তাঁহারা এ বিষয়ে অধিকারী।

চিকিৎসা ব্যবসা প্রথমতঃ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই প্রচলিত হয়। ভগবান্ শঙ্কর দেবের অতিরিক্ত ভাগ আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের মনস্থ করিয়া প্রথমতঃ শুশ্রুত, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিগণকেই ইহার উপদেশ প্রদান করেন—ভগবান্ সদাশিব কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহারাই এই কার্য্য প্রথমে আরম্ভ করেন। শরীরী মাত্রকেই রোগ ভোগ করিতে হয়, এইজন্য প্রভু শঙ্কর রোগের সৃষ্টিও যেরূপ করিলেন, তাহার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদও তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে উপদেশ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাহাই করিতে লাগিলেন কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল, সাধনভজন-যোগতপস্যাদির ব্যাঘাত হইতে লাগিল। যাঁহাদের তপশ্চর্য্যায় পৃথিবীর যাবতীয় উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কার্য্যে এরূপ ব্যাঘাত হইলে চলিবে কেন? কাযেই বিপ্রগণ চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত চিকিৎসা বৃত্তি পরিচালনের জন্য আর একটি জাতির সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন। মহর্ষি গালব বৈশ্যকন্যা বীরভদ্রার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'পুত্রবতী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বৈশ্যকন্যা বলিলেন—"প্রভু!

আমার এখনও বিবাহ হয় নাই।" কিন্তু ঋষিবাক্য ত লঙ্ঘন হইবার নহে। তখন সমস্ত ঋষিগণ একত্র হইয়া একটি কুশপুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে প্রদান করিলেন এবং বীরভদ্রাকে বলিলেন —"মা! তুমি আর বিবাহ করিও না—এই পুত্রকে লইয়া পিতৃকুলে অবস্থান কর।" বীরভদ্রা অবনত-মস্তকে তাহাই স্বীকার করিলেন। ঋষিগণের বেদমন্ত্রে জন্ম বলিয়া—এই পুত্র বৈদ্য-জাতি হইলেন। ইনিই ধন্বন্তরি, ঋষির বরে জন্ম বলিয়া ইনি ব্রাহ্মণ সদৃশ হইলেন এবং মাতৃকুল লাভ করিয়া অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। ব্রাহ্মণের যাবতীয় আচার ব্যবহার ক্রিয়া-কলাপ সমস্ত প্রাপ্ত হইলেন; চিকিৎসা ইহার বৃত্তি মধ্যে নির্দ্ধারিত হইল। ব্রাহ্মণের ন্যায় শাস্ত্রাদি পাঠ, দশবিধ সংস্কার, উপবীত ধারণ, ঔষধ প্রস্তুত সময়ে যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি সমস্তই করিতে পারিবেন, কেবল সাধারণ পূজাদি কার্য্যে ইঁহাদের অধিকার থাকিবে না। এবং মাতৃকুলে অবস্থিত বলিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ইঁহাদের আদান প্রদান অর্থাৎ বিবাহাদি ও আহার-বিহার চলিবে না। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণে এইটুকু প্রভেদ। নতুবা তাঁহারা অপরাপর সমস্ত শাস্ত্রীয় কার্য্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমান অধিকারী।

বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রমাণ সত্য হইলে তাঁহারা দ্বিজ শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবেন না কেন এবং রামপ্রসাদও নিজ সঙ্গীতে দ্বিজশব্দ ব্যবহার করিয়া কি অন্যায় কার্য্য বা অহঙ্কারের পরিচয় দিয়াছেন? তিনি সামাজিক পূজাদি কার্য্যে, এমন কি নিজের গৃহ-পূজাদিতেও কখন ব্রাহ্মণগণের অমর্য্যাদা করিয়া নিজে পূজায় ব্রতী হইতেন না।

ভজহরির সহিত কথা প্রসঙ্গে যখন তিনি ব্রাহ্মণগণকে ভগবানের অবতার বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষভাব কোথায় এবং ব্রাহ্মণগণের মানহানি করিয়া দ্বিজপদ ব্যবহার করাই বা কিরূপে হইল? শাস্ত্রসঙ্গত তিনি দ্বিজপদ ব্যবহারের অধিকারী, ইহাতে তাঁহার ঋষিপ্রদত্ত অধিকার আছে। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ কখনও অনধিকার চর্চ্চা করেন নাই, করিতে পারেন না। তাঁহার হৃদয়ে কখন তমোভাবের উদয় হওয়াও সম্ভবপর নহে।

সকল জাতিরই নিজ ইষ্টসাধনায় এবং শিবপূজায় অধিকার আছে, অন্য পূজায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নহে। বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ হইলেও ইষ্টপূজা, শিবপূজা এবং ঔষধাদি প্রস্তুত বিষয়ে যে সকল পূজার আবশ্যক, তাহা করিতে পারেন, সাধারণ যাজনকার্য্যে তাঁহারা কাহারও পৌরোহিত্য করিতে পারেন না। চিকিৎসা-ব্যবসা তাঁহাদের ঋষিনির্দ্দিষ্ট, এই জন্যই তাঁহাদের

উৎপত্তি এবং তাঁহারা এই কার্য্যই করিবেন। ঔষধাদি প্রস্তুত এবং চিকিৎসা ব্যবসা করিতে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধান আছে, সে সকল তাঁহারা অবাধে শিক্ষা করিতে পারেন।

শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং প্রণবাদি উচ্চারণ তাঁহাদের পক্ষে নিষেধ নাই, কারণ তাঁহারা দ্বিজের সন্তান ত বটেন; তবে ক্ষেত্র স্বতন্ত্র বলিয়া অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভজাত বলিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহাদের পৌরোহিত্য করিবার অধিকার নাই। স্থানে স্থানে অনেকে এরূপ কার্য্য করেন বটে, কিন্তু তাহা যে অনধিকার চর্চ্চা তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। পৌরোহিত্য এবং গুরুগিরি ব্রাহ্মণগণেরই অধিকার ভুক্ত, অন্য কোন জাতি ইহার সংস্পর্শে আসিলে নিন্দনীয় এবং পাপার্জ্জন করিতে হয় এবং তুমি যতই পণ্ডিত এবং বিদ্বান্ হওনা কেন, পুরোহিত বা গুরু করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও করিতে পারিবে না, ইহা আবহমানকাল ঠিক এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাতে তাঁহাদের বিধিদত্ত অধিকার, তাহার অন্যথা করিতে যাওয়া আমাদের ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি বলিব?

সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ সাধক শ্রীরামপ্রসাদ কখন কি এইরূপ অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে পারেন? তবে তিনি গানের নীচে যে "দ্বিজ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার যে দোষ হইয়াছে বা কোন প্রকার তমোভাব প্রকাশ হইয়াছে, তাহা বলা অসঙ্গত। এই হেতু দ্বিজভণিতাযুক্ত পদাবলী যে সাধক-কবি রাম-প্রসাদের রচিত নয়, এরূপ ভ্রম-ধারণা বদ্ধমূল করাও কদাচ উচিত নহে। রাম-প্রসাদ অহঙ্কার বা তমোভাব হৃদয়ে কখন পোষণ করিতেন না। কারণ তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তি এরূপ ত্যাগী-ভক্ত হইতে পারে না, তমোগুণ সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের অন্তরায় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব সাধক-কবি রামপ্রসাদ তমোগুণের আধার হইলে কি এতাদৃশ আত্মোন্নতি করিতে পারিতেন, না তমোবিনাশিনী শিব-ঘরণীর এত প্রণয়পাত্র হইতে পারিতেন? তমোগুণে যে নাশ অবশ্যম্ভাবী।

বৈদ্যকুলপঙ্কজ শ্রীরামপ্রসাদের দয়া, সরলতা, কোমলতা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণে হৃদয়-ক্ষেত্র সমলঙ্কৃত ছিল, যথার্থ পুণ্যবান না হইলে, অমানুষিক গুণ-সকলের পরিস্ফুরণ না হইলে কি মানুষ এত শীঘ্র দেবত্বে উন্নতি লাভ করিতে পারে? রামপ্রসাদ কলির শ্রেষ্ঠ-সাধক। সকলের ধারণা নদীয়াচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গ দেহরক্ষা করিয়া শ্রীরামপ্রসাদরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তার পর শ্রীরামপ্রসাদ দেহরক্ষা করিয়া পূজনীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করিতে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবানই জানেন এ সকলের মূলে কতদূর

সত্য নিহিত আছে; তবে পৃথিবী যখন অধর্ম্মের আকার হইয়া উঠে, ধর্ম্মবিজ্ঞান যখন লোকের অন্তর হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করে, সেই সময় ভগবান্ এক একজন শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষকে জীবহৃদয়ে ধর্ম্মভাব পুনরুদ্দীপ্ত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন—হইতে পারে, ইঁহারা সেই উদ্দেশ্য সাধন মানসেই ধরাতলে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রসাদ যে পৃথিবীর অলঙ্কার এবং তাঁহার দ্বারা যে তান্ত্রিক-সাধনার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহার গানে যে অনেক বিপথগামী নাস্তিক পাষণ্ড সুপথে আসিয়াছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ

আজ সূর্য্যগ্রহণ হইবে, হিন্দুমাত্রেই গঙ্গাস্নানের জন্য ব্যস্ত, তাই আজ প্রাতঃকালে প্রসাদদেবের নিকট তত লোক সমাগম হয় নাই, কেবল ভজহরি ও তর্কভূষণ উপস্থিত আছেন, প্রসাদদেবকেও আজ বেশ বাহ্যজ্ঞান সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশামৃত পান-লোলুপ হইয়া উদ্গ্রীবভাবে অবস্থান করিতেছেন। এমন সময় প্রসাদদেব বলিলেন "হাঁ হে! আজ যে চাটুয্যে মহাশয়, বাঁড়ুয্যে মহাশয়, ইঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, ইঁহাদের পদার্পণে আজ গৃহ পবিত্র হইল না কেন বল দেখি?"

ভজহরি বলিল "ভাই! আজ সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের হুড়াহুড়ি বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা কেহ আসে নাই; স্নানাদির জন্য বোধ হয়—প্রাতঃকাল হইতে ব্যস্ত আছেন।

রামপ্রসাদ। তোমরা যাও নাই?

ভজহরি। বেলা দুইটার পর মুক্তিস্নান হইবে—প্রাতঃকাল হইতে সেখানে বসিয়া থাকিয়া ফল কি; ততক্ষণ বরং তোমার নিকট বসিয়া দুই চারিটা ভাল কথা শুনিলে, অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিব। বিশেষতঃ আজ তত লোকজন নাই, আর তুমিও বেশ বাহ্য-চৈতন্যে অবস্থান করিতেছ, অন্য সময় ত তোমার অবকাশ হয় না।

রামপ্রসাদ ভজহরিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং তিনি সময়ে সময়ে

তাহাকে সাধনার অনেক সুলভ-সন্ধান বলিয়া দেওয়ায়, সে এখন সাধন-বিষয়ে অন্য সকলের অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। আর না হইবে কেন, ভজহরি যে আপনার সমস্ত ভুলিয়া রামপ্রসাদের সমস্ত পরিবারকে আপনার করিয়া লইয়াছে, তাঁহাদের সুখ-দুঃখে ভজহরি যে সমান সুখ-দুঃখ অনুভব করে। রামপ্রসাদের পক্ষে ভজহরির ন্যায় আপনার জন আর কেহ নাই, আর ভজহরিও যে বাল্যকালে নিরাশ্রয় হইয়া এতাবৎকাল কেবল রামপ্রসাদের সংসার-সাগরেই হাবুডুবু খাইতেছে। রামপ্রসাদ যে তাঁহার আপনার হইতেও আপনার জন—ইহকালের আশ্রয়দাতা এবং পরকাল উদ্ধারের একমাত্র কারণ। যাহার সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, রামপ্রসাদ তাহার প্রতি সদয় না হইবে কেন? প্রসাদদেব ভজহরিকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন বলিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়কে যে কম ভালবাসেন—তাহা নহে। তবে তর্কভূষণ ব্রাহ্মণ আর ভজহরি শূদ্র, তাহার উপর অনেকটা জোর খাটে; তর্কভূষণ যখন প্রসাদের বিপক্ষ ছিলেন, প্রতিযোগিতায় কাজ করিয়া যখন তাঁহাকে অপদস্থ করিতেন, তখনও তাঁহাকে তিনি যেমন ভালবাসিতেন আর এখনও তেমন। প্রসাদের শত্রু-মিত্রে সমভাব—তাই সময়ে তর্কভূষণকেও দুই একটা প্রাণের কথা বলিয়া দিতেন। তজ্জন্যই পণ্ডিত তর্কভূষণ এখন প্রসাদের বড়ই বশম্বদ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে সাধকাগ্রগণ্য বুঝিয়া গুরুর মত মান্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তর্কভূষণ বলিলেন, "আচ্ছা ভাই প্রসাদ! তান্ত্রিক সাধনায় সময়ে সময়ে আমার অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয়; তান্ত্রিক সাধনা দেখিতে গেলে প্রবৃত্তি-মূলক, মহা প্রলোভনময়, ইহাতে আশু ফললাভের আশা কেমন করিয়া সম্ভব, এজন্য এ বিষয়ে সময়ে সময়ে আমার বড়ই বিরক্তি আসে! ভাই আমার ন্যায় অজ্ঞকে এ বিষয়ে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও দেখি।"

রামপ্রসাদ। ভাই! সাধনা কি বুঝাইবার জিনিষ? কার্য না করিলে মৌখিক বুঝাইতে যাওয়ায় কোন ফল নাই। কার্য্য করিতে করিতে, মা তোমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। তোমার কার্য্য তুমি কর, ফল দানের বেলা, সন্দেহ নিরাকরণের বেলা মাকে ডাকিও; তাহা হইলে সমস্তই সহজে বুঝিতে পরিবে। মা না বুঝাইলে—তিনি স্থিরবুদ্ধি না দিলে, এ জগতে কাহার সাধ্য যে দুরধিগম্য বিষয় সহজে বুঝাইয়া দিতে পারে?

পণ্ডিত। হাঁ ভাই! এ কথা ত খুব ঠিক, কিন্তু আমাদের তত বিশ্বাস নাই ব'লে, সর্ব্বদাই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই তোমাকে সময়ে সময়ে বিরক্ত করি।

রামপ্রসাদ। মায়ের কথায়—সাধন-ভজন প্রসঙ্গে আবার বিরক্তি কি? তবে আমি গুরুদেবের নিকট যৎসামান্য শুনিয়াছি—তাহা বলিতেছি—শুন।

পণ্ডিত। বল ভাই বল, তোমার বাক্য শুনিলে আমার সন্দেহ যত দূরীকরণ হইবে, তত আর কাহারও কথায় হইবে না।

রামপ্রসাদ। দেখ ভাই! অনেকের বিশ্বাস—তন্ত্রশাস্ত্রটা আধুনিক, কোন ঋষির স্বকপোলকল্পিত ভাব। যাহারা এ ভ্রান্তবিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়াছে, তাহারা অতীব মূঢ়। তন্ত্রশাস্ত্র সাম ও অথর্ব্ববেদ হইতেই আবির্ভূত; ব্রহ্মজ্ঞানরূপ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, ইহা সোপান স্বরূপ। মকার-উপাসনা ব্যতীত চিত্তশুদ্ধির উপায় নাই—সগুণভাব ব্যতিরেকে ধ্যান-ধারণা হইতেই পারে না। সমুদ্র-নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন সমুদ্রস্থিত জল অবলম্বন করিয়াই সন্তরণ পূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমরাও এই গুণ ভিন্ন কিছুতেই এ সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। এই জন্য ভগবান্ সদাশিব কলিতে আশু মুক্তিপ্রদ এই তান্ত্রিকসাধনার প্রচলন করিয়াছেন। ইহাতে অতি শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

পণ্ডিত। আচ্ছা ভাই! তান্ত্রিক-সাধনা কলির জীবের পক্ষে কিরূপ ফলপ্রদ হইবে? কলিতে পশু ও দিব্যভাব নাই বলিলেই হয়, কেবল বীরভাব, তন্ত্র ইহার সাধনে পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কলিকালের মনুষ্যেরা লুব্ধ এবং শিশ্নোদরপরায়ণ, তাহারা পঞ্চতত্ত্ব লোভে পড়িয়া, কেবল তাহারই বশীভূত হইবে—সাধনার ধার দিয়াও যাইবে না। ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থের জন্য অল্পায়ু, অন্নগতপ্রাণ কলির জীব সতত ব্যস্ত; অতিরিক্ত পানদোষে দূষিত হইয়া তাহারা দুষ্কর্ম্ম-প্রবৃত্ত, ক্রূর ও ধর্ম্মপথ বিলোপকারী হইবে, এ ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে এই প্রলোভনময়, প্রবৃত্তিজনক সাধনা কিরূপে সম্ভবপর, প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিলে ত প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে, নিবৃত্ত হইবে কেমন করিয়া, আর নিবৃত্তি লাভ না হইলে ত ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইবে না। তন্ত্রে প্রবৃত্তিরই উত্তেজনাকর উপদেশ সকল সন্নিবিষ্ট, অতএব ইহা কিরূপ সাধনা? একেত প্রবৃত্তির দমন করাই অতীব দুঃসাধ্য, ধর্ম্মে নিষেধ থাকিলে বরং লোকে ভয়-প্রযুক্ত উহাকে দমন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু শাস্ত্রই যদি উহাতে উৎসাহ প্রদান করে, তবে আর নিবৃত্তির উপায় কি?

রামপ্রসাদ। ভাই! প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তির দ্বারাই নিবৃত্ত করা প্রয়োজন—নতুবা দুর্দ্দমনীয়, অগ্নিসদৃশ এ প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া নিবৃত্ত করিতে গেলেই, এক সময়ে তাহা নিজে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমার প্রাণসংহার করিবে। ক্রূর

সর্প তোমাকে মুখব্যাদনপূর্ব্বক দংশন করিতে আসিতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষে একমুষ্টি মন্ত্রপূত ধূলি নিক্ষেপ না করিলে আর উপায় কি? প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, তাহাকে প্রবৃত্তির দ্বারা রোধ না করিলে, নিবৃত্তি সহজে আসিতে পারে না। তবে নিবৃত্তি করিব বলিয়া দৃঢ়চিত্তে প্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, নতুবা কেবল স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে হইবে না।

পণ্ডিত। প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে সে ত বাড়িয়াই যাইবে, সাম্যভাব কেমন করিয়া ধারণ করিবে?

রামপ্রসাদ। সে কথা ঠিক, কিন্তু যথার্থ নিবৃত্তি না হইলে, জোর করিয়া দমন করিয়া রাখিলে, সেই প্রবৃত্তি এক সময় না এক সময়ে তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তির দ্বারা নিবৃত্তি করিলে, তাহাই ঠিক নিবৃত্তি হইল। এই যে আমরা বহু নিবৃত্তিশালী, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন লোক দেখিতে পাই, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ভোগ-লালসা চরিতার্থ করিয়া লইয়াছেন, তাই এরূপ হইতে পারিয়াছেন, ভোগ না করিলে, ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত না হইলে নিবৃত্তি আসিতে পারে না।

পণ্ডিত। এ কথা কি ঠিক? আমার যেন কেমন সন্দেহ ঠেকে, ভোগেতেই ত আসক্তি বৃদ্ধি হইবে।

রামপ্রসাদ। বৃদ্ধি হইলেও ত তাহার একটা সীমা আছে, নিবৃত্তির জন্য ভোগ করিতেছি, ঠিক এভাব যদি তোমার অন্তরে বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে নিবৃত্তি নিশ্চয়ই আসিবে। তুমি মনে কর, একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছ, সেখানে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যের আয়োজন হইয়াছে। সকলের সহিত তুমি আহার করিতে বসিয়াছ। কিন্তু তোমার অর্দ্ধেক ভোজন হইতে না হইতেই যদি তোমাকে তুলিয়া দেওয়া হয়, আর খাইতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তোমার মন কেমন খারাপ হয় বল দেখি? তখন হয় ত তুমি নিবারণ-কর্ত্তাকে মারিতে উদ্যত হইবে, অথবা অক্ষম হইলে উঠিয়া আসিবে কিন্তু তোমার প্রবৃত্তি হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিল, হয়ত তাহার দ্বারা তুমি মরণের মুখে উপস্থিত হইতে পার, সেই অপূর্ণ খাইবার ইচ্ছা এক সময়ে না এক সময়ে তোমাকে বিপদে ফেলিতে পারে, সেই সকল দ্রব্য আকণ্ঠ উদরস্থ করিয়া এক সময় হয় ত তুমি ভয়ানক ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িবে, কিন্তু যদি তোমাকে সেই সময় সেই সমস্ত উপাদেয় দ্রব্য পরিতৃপ্তির সহিত আহার করাইয়া উদরপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইত এবং তার পর যদি বলা হইত "মহাশয়? যে দ্রব্য খাইলেন, তাহা অপেক্ষা আরও উপাদেয় দ্রব্য আনিয়াছি, একটী গলাধঃকরণ করুন, একটী খান্।" তখন তুমি স্বয়ংই

হাত নাড়িয়া বলিবে—"আর না মহাশয়! আমার যথেষ্ট হইয়াছে। পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছি, আর আমার উদরে তিল পরিমাণ দ্রব্য ধরিবার স্থান নাই।" এত যে ভাল জিনিষ—যাহা তুমি চক্ষে কখন দেখ নাই, সেরূপ দ্রব্যও তুমি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিতে পার, কারণ তখন তোমার ভোজনে তৃপ্তি হইয়াছে, ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছে, তাই তোমার সে উপাদেয় বস্তু ত্যাগ করিবার শক্তি জন্মিয়াছে। তখন ক্ষুধার অপগমে, না খাইবার যে একটা প্রবল শক্তি তুমি পাইয়াছ—তাহাই যথার্থ নিবৃত্তি। ভোগ করিয়াই না এ নিবৃত্তি তোমার উপস্থিত হইয়াছে, এই জন্য শাস্ত্র বলেন—নিবৃত্তি করিব বলিয়া ধর্ম্মভাবে ভোগ কর, তাহাতে যে নিবৃত্তি আসিবে—তাহার আর পতন হইবে না।

পণ্ডিত। হাঁ ভাই, এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার যে ভুল ধারণা এতদিন ছিল, এক্ষণে তাহার অপনোদন হইল।

রামপ্রসাদ। তান্ত্রিক সাধনায় যে পঞ্চমকার দেখিতেছ, ভোগের দ্বারা নিবৃত্তি আনয়ন করাই ইহার উদ্দেশ্য;—আর ভোগের দ্বারা নিবৃত্তি করাই জীবনের সাধনা, নতুবা তোমাকে একটী নির্জ্জন অরণ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথায় ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থের কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয় মহাসাধু; কিন্তু তোমার ভোগবাসনা চরিতার্থ হয় নাই, তখনও সম্ভোগ-লালসা তোমার অতিশয় বলবতী, কেবল একটা দায়ে পড়িয়া ভোগ সুখ বিমুখ হইয়াছে মাত্র। এই মনে কর—স্ত্রীসম্ভোগ লালসা, যদি তোমার প্রবৃত্তি দ্বারা উহার চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে—এবং সে বিষয়ে তুমি যদি যথার্থ ত্যাগী হইয়া ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া থাক—তাহা হইলে তুমি নির্জ্জনেই থাক আর গৃহেই থাক, তোমার নিকট সুন্দরী অপ্সরাও প্রত্যাখ্যাত হইবে—তুমি তাহার প্রতি ভুলেও তাকাইবে না; ইহাই তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য। এরূপ নিবৃত্তি মার্গের সাধকের আর পতনের সম্ভাবনা নাই, তাহারা বীরের ন্যায় এ অবনী-মণ্ডলে বিচরণ করতে পারে।

পণ্ডিত। ভাই! এখন তোমার কথায় আমার চৈতন্য হইল, এতদিন আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম।

রামপ্রসাদ। তন্ত্রের ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—এ ধর্ম্মে সকলেই প্রবেশ করিতে পারিবে, ইহার সুশীতল ছায়ার আশ্রয়ে অতিবড় পাষণ্ডও সুশীতল হইতে পারিবে। পুণ্যাত্মা ইহার আশ্রয় পাইবে আর পাপী পাইবে না—এ ধর্ম্মে তাহা নাই, মায়ের নিকট সব ছেলেই সমান। তুমি নিরামিষ আহার করিতে পার না,

আমিষ তোমার অতিশয় প্রিয়, তাই বলিয়া কি, তুমি বাদ যাইবে—ধর্ম্ম করিতে পারিবে না—তোমার গতি-মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে। আগমশাস্ত্র তোমাকে আহ্বান করিতেছেন—আইস জীব! সদাশিব প্রদত্ত তান্ত্রিক বিধানানুসারে ধর্ম্মে আস্থাবান হও, ভোগ-মোক্ষ করতল-গত করিয়া উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে। কলিতে তন্ত্রোক্ত বিধানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা লঙ্ঘন করিয়া অন্য পথাবলম্বী হইলে তাহার সদ্গতি হয় হয় না। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কলিতে সুসম্পন্ন হইতে পারে না—তাহার কারণ দ্রব্যের অভাব, উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব, উপযুক্ত সময়ের অভাব। তুমি অনন্যোপায় হইয়া ভক্তবৎসলা মাকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিয়া শিবোক্ত তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হও, অচিরে তোমার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইবে, মঙ্গলময় পন্থা অচিরে তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হইবে—সাধক! তুমি ইহ জন্মেও ধন্য হইতে পারিবে। উদ্দাম প্রকৃতি, যাহা কিছুতেই বশ মানে না, মদ্য মাংসে যাহার অত্যন্ত রুচি, সংযতভাবে তুমি দেবোদ্দেশে নিবেদিত করিয়া তাহার পান ভোজন কর, দেখিবে এতদিন যে উদ্দাম-প্রকৃতি বশে থাকিত না, উচ্ছৃঙ্খলভাবে নাকফোঁড়া বলদের মত তোমাকে টানিয়া লইয়া বেড়াইত, অতিশীঘ্র আবার সে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে, তাহার সে ভীষণতা আর থাকিবে না। তাই যুগধর্ম্ম অনুসারে কৌলিক ক্রিয়াই কলিতে প্রশস্ত। কিন্তু তুমি যদি জন্মান্তরের সুকৃতি অনুসারে এ সকলের হাত এড়াইয়া থাক—তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই, কলি তোমার কিঙ্কর থাকিবে।

পণ্ডিত। আচ্ছা! কলিতে সকলেই ত তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিতে পারে?

রামপ্রসাদ। তান্ত্রিক সাধনা কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ নাই, আপামর সাধারণ স্ত্রী পুরুষে ইহার অনুষ্ঠান করিবার অধিকার সদাশিব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। তবে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাখিবার জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈদিক ক্রিয়াও করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে—ইহাও শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পণ্ডিত। কিরূপ ভাবে সুরা-সেবন শাস্ত্রসিদ্ধ?

রামপ্রসাদ। তান্ত্রিক ক্রিয়ায় কুলস্ত্রীগণের পক্ষে মদ্যপান একেবারে নাই, গন্ধ গ্রহণ মাত্র ব্যবস্থা, আর পুরুষগণের পক্ষে পঞ্চপাত্র পরিমিত শোধিত সুরাপান নিয়ম, অতিরিক্ত পান করিলে পতিত হইতে হয়। ইহাতেই বুঝিয়া দেখ, যে সকল দুর্ব্বৃত্ত লোক ধর্ম্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অজস্র মদ্যপান করিত, তাহারা যদি

ধর্ম্মপথে আসিয়া এরূপভাবে মদ্যপান করে, তাহা হইলে তাহাদের নিবৃত্তির পথ কত সহজ সাধ্য হইল।

পণ্ডিত। এ ক্রিয়ার কি কালাকাল আছে?

রামপ্রসাদ। যাহাদের সাধনাই কাজ, তাহারা তান্ত্রিকসাধনার নির্দ্দিষ্ট দিবসে অর্থাৎ মাসের প্রথম দিন, বৎসরের প্রথম দিন, অমানিশা, অষ্টমী, শনি, মঙ্গল প্রভৃতি বারে আর গৃহিগণ কেবল মাত্র শনি ও মঙ্গলবারে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী হইলে পঞ্চমতত্ত্ব অর্থাৎ মৈথুন বাদ দিয়া অপর চারি তত্ত্বের দ্বারা জগন্ময়ীর পূজা করিবে এবং স্থির-চিত্ত হইয়া মহানিশায় দশসহস্র বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে মঙ্গল সাধিত হয়। কলিতে পঞ্চম তত্ত্ব পরিবর্জ্জন করিতে শাস্ত্র বলিয়াছেন।

পণ্ডিত। কুলাচার কাহাকে বলে আমাকে বুঝাইয়া দাও।

রামপ্রসাদ। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্‌, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, বায়ু এই নয়টি কুল বলিয়া অভিহিত। এই জীবাদি নবসংখ্যক কুলে ব্রহ্ম-বিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা নানা কল্পনাশূন্য যে আচরণ—তাহাই কুলাচার। এই কুলাচার দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা তপস্যা, দান ও দৃঢ়ব্রতাদি দ্বারা জন্মজন্মান্তরে বহুপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন—সেই সকল পাপহীন সাধকেরই কুলাচারে মতি জন্মায়। বুদ্ধি কুলাচার গত হইলে মালিন্য শূন্য হয় এবং অচিরে আত্মা কালিকার চরণ-কমলে আসক্তি-যুক্ত হয়।

পণ্ডিত। আচ্ছা ভাই! যাহার মদ্যগ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি নাই—যাহার যথার্থ নিবৃত্তি হইয়াছে, সে কি করিবে?

রামপ্রসাদ। তিনি ত অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে দুগ্ধ, চিনি ও মধু এই তিন দ্রব্য একত্রে মদ্য স্বরূপ মনে করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন করাই বিধি।

পণ্ডিত। কলিতে অন্য তত্ত্বের বিষয় কিরূপ বল।

রামপ্রসাদ। কলির মনুষ্যদিগের বুদ্ধি অতি সামান্য, তাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই উদ্‌ভ্রান্ত, এইজন্য কলিতে শেষ-তত্ত্ব শাস্ত্র-নিষিদ্ধ—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহার প্রতিনিধিস্থলে দেবীর চরণ-কমল ধ্যান ইষ্টমন্ত্র জপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তারপর মাংস প্রভৃতি উপস্থিত তত্ত্বের প্রত্যেক তত্ত্ব (আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা) এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবীকে নিবেদন করিয়া এবং সমস্ত ব্রহ্মময় ভাবিয়া পান-ভোজন করিবে।

পণ্ডিত। আচ্ছা ভাই! ওঁকার উচ্চারণ করা শূদ্রের নিষিদ্ধ কেন এবং তাহার স্থলে তাহারা কোন্‌ বীজ উচ্চারণ করিবে?

ভজহরি এতক্ষণ অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু প্রণব বিচারের কথা শুনিবার জন্য সে পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

প্রসাদ বলিলেন—"যে সকল লোক মন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারে, লক্ষ জপেও তাহাদের কোন ফল হয় না। প্রণব ব্রহ্ম বীজ—ইহার তুল্য বীজ আর কিছুই নাই—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে ইহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারে না—এইজন্য ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকৃত, প্রাণায়াম যোগে যাঁহাদের ভিতরে ওঁকার নাদ হয়, তাঁহারাই ঐ বীজ ধারণের উপযুক্ত ব্যক্তি, নতুবা শুধু অক্ষরটি উচ্চারণ করিয়া ফল নাই, করিলে দোষও নাই, তবে যখন শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন, তখন মানিয়া চলা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য। ওঁকারের শক্তি সহজ নহে, শাস্ত্র বলিতেছেন :—'অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ।' অ, উ, ম এই তিন অক্ষরে (ওঁ) প্রণব হইয়াছে, অকারের অর্থ বিষ্ণু, উকারের অর্থ মহেশ্বর, আর মকারের অর্থ ব্রহ্মা; এই ওঁকার দ্বারা সৃষ্টি, ও প্রলয় কর্ত্তা অভিহিত হইয়াছেন। গোরক্ষসংহিতায় কথিত আছে :—'ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী। ত্রিধাশক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি।' ব্রহ্মশক্তি গৌরী, ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মী, এবং জ্ঞানশক্তি বৈষ্ণবী—ওঁকারে এই শক্তিত্রয় সংযোজিত, অতএব ইহা আয়ত্ত করা কি যে সে লোকের কাজ ?

পণ্ডিত। আচ্ছা, অন্য জাতি তবে কিরূপ বীজ সংযুক্ত করিয়া পূজাদি করিবে ?

রামপ্রসাদ। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীর অগ্রে "ওঁ", ক্ষত্রিয়গণ "শ্রীঁ", বৈশ্যগণ "ঐঁ" সন্নিবেশিত করিয়া কলিতে পাঠ করিবে। শূদ্রগণ মায়া বীজ "হ্রীঁ" বলিতে পারেন।

ভজহরি। আচ্ছা ভাই! সন্ধ্যা আহ্নিকের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, কি করা কর্ত্তব্য ?

রামপ্রসাদ। তাহা হইলে উক্তরূপ নির্দ্দিষ্ট বীজমন্ত্রে তৎসৎব্রহ্ম বলিয়া বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা আহ্নিক সম্পাদন করিবেন। দ্বিজাতিগণ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশবার গায়ত্রী ও জপ করিবে, গৃহস্থের পক্ষে সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া অপর কার্য্যে মন দিবে না। অভাবে ইষ্টমন্ত্র জপ অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভজহরি। আচ্ছা ভাই! তান্ত্রিক গায়ত্রী এবং ব্রহ্ম গায়ত্রীর পার্থক্য কি, একবার বুঝাইয়া দাও না।

রামপ্রসাদ। উভয়েই প্রায় এক, উভয় গায়ত্রীই ত্রিসন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে জপ করিতে হয়। সময় ও গুণ ভেদে ইহা ত্রিমূর্ত্তি। প্রাতঃকালের গায়ত্রী ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মী; ইনি রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা এবং কুমারী, পরিধানে কৃষ্ণাজিন ও হংসের উপর অবস্থিতা, একহস্তে কমণ্ডলু পূর্ণ তীর্থোদক আর একহস্তে মালাধৃতা। মধ্যাহ্নে পালনীশক্তির ধ্যান অর্থাৎ বৈষ্ণবীশক্তির ধ্যান করিতে হয়। ইনি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা শ্যামবর্ণা ও চারিহস্ত যুক্তা, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চারিহস্তে শোভিত, গরুড়ের উপর উপবিষ্টা পীনস্তনী যুবতী। সায়ংকালে সংহারশক্তি মহেশ্বরীর ধ্যান করিতে হয়—ইনি বৃষাসনে সমারূঢ়া, শুক্লবসন-পরিধানা, শ্বেতবর্ণা—ত্রিনয়ন বিশিষ্টা; চারিহস্তে বর, পাশ, শূল ও নৃকপালধৃতা, বৃদ্ধা, বিগতযৌবনা। ধ্যান করিবার সময় বলিতে হয়—"আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ দেবী (নিজ ইষ্ট দেবীর নাম) প্রচোদয়াৎ।" অর্থাৎ আমরা আদ্যা পরমেশ্বরীকে পাইবার জন্য যাঁহাকে ধ্যান করি এবং যাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, সেই জগৎ কারণ-স্বরূপ অমুকী দেবী আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পক্ষে বিনিযুক্ত করুন। তারপর জপ করিবার মন্ত্র—"স্ত্রীঁং হ্রীঁং শ্রীঁং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকে হ্রীঁং শ্রীঁং ক্রীং স্বাহা।" এই সমস্তই একটী মন্ত্র; প্রতিদিন এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত বার জপই বিধি, অভাবে দশবার। বীজের পূর্ব্বে বুধ বীজ স্ত্রীঁং আর ব্রাহ্মণ হইলে ওঁ কার যোগ করিতে পারেন। ইহার পর আদ্যাদেবীর স্তোত্র পাঠ করিবেন।

ভজহরি। ভাই! স্তোত্র কিরূপ একবার বলিয়া দাও, আমি তাহা অদ্যাবধি আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

রামপ্রসাদ।—আমি তন্ত্রোক্ত মহাকালীর স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

হ্রীং কালী শ্রীং করালী চ ক্রীং কল্যাণী কলাবতী।
কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা॥
কালিকা কালমাতা চ কালানলসমদ্যুতি।
কপর্দ্দিনী করালাস্যা করুণামৃতসাগরা॥
কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা।
কৃশানুকপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী॥
কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচনী।
কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী॥
কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া।
কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী॥

কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী।
কদম্ব-পুষ্পসন্তোষা কদম্ব-পুষ্পমালিনী॥
কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিনাদিনী।
কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া॥
কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমাল্যধারিণী।
কমলাসনসন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী॥
কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী।
কলহংসগতিঃ ক্লৈব্যনাশিনী কামরূপিণী॥
কামরূপকৃতাবাসা কামপীঠবিলাসিনী।
কমনীয়া কল্পলতা, কমনীয়বিভূষণা॥
কমনীয়গুণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী।
কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা॥
কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চ্চনহর্ষিতা।
কারণার্ণবসংমগ্না কারণব্রতপালিনী॥
কস্তূরীসৌরভামোদা কস্তূরীতিলকোজ্জ্বল।
কস্তূরীপূজনরতা কস্তূরীপূজকপ্রিয়া॥
কস্তূরীদাহজননী কস্তূবামৃগতোষিণী।
কস্তূরীভোজনপ্রীতা কর্পূরচন্দনোক্ষিতা॥
কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী।
কর্পূরসাগরাস্নাতা কর্পূবসাগবালয়া॥
কূর্চ্চবীজজপপ্রীতা কূর্চ্চজপপরায়ণা।
কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিণী॥
কুলাচারা কৌতুকিনী কুলার্গপ্রদর্শিনী।
কাশীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশবরদায়িনী॥
কাশীশ্বরকৃতামোদা কাশীশ্বরমনোরমা।
কলমঞ্জীরচরণা ক্বণৎকাঞ্চীবিভূষণা॥
কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা, কাঞ্চনাচলকৌমুদী।
কামবীজ জপানন্দা, কামবীজস্বরূপিণী॥
কুমতিঘ্নী কুলীনার্ত্তিনাশিনী কুলকামিনী।
ক্রীং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী॥

আদ্যা ভবানীর এই শত-নাম-স্তোত্র পূজার সময় যিনি ভক্তিপূতচিত্তে পাঠ

করেন, তিনি আশু মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ করেন এবং মা কালী তৎপ্রতি আশু সুপ্রসন্ন হন। মঙ্গলবার, অমাবস্যা তিথির মহা-নিশায় পঞ্চতত্ত্বযুক্ত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী কালিকার পূজা করিয়া শতনাম স্তোত্র পাঠ করিলে সে সাক্ষাৎ কালীময় হয়, তাহার সকল মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। ভজহরি, তুমি ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ করিবে।

ভজহরি। স্তোত্র ত সন্ধ্যা আহ্নিকের পর পাঠ করিতে হয়; এক্ষণে তুমি সন্ধ্যা-আহ্নিকের ক্রম বলিয়া দাও।

রামপ্রসাদ। কুলাচার ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধি লাভ হয় না এবং পঞ্চতত্ত্ববিহীন পূজাও ফলপ্রদ নহে; শাস্ত্র-প্রদর্শিত পঞ্চতত্ত্বের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে ভগবান্ সদাশিব ইহা বারবার বলিয়াছেন। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন :—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তু মিহার্হসি ॥

ভজহরি। আচ্ছা ভাই! তারপর।

রামপ্রসাদ। প্রাতঃকৃত্য সমাধা না করিলে কোন কার্য্যে অধিকার হয় না, অতএব সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া উক্ত সকল সমাধা করিবেন। শরীর অসুস্থ হইলে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া মানস-স্নানে শুচি হইবেন। তারপর তান্ত্রিক গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিবেন।

ভজহরি। যাহার শিখা নাই—তাহার পক্ষে?

রামপ্রসাদ। এ সকল কার্য্য করিতে হইলে শিখা রাখিতেই হইবে। ব্রাহ্মণ হইলে অগ্রে বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া তারপরে তান্ত্রিক-সন্ধ্যা করিবে। পরে আচমন করিয়া জলশুদ্ধি করিতে হইবে। তারপর অনামিকার সহিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযোগ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা ঐ জল তিনবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে এবং সাতবার নিজ মস্তকে ছিটাইয়া দিবে। পরে মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া বামহস্তে সামান্য জল লইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক ঈশান, বায়ু, বরুণ, বহ্নি ও ইন্দ্র বীজ (হং যং বং রং লং) জপ করতে সেই জল তেজোময় হইয়াছে ভাবিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার ভূমিতে ও সাতবার মস্তকে প্রক্ষেপ দিয়া উহার দ্বারা সমস্ত পাপ ধৌত হইয়াছে, জানিয়া ফট্ এই মন্ত্রে ভূমে নিক্ষেপ করিবে।

ভজহরি। তান্ত্রিক আচমন ও বৈদিক আচমন কি এক প্রকার?

রামপ্রসাদ। তান্ত্রিক আচমনে আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ও শিবতত্ত্বায় স্বাহা বলিয়া তিনবার জলগণ্ডুষ গ্রহণ করত "নমঃ বিষ্ণুঃ, নমঃ বিষ্ণুঃ,

নমঃ বিষ্ণুঃ, তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌” বলিবে।

ভজহরি। বেশ বুঝিলাম—তারপর ?

রামপ্রসাদ। তৎপরে শূদ্র হইলে প্রণব স্থলে মায়া বীজ (হ্রীং) যোগ করিয়া হ্রীং দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ, হ্রীং ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ, হ্রীং পিতৃং স্তর্পয়ামি নমঃ ; পরে গুরু, পরম গুরু, পরাৎপর গুরু এবং পরমেষ্টি গুরু এবং কালিকাং তর্পণ করিবে। প্রত্যেককে তিনবার জল দিবে। তৎপরে হ্রীং হংসঃ বলিয়া সূর্যদেবকে জল দিবে।

ভজহরি। ষড়ঙ্গন্যাসের ক্রম বলিয়া দাও ভাই।

রামপ্রসাদ। হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্‌, হৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং (অস্ত্রায়) ফট্‌।

ভজহরি। আচ্ছা ভাই! তান্ত্রিক ও বৈদিক গায়ত্রী মূর্ত্তি কি একরূপ ?

রামপ্রসাদ। হাঁ মূর্ত্তি একই রূপ, তবে মন্ত্র স্বতন্ত্র ; ইহার পর তান্ত্রিক গায়ত্র জপ করত ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া “গুহ্যাতি-গুহ্য-গোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।” এই বলিয়া দেবীর দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। তারপর গুরু ও দেবীকে প্রণাম করিয়া কার্য্য শেষ করিবে ইহা প্রত্যহ তিনবার করিয়া অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত স্থির হয়—দেহ পাপ বিমুক্ত হয়। ইহার পর দেবীর ধ্যানাদি পাঠ পূর্ব্বক পূজা করিয়া ভক্তিভাবে পূর্ব্বোক্ত স্তোত্রপাঠ ক'রবে। এই কার্য্য করিলে সাধকের অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাবে এবিষয় সন্দেহ করিলে মহাপাপ হয়। ধর্ম্ম-কর্ম্মে কখন সংশয় আনয়ন করিবে না। ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন—“সংশয়বিহীন বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ।” ইহা তোমার কথা নহে। অতএব বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাজ কর।

রামপ্রসাদ ভজহরিকে সন্ধ্যা আহ্নিকের বিষয় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন গুরুমন্ত্র গ্রহণের পর হইতে ভজহরি একদিনও প্রসাদকে এরূপ বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন অবস্থায় দেখিতে পান নাই, কাজেই কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার অবসর হয় নাই।

প্রসাদ এখন বাটীতে আছেন, রাত্রি ভিন্ন সকল সময়ে গৃহকর্ম্মে লিপ্ত থাকেন, প্রতিবাসী লোকজন আসিলে তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন ; পুত্রের পাঠাভ্যাস কিরূপ হইতেছে—তাহার সংবাদ গ্রহণ করেন। এ কয়দিন গৃহকর্ম্মে তাঁহার বেশ চৈতন্য সংস্থাপিত হইয়াছে ; অবসর বুঝিয়া ভজহরি এই সময় তাহার শরণাপন্ন হইয়া সমস্ত বিষয়ের সন্দেহ অপনোদন করিয়া লইল। গুরুদেব কেবল দুই একদিন মাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন বইত নয় ; ইহার মধ্যে

সমস্ত শিক্ষা হওয়া কিরূপে সম্ভব। আর যখন প্রসাদের ন্যায় সাধক-বন্ধু তাহার সহায়; তখন তাহার শিক্ষার বিষয়ে ভাবনা কি? রামপ্রসাদ ত বারবার সে বিষয়ে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। ভজহরি ক্রমশঃ প্রসাদদেবের কৃপায় শাস্ত্রোক্ত সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতের প্রার্থনা

আজ বেলা দশটার পর সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই পাকাদি কার্য্য নাই। গ্রহণের মুক্তি না হইলে ত রন্ধনাদির ব্যবস্থা হইবে না—তাই বাড়ীর স্ত্রীলোকগণও নিশ্চিন্ত। তাহারাও মুক্তির সময় গঙ্গাস্নান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে।

এমন সময় শিশুপুত্র রামমোহন আসিয়া বলিল—"বাবা! আপনি গঙ্গাস্নানে যাইবেন কি?" জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য সর্ব্বাণী দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

প্রসাদ বলিলেন—"হাঁ বাবা! মুক্তির সময় স্নানে যাইব এবং সন্ধ্যার পর আহারাদি করিব।"

রামমোহন বলিল—"বাবা। আমি আপনার সঙ্গে নাইতে যাব।"

রামপ্রসাদ।—না বাবা! তুমি তোমার বৌদিদির সঙ্গে যেও।

বালক আর কিছু বলিল না—অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত তর্কভূষণ রামপ্রসাদের ভাব দেখিয়া অবাক্ হইতেছিলেন। সংসারাশ্রমে থাকিয়া কিরূপ নির্লিপ্ত-ভাবে কাজকর্ম্ম করিতে হয়—রামপ্রসাদ তাহা বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসারের ভিতর নানা কাজকর্ম্মে জড়িত থাকিয়া এরূপভাবে সাধন ভজন করিতে আর কেহ পারিবে না। বাস্তবিক তাপসবীর না হইলে এরূপভাব অপরের পক্ষে সাধ্যাতীত। কালীর ঘরে প্রবেশ করিলে যত সাবধানেই থাক—কালী গায়ে লাগিবেই, যাহার না লাগে, যে মনকে ঠিক রাখিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রার্থিত-বস্তু লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে—সে কি সামান্য লোক? তাহার মনের স্থিরতা কতদূর সাধিত

হইয়াছে, অল্প-জ্ঞানী আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না।

এইবার তর্কভূষণ অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"অতি সুন্দর স্তোত্র শুনিলাম, শ্রবণ যুগল পবিত্র হইল। ভজহরির আগ্রহে তোমার মুখনিঃসৃত ভগবতীর শত নাম শ্রবণ করিয়া আমিও ধন্য হইলাম। ভাই! এইবার ব্রহ্মগায়ত্রী কি বল?"

রামপ্রসাদ। ভাই! মা-ই আমার ব্রহ্ম, ব্রহ্মের শক্তিতে আর ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। তথাপি তোমাকে বলিতেছি—শ্রবণ কর—বিষয় একই। "পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরমতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।" আমরা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা মনে করি, আমরা পরমতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বদা ধ্যান করি, পরব্রহ্ম আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গে বিনিযুক্ত করুন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি—"ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র জপ করিবেন—ইহার অর্থ—যাঁহাতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতেছে, সেই পরব্রহ্মই সত্য আর সমস্ত মিথ্যা। এই ভাবই উত্তম, ধ্যান ভাব মধ্যম, স্তব ও জপ ভাব অধম, বাহ্য পূজা অধমাধম। জীব ও আত্মার ঐক্যের নাম যোগ। সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্যকে পূজা বলে। যাহাদের সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে—তাঁহাদের যোগ-পূজার আবশ্যক নাই। ওঁ তৎসৎ এই মন্ত্র আগম নিগম ও তন্ত্রসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্রে যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতকে ব্রহ্মময় দেখেন, তাঁহার আর কিছুর আবশ্যক হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও ব্রহ্মাবধূত-যতি। যাঁহারা পূর্ণাভিষেকের বিধানে সংস্কৃত হইয়াছেন—তাঁহাদিগকে শৈবাবধূত কহে। ব্রহ্মাবধূত ও শৈবাবধূত নিজ আশ্রমে ও আচারে থাকিয়া কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন করিবেন।

পণ্ডিত। ভাই! এই ত তুমি বলিলে যে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কোনপ্রকার ক্রিয়া নাই।

রামপ্রসাদ। সে কথা ঠিক, তবে কর্ম্ম যে দুই প্রকার আছে, তাহা বোধ হয় তুমি জান—সকাম ও নিষ্কাম, সকাম কর্ম্ম বন্ধনের হেতু—ব্রহ্মজ্ঞানীরা এরূপ কর্ম্ম করেন না, তাঁহারা কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন, লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মযোগ ব্রতী হন—এইজন্য কর্ম্ম তাহাদের বন্ধনের কারণ হয় না। নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের হেতু, জনকাদি ঋষিগণ এরূপ কর্ম্ম করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম আর বন্ধনের হেতু হয় না এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও কথন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। কর্ম্মপ্রসূত জ্ঞান না হইলে নিরবচ্ছিন্ন সন্ন্যাস দ্বারা মুক্তিলাভেরও সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ গীতায় ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
নচ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ না করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করাই উচিত। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও লোকশিক্ষার্থ কর্ম্ম করা নিতান্ত আবশ্যক। যাবতীয় ফলাফল ভগবানে নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিলে আর তাহাতে বন্ধনের কারণ থাকে না। ভগবান্ গীতায় আরও বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

অর্থাৎ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতেও যিনি কর্ম্ম করেন না এবং কর্ম্মত্যাগ করিয়াও যিনি কর্ম্মযুক্ত—তিনি সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী এবং সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। অতএব কর্ম্ম বন্ধনের হেতু নহে।

পণ্ডিত। তবে সকল অবস্থাতে কর্ম্ম করাই শাস্ত্রের বিধি।

রামপ্রসাদ। ফল প্রাপ্তির আশায় কর্ম্ম করাই দোষ—ফলের আশা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করায় দোষ কি? কর্ম্মফলই ত তোমাকে জগতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করাইবে কিন্তু যখন তোমার কর্ম্মের ফল নাই—যখন তোমার কর্ম্ম ফলশূন্য, তখন তুমি জগতে কি করিতে আসিবে এবং আসিবার কারণ কি থাকিতে পারে?

পণ্ডিত। হাঁ তা নিশ্চয়ই, কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জন্মমৃত্যু, বারম্বার গতায়াত, যখন তাহা নাই—তখন জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়া বৃথা গতায়াত করিতে হইবে কেন?

এইবার ভজহরি বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিল—হাঁ ভাই রামপ্রসাদ! তবে আমরা যে এই সকল পূজাদি কর্ম্ম সকাম ভাবে করিতেছি—তাহা হইলে এ সকল কেবল আমাদের দুঃখেরই কারণ হইতেছে, আমরা কেবল স্বেচ্ছায় সংসারবন্ধনে আরও জড়ীভূত হইতেছি।"

রামপ্রসাদ। পূর্ব্বে ত বলিয়াছি—ভোগ করিতে করিতে নিবৃত্তি হইবে; নিবৃত্তির জন্যই প্রবৃত্তিমার্গে অগ্রসর হইতেছি, ভগবানকে পাইবার জন্য, প্রবৃত্তিকে দমন হেতু ইহার অনুষ্ঠান করিতেছি—এইরূপ ভাব থাকিলে সত্বরই নিবৃত্তি আসিবে। আর কর্ম্ম নাশের জন্য, নিষ্কামী হইবার জন্য কর্ম্ম করিতেছি—এরূপ চিন্তা থাকিলে, কার্য্যে এইরূপ ভাবের আসক্তি থাকিলে নিশ্চয়ই তুমি নিষ্কাম হইতে পারিবে। তোমার মোহ ঘুচিয়া যাইবে, তখন অর্জ্জুনের ন্যায় বলিবে—

নাষ্টো মোহঃ স্মৃতিল
তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ
করিষ্যে বচনং তব।

ভজহরি। আচ্ছা ভাই! মূর্ত্তি-পূজা যে আমরা করি—ইহাতে কি আমাদের শুভ হয়—এ সকল কি আমাদের অবশ্য করণীয়? দুর্গা মূর্ত্তি, কালী-মূর্ত্তি এইরূপ ভাবে কল্পিত ও গঠিত হয় কেন? তাহা আমাকে বল।

রামপ্রসাদ। একথা ত অনেকবার ব'লেছি, যদি বুঝ্‌তে না পেরে থাক, আজ আর নয়, গ্রহণের জপ ও পুরশ্চরণের সময় উপস্থিত, বৃথা সময় নষ্ট করার আবশ্যক নাই। আর একদিন তখন বলিব। এখন সকলে স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করি চল।

এই বলিয়া প্রসাদদেব উঠিলেন, ভজহরি ও পণ্ডিত চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মূর্ত্তিপূজা ও সকামভাব

সাধন-পথে-উন্নতিলাভ করিলে মানুষের প্রায়ই আত্মাভোলা ভাব হয়; তখন আর তাহারা সাংসারিক কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করা বা সামাজিক বিধিবদ্ধ নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলা একপ্রকার দায় হইয়া উঠে, লোকলৌকিকতা তাহার নিকট আর স্থান পায় না, কোথাও যাওয়া-আসা করিয়া আত্মীয়তা করিতে আর তাহার অবস্থায় কুলায় না।

সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ তাই এখন আর আত্মীয়তা রাখিতে কোথাও যান না বা কাহারও সহিত তত বেশী সঙ্গ করেন না। হয় তাঁহার উদ্যানস্থিত পঞ্চবটী বনের সিদ্ধাসনে, না হয় গৃহমধ্যে অবস্থান করিয়া তিনি আপনার মনে কাজ কর্ম্ম করেন, কোন বাধ্যবাধকতা, কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর হিসাব করিয়া কোন কাজ আর তিনি করিতে পারেন না। তাই এতাবৎকাল তিনি কখন বাড়ী ছাড়া হন নাই, কিন্তু আজ কয়েকদিবস হইল, তাঁহাকে তাঁহার বৈবাহিক বাটী গরলগাছা গ্রামে যাইতে হইয়াছে। বৈবাহিক মহাশয় আজ একবৎসর হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন। বাটীতে বৃদ্ধা বেহান ও তাঁহার পুত্র নিধিরাম

ও নিধিরামের স্ত্রী; নিধিরাম অপুত্রক ছিলেন। বহু চেষ্টা করিয়া, নানাবিধ যাগ-যজ্ঞ করিয়া পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না বলিয়া বেহান বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহার ক্ষুণ্ণভাব যেন কতকপরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার একমাত্র কন্যা ভগবতী গর্ভবতী হইয়াছেন। বৃদ্ধার এই একমাত্র কন্যাই আমাদের সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র রামদুলালের সহধর্ম্মিণী। কন্যাটি প্রথম গর্ভবতী হইয়াছে বলিয়া মাতা তাহাকে নিকটে আনিয়া রাখিয়াছেন। এ অবস্থায় স্ত্রীলোককে বহুযত্নে রাখিতে হয়। বেহান (প্রসাদের স্ত্রী) অনেকগুলি পুত্র লইয়া একাকিনী নানা কাজে ব্যস্ত—কন্যার তাদৃশ যত্ন হইবে কিনা, এইজন্য তিনি ভগবতীকে নিকটে আনিয়াছেন। পৌত্রমুখ নিরক্ষণ করার অদৃষ্ট ত ভগবান্ দিলেন না, এক্ষণে দৌহিত্র মুখাবলোকন করিয়াও বৃদ্ধা ইহ সংসার ত্যাগ করিতে পারেন—তাহা হইলেও জন্ম-সার্থক হয়। এইজন্য বৃদ্ধার বদনকমল আজকাল কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল। নিধিরাম ও নিধিরাম-পত্নী অন্নপূর্ণা ভগবতীকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন তাহারাও আজ এ সংবাদে সাতিশয় সুখানুভব করিয়াছেন। এত সাধ্য-সাধনা করিয়াও বৃদ্ধা একদিনের জন্যও বৈবাহিক রামপ্রসাদকে স্বভবনে আনয়ন করিতে পারেন নাই; তাঁহার ন্যায় সাধকের দর্শনসুখানুভব করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ কন্যা গর্ভবতী হইয়াছে, অনেকদিন এখানে আসিয়া সেও শ্বশুরকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র রামপ্রসাদ একদিনের জন্য বৈবাহিক বাটীতে পদার্পণ করিলেন। তাহার কারণ সগর্ভাবস্থায় বধূমাতার সকল সাধ পূর্ণ করা শাস্ত্রসঙ্গত বিধান। প্রথম গর্ভাবস্থায় কোন সাধ অপূর্ণ রাখা গৃহীমাত্রেরই উচিত নয়। এইজন্য তিনি প্রথম পুত্রকে লইয়া আজ দুইদিন হইল গরলগাছা গ্রামে বৈবাহিক বাটী আসিয়াছেন। তথাকার অধিবাসিবৃন্দ মাতৃসেবক প্রসাদকে দেখিয়া হৃদয়ে প্রভূত আনন্দানুভব করিল—সকলের সাধ পূর্ণ হইল; প্রসাদ সকলকে আপ্যায়িত করিয়া পরদিন বাটী ফিরিলেন। তিনি বাটী আসিয়াছেন শুনিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত তর্কভূষণ, পাড়ার শ্রীধর মুখুজ্যে, রমানাথ, ভোলানাথ প্রভৃতি কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহার দর্শন মানসে আসিয়াছেন, ভজহরি তাঁহাদের সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—"ভায়া আজ খুব সকাল হইতেই জপে বসিয়াছেন।" সকলে বলিল—"রামপ্রসাদ দুইদিন বাড়ীতে ছিল না ব'লে আমরা যেন সমস্ত শূন্য দেখিতেছিলাম। যাহা হউক এখন আর বিরক্ত করিয়া কাজ নাই, আমরা বৈকালে পুনরায় আসিব।" এই বলিয়া তর্কভূষণ ব্যতীত অপর সকলেই চলিয়া

গেল। ভজহরি পণ্ডিতের কাছে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তার পর বলিল "আচ্ছা পণ্ডিত মহাশয়; এই যে আমাদের মূর্ত্তিপূজাটা এতদিন চলিয়া আসিতেছে—ইহাতে ফল কি? শুনিয়াছি—এ সকল অনুষ্ঠান বেদান্তর্গত নহে—পৌরাণিক, যাহা বেদে নাই, তাহার অনুষ্ঠান না করিলে কি দোষ হইতে পারে, তবে লোকে এই মূর্ত্তিপূজা করিয়া এত বাহ্যাডম্বর করে কেন? সেই সময়টা জপ তপাদিতে অতিবাহিত করিলে ত অনেক ফললাভ হইতে পারে, জপের তুল্য ত আর কিছুই নাই? আমার মূর্ত্তিপূজার উপর তাই বড় সন্দেহ হয়।"

পণ্ডিত। সেদিন যে তুমি ভায়ার (প্রসাদের) কাছে এই কথা তুলিয়াছিলে এতদিন কি তাহার কোন মীমাংসা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার নাই?

ভজহরি। সেই অবধি আব তাঁহাকে ঠিক সময়ে ধরিতে পারি নাই; কোন অবসরও করিতে পারি নাই। আপনি ত অনেক শাস্ত্র পড়েছেন, আপনিও ত আমার সন্দেহ অপনোদন করিতে পারেন, আপনি না হয় বলুন?

পণ্ডিত। দেখ ভাই! লেখা পড়ার ভিতর যা আছে, তাহাতে সন্দেহ নিবারণ হয় না। আমি তোমার অপেক্ষা বেশী লেখা পড়া জানি, আমি তোমাকে আমার মতের মত বুঝাইয়া দিব, কিন্তু আমাপেক্ষা যিনি বেশী পণ্ডিত, তিনি আবার আমাব মত খণ্ডন করত অন্য কথা বলিয়া আপন মত বজায় করিতে পারিবেন। জগতে ত বড় ছোট আছে। যার যত বেশী পড়াশুনা আছে, সে তত বিচারবিতর্ক করিতে সমর্থ কিন্তু এ সকল বিষয় বিচার দ্বারা ভাল মীমাংসা হয় না এবং তাহাতে প্রাণের সেরূপ তৃপ্তিও হয় না। যে নিজেকে জানিয়াছে এবং তারপর মাকে আপনার মত করিয়া হৃদয়াসনে বসাইতে পারিয়াছে, সে যেমন বুঝাইতে পারিবে, তেমন আর কেহ পারিবে না।

ভজহরি। দেখুন, প্রসাদ এই ঘরের মধ্যে আছেন, তিনি কিছুক্ষণ পরেই আসিবেন, তবে এখন সময়টা বৃথা বয়ে যায় কেন—আপনি যতটুকু জানেন বলুন না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ভাল নয় কি?

পণ্ডিত। সে ত খুব ভাল। আচ্ছা, তবে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা, তা বলি শুন।

ভজহরি। বলুন মশাই! আপনি ত একটা যে সে পণ্ডিত নহেন?

পণ্ডিত। ও কথা আর উত্থাপন ক'রো না ভাই! পণ্ডিতিতে যে এ সকলের কিছুই নাই, তাহা ত পূর্ব্বেই তোমাকে ব'লেছি, তবে যে টুকু জানি বা বুঝি তাহা ব'লছি শুন? দেখ, বৈদিক যুগে অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ প্রতিপাদ্য সময়ে

মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া পূজা করিতে হইত না, কারণ তখন সমাজে নিম্ন অধিকারী লোক প্রায় ছিল না, যাহা ছিল তাহা খুব কম, তাহার জন্য স্বতন্ত্র পূজার দরকার হইত না। তার পর হিন্দুসমাজে যখন অনার্য্য বর্ব্বর জাতির অভ্যুদয় হইল, যখন তাহাদের সহবাসে আর্য্যগণের অবনতির সূত্রপাত হইতে লাগিল, তখনই ঋষিগণ পুরাণ তন্ত্রের সাহায্যে ধ্যান ধারণার উপযোগী ক'রে, কাল্পনিক মূর্ত্তিপূজার প্রচলন করিলেন।

ভক্ত। তবে মূর্ত্তিপূজা আমাদের মত অনধিকারীর জন্যই বলুন, আমাদের মত নিম্নপথের লোকেরাই কেবল মূর্ত্তিপূজা করে থাকে ?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, তা নয় ত আর কি ? লেখা-পড়া শিখ্‌তে গেলে যেমন অক্ষর চিন্‌তে হয়, গান শিখ্‌তে গেলে যেমন সা-রে-গা-মা সাধ্‌তে হয়, ব্রহ্মবস্তু লাভ কর্ত্তে গেলেও তেমনি প্রথমে মূর্ত্তিপূজার দরকার হয়, নতুবা পাগ্‌লা হাতির মত ছুটে বেড়ান মনটাকে একস্থানে দাঁড় করান যায় না।

ভক্তহরি। মনকে ঠিক ক'র্ত্তে হ'লে তবে মূর্ত্তিপূজা নিতান্ত দরকার বলুন ?

পণ্ডিত। অগাধ সমুদ্রবিশেষ জ্ঞানগরিমায় হৃদয়ক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিতে হইলে, যেমন অগ্রেই দাগা বুলাইতে হয়, ভগবত্তত্ত্ব বিষয় উপলব্ধি করিতে হইলে এই মূর্ত্তিপূজা সেইরূপ দাগা-বুলান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই অনির্ব্বচনীয় নিরাকার অসীম পরব্রহ্মের উপলব্ধি বিষয়ে ইহাই অসীম উপায়।

ভক্তহরি। তবে আমাদের মত অজ্ঞ লোকের ইহা অবলম্বন না করিলে আর কোনও উপায় নাই, ইহা বোধ হয় স্থির নিশ্চয় ?

পণ্ডিত। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহা সামান্য অধিকারীর পক্ষে বলিয়াই বোধ হয়, কারণ জগতে ত আর সকলে সমান ক্ষমতা লইয়া জন্মায় না ? আর জগতে সকলেই একভাবের ভাবুক নহে তাহাদের মধ্যে কোন না কোন পার্থক্য আছেই। দেখ না, কেহ বলবান, কেহ দুর্ব্বল, কেহ সুস্থ, কেহ রুগ্ন, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ মোটা, কেহ পাতলা, এই ত গেল শারীরিক বৈলক্ষণ্য। মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখ, কেহ হয় ত একমাসে একটা বিষয় শিখিতে পারে, কেহ হয় ত ছয় মাসেও তাহা পারে না॥ বাহ্য-জগতের মত আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ পার্থক্য আছে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী বিভাগ আছে, তাই আমাদের আর্য্য ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, নতুবা অধিকারী অনধিকারীর কি একরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে ? আর হইলেই বা চলিবে কেন ? উদরাময় রোগীকে কি পলান্নের ব্যবস্থা করা চ'ল্‌তে পারে, না একজন নিরোগীকে সাগু আহার করিতে দিলে, তাহার দৈহিক উন্নতি সাধিত হয় ?

ভজহরি। সাধু আপনি, ঠিক বলেছেন, তবে আপনি এতক্ষণ কেন বলছিলেন যে আমি এ বিষয় বুঝাইতে পারিব না, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবে ত আপনি বেশ বুঝাইতে পারেন ?

পণ্ডিত। দেখ, "কায়েন মনসা বাচা" কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধরূপে ভগবানের উপাসনা করা যায়। শুদ্ধচিত্তে দৃঢ়ভক্তি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিলেই তাঁহার আসন টলে, তাঁহাকে পাইতে পারা যায়। এই ভক্তিভাব লাভ করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য অনেক বাহ্য উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, কেহ বা সুস্বরে গান গাহিয়া, কেহ বা উন্মত্তভাবে নৃত্য করিয়া সেই ভাব সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে, ইহাতে ধর্ম্মের প্রতি স্বতঃই মনঃপ্রাণ আকৃষ্ট হয়। কলিতে ত্রিতাপগ্রস্ত সাংসারিক-জীবের পক্ষে এরূপ বাহ্য উপায় মন্দ নহে। সাধারণ মানবহৃদয়ে ভগবৎ প্রেম উদ্দীপনা করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণও এইরূপ মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবানও বলিয়াছেন ;—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" কেবল মানসিক ধ্যান-ধারণা করিয়া যে সাধক ব্রহ্মভাব-হৃদয়ে জাগাইতে পারে না, জগৎ ব্রহ্মময় চিন্তা করা যাহার পক্ষে একান্ত কঠিন, সেই নিম্ন অধিকারীর পক্ষেই এইরূপ মূর্ত্তিপূজা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দুর্ব্বল-চিত্তসাধকের সাধনপন্থা সুগম করিবার জন্য, তাহাদের অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রহ্মধ্যানের অনুরূপ এই সাকারমূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে। একটি ভাল গান শুনিলে বা ভাল একটি বক্তৃতা শুনিলে মনে যেমন স্বতঃই ধর্ম্মভাবের উদয় হয়, নিরাকারের এই সাকারমূর্ত্তি দেখিলেও প্রাণে সেইরূপ ভক্তিভাবের উদয় হয়। প্রক্ষিপ্তমনকে কেন্দ্রীভূত করিবাব জন্যই এই মূর্ত্তিপূজা, মন চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে—কিছুতেই স্থির হইতেছে না, তাহাকে টানিয়া আনিয়া এই সাজসজ্জীকৃত প্রতিমার নিকট বসাইতে পারিলে সহজেই সে স্থির হইতে পারিবে—মন্ত্রবলে পূজা করিয়া সহজেই সে ভক্তিভাবে বিভোর হইতে পারিবে, এইজন্য মূর্ত্তিপূজার সৃষ্টি। নয়ন যখন সর্ব্বদাই সুন্দর বস্তু দেখিবার জন্য লালায়িত, তখন মনোরম সুসজ্জীকৃত মূর্ত্তি তাহার নিকট প্রীতিপ্রদ হইবে না কেন ? নিরাকার উপাসনায় হৃদয়ে যে ভাবের উদ্রেক হয়, যাহা ভাবিতে ভাবিতে সাধক আত্মহারা হইয়া মূর্ত্তি-মানরূপে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ফেলেন ; এ মূর্ত্তিও আর্য্য ঋষিদের দ্বারা ঠিক সেই ভাবের ভিতর দিয়াই গড়া হইয়াছে, কাল্পনিক বলিয়া ইহাকে কখনই কৃত্রিম বলিতে পার না। ইহা যে সাধন-সিদ্ধ, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং এই পূজায় যে আত্মোন্নতি সুনিশ্চিত, তাহা অবিশ্বাস করিবারও বিন্দুমাত্র কারণ নাই। নিম্নাধিকারীর পক্ষে

মনকে ভক্তিপথের পথিক করিয়া ভাবাবেশে বিভোর হইতে হইলে প্রতিমা-পূজার তুল্য সরল পন্থা আর কিছুই নাই। গীতায় ভগবান্—"সম্ভবামমি যুগে যুগে" বলিয়া নিজের মূর্ত্তি নিজেই গড়িয়া দিয়াছেন।

পণ্ডিত ও ভজহরি উভয়ে বাহিরে বসিয়া, মূর্ত্তিপূজার বিষয় কথোপকথন করিতেছিলেন, রামপ্রসাদ ভিতরে বসিয়া তাহা একান্ত-মনে শ্রবণ করিতেছিলেন এবং মনে মনে তর্কভূষণের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছিলেন কিন্তু মূর্ত্তিপূজা কেবল নিম্নাধিকারীর পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—বারবার এরূপ কথা শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকতে পারিলেন না—বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পণ্ডিত একটু সরিয়া বসিলেন, ভজহরি তাঁহার বসিবার জন্য একখানি আসন বিস্তৃত করিয়া দিল। রামপ্রসাদ এইবার হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তর্কভূষণ ভায়া! তোমার যে শাস্ত্রে বেশ দখল আছে—তাহা অনেক দিন জানি, আজও ভজহরিকে মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে যাহা বুঝাইতেছে, তাহাও বেশ মোলায়েমভাবে হইতেছে কিন্তু মূর্ত্তিপূজাটাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দিতে-ছিলে—উহা কেবল নিম্ন-অধিকারীর পক্ষেই বলিতেছিলে, অনভিজ্ঞ সাধকের চিত্ত স্থির করিবার জন্য হইলেও ইহা শুধু অনভিজ্ঞের জন্য নহে—অভিজ্ঞের জন্যও বটে। ইহা নিম্ন-অধিকারীর পক্ষে যেমন, উচ্চাধিকারীর পক্ষেও সেইরূপ আবশ্যকীয়। যুক্তিতর্ক করিতে গেলে অনেক দূর যাইয়া পড়িতে হয়—তাহাতে প্রাণে তত শান্তি আসে না—আর ধর্ম্মজীবনের বুনিয়াদও বড় পাকা হয় না।

পণ্ডিত। হাঁ ভাই। সে কথা ত খুব ঠিক, ধর্ম্মবিষয়ে বেশী যুক্তিতর্কে কেবল সময় নষ্ট আর অযথা পথভ্রষ্ট হইয়া 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইতে হয়—সরলবিশ্বাসে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ, তা ভাই! তুমি এতক্ষণে ছিলে না বলে ভজহরির কথায় আমি অনেক কথা ব'লে ফেলেছি—পিপাসিত চাতকের মত বসে বসে আর কি করি বলো; এখন মেঘের উদয় হইয়াছে—বর্ষণ হউক, চিত্ত-চাতক সান্ত্বনা লাভ করুক।

রামপ্রসাদ। ভাই! পাণ্ডিত্যে আমি তোমার কাছে কি পারিয়া উঠিতে পারি, একে ব্রাহ্মণ তায় পণ্ডিত—সোনায় সোহাগা; আমার এমন স্যাধ্য নাই যে ঐরূপ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ কথা বলিতে পারি। তবে শুধু বসে থাকার চেয়ে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করাও ভাল, যদি ভুল হয়, তবে একটু একটু বলে দিও, কারণ আমার সকল সময় সকল কথা ঠিক ঠিক যোগায় না।

পণ্ডিত। ভাই বলনা, ভজহরি ত তোমার কাছে শুনিবে বলিয়া এই কথা সেদিন তুলিয়াছিল—কিন্তু সেদিন তোমার সময় হলো ক'ই।

রামপ্রসাদ। কেন, সে কথা ত তোমার মুখ দিয়ে ঠিকই বাহির হইয়াছে; আমার উহার চেয়ে বেশী কিছুই বলিবার সাধ্য কোথায়? তবে তুমি যে বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণটাকে, মূর্ত্তিপূজাটাকে—অত ছোট করিয়াছিলে—তাই একটু বলি; আমার কিন্তু উহাকে অত ছোট-বলে মনে হয় না।

পণ্ডিত। তুমি যা বলিবে—তাহাই ঠিক।

রামপ্রসাদ। আর তুমি যা ব'লবে—তাহা অঠিক কিসে, তবে এস না সকলে একটু ভাল ক'রে বুঝে দেখি উহা অত ছোট, কি আরও একটু বড়।

পণ্ডিত। বেশ ভাই—বলো।

রামপ্রসাদ। দেখ ভাই! প্রতিমা-পূজাই বাঙ্গালী-জাতির বিশেষত্ব,—ইহার তুল্য বিশেষত্ব আর কোথাও নাই; এদেশবাসীর মত পূজা-পার্ব্বণ, ইহাদের মত সন্ধ্যা-বন্দনা আর কোন দেশে খুঁজিয়া পাইবে না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মবল, বাঙ্গালীর চরিত্রবল যে এত প্রবল হইয়াছে—তাহাদের সংসার, তাহাদের পরমার্থতত্ত্ব যে এত ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে কেবল তাহাদের নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনা এবং নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজাদির অনুষ্ঠান দ্বারা। এখন অনেকে এই প্রতিমা-পূজার প্রতি, সন্ধ্যা-আহ্নিকের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে বটে কিন্তু ভাবের রাজ্যে যে ইহার একটা মূল্যবান্ অধিকার আছে—তাহা ধ্রুব সত্য। তুমি ঠিকই বলিয়াছ—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" ভগবান্ বাস্তবিক সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া এই সকল মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত ঐ কথাটীর মর্ম্ম কয়জনে জানে বা বুঝে "সাধকানাং হিতার্থায়" বলা হইয়াছে—কিন্তু সে সাধক কে, সাধক ত সকলেই হইতে পারে না, যিনি সাধ্যবস্তু নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন—তিনিই সাধক হইয়াছেন—অন্যে নহে। সাধ্যবস্তু নির্ণয় করিতে না পারার অবস্থাকে প্রবর্ত্তনাবস্থা বলে। প্রবর্ত্তনাবস্থা অতিক্রম করিয়া তবে সাধকাবস্থা লাভ করিতে হয়। অতএব তাঁহার তখন সাধ্যবস্তু নির্ণয় হইয়াছে বলিয়া তিনি "সাধক" পদবাচ্য এবং সাধনপথে অগ্রসর হইয়া সাধন সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া দ্বিতীয়স্তরে অবস্থিত, তখন সে নিম্ন-অধিকারী কিরূপে হইল? তাহার নীচে ও প্রবর্ত্তনাবস্থার লোক আছে, যাহারা প্রবর্ত্তনাবস্থার লোক, তাহারা নিম্ন-অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু সাধকাবস্থার লোককে নিম্ন-অধিকারী বলা উচিত নয়।

তারপর সাধকের হিতের জন্য যদি ইহা কল্পিত হ'য়ে থাকে—তাহা হইলে ইহা অনধিকারী বা নিম্ন-অধিকারীর জন্য যে কল্পনা করা হয় নাই, তাহা স্বীকার

করিতেই হইবে। তারপর ইহার কর্ত্তা কে, কাহারা ইহার কল্পনা করিয়াছেন? যাঁহারা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত আছেন—তাঁহারাই কল্পনা করিতে পারেন—অন্যে পারে না। স্বরূপ না জানিলে রূপের কল্পনা অসম্ভব, যে স্বরূপে অনভিজ্ঞ, তাহার রূপের জ্ঞান কেমন করিয়া আসিবে? বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান না থাকিলে, তাহার রূপের কল্পনা হইতে পারে না; যিনি ব্রহ্মকে ভালরূপ না জানিয়াছেন বা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তিনি তাঁহার রূপ কল্পনা করিতে পারেন না। যাঁহারা এই রূপ কল্পনা করিয়াছেন—তাঁহারা নিশ্চয়ই সাধকের চেয়ে অনেক বড় সিদ্ধ পুরুষ! অন্তরের অন্তঃস্থল হৃদয়-পদ্মাসনে তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তাহাই তাঁহারা প্রতিমারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবসমাধিতে ভিতরে যাঁহাকে দেখিয়াছেন—যে স্বরূপের মনোমোহনরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তাঁহারই প্রকাশ বাহিরে দেখিবার জন্য প্রতিমার সৃষ্টি। কেবল ভিতরে ভাব-সমাধিতে দেখিয়া তাঁহাদের পরিতৃপ্তি লাভ হয় না, কারণ সমাধি ত চিরস্থায়ী নহে; তাহার অপগমে প্রাণের প্রাণ হৃদয়-দেবতার সহিত পাছে বিচ্ছেদ ঘটে, এই ভয়ে বাহ্য ইন্দ্রিয় সমক্ষেও তাঁহাকে স্থির রাখিবার জন্য এই-মূর্ত্তি-কল্পনা। যাহা আমার প্রাণের বস্তু—প্রিয়তম সামগ্রী, তাহাকে কেবল মানস-নয়নে দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না; কেবল ধ্যানযোগে সে প্রাণেশ্বরের মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া আশা মিটে না—তাই সমগ্র বাহেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে ভোগের জন্য চেষ্টা, আপনাপনি আসিয়া পড়ে। যে প্রাণের ধনকে পাইবার জন্য প্রথমে কত সংযম, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাকে পাইয়া, অন্তরে তাঁহার সহিত বিশেষভাবে আলাপ পরিচয় করিয়া, ভক্তির বন্ধনে তাঁহাকে একান্ত-ভাবে আবদ্ধ করিয়া, এখন বাহিরের ইন্দ্রিয় সকলের সহিত তাঁহাকে ধরিতে বা স্পর্শ করিতে না পারিলে যেন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে না, হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধিত হয় না, তাই ফুটাইয়া বাহির করিতে সাধকের স্বতঃই ইচ্ছা হয়। সে ত্রিভুবন-আলো করা মূর্ত্তি যেন আর একা দেখিয়া আশা মিটে না; তাই জগৎ সমক্ষে তাহা ফুটাইতে ইচ্ছা হইয়া পড়ে। প্রথমে গর্ভধারিণী জননীকে আধার রূপে আশ্রয় করিয়া সন্তানের মাতৃভক্তি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে; তখন তাহার ভাগা-ভাগী ভাল লাগে না, ইচ্ছা কেবল একাই মা মা করিয়া বিভোর হই—কিন্তু ঐ পার্থিব মা বুলির ভিতর দিয়া যখন বিশ্বজননীর রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, ভক্ত যখন হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে সেই বিশ্ব-মাতৃকামূর্ত্তি দেখিতে থাকে; তখন শুধু একা মা মা বলিয়া ডাকিয়া, তখন শুধু তাহার একার ক্ষীণকণ্ঠে মাতৃ-আবাহন করিয়া আর ভাল লাগে না। তখন তার মনঃ পূর্ণ, প্রাণ পূর্ণ, হৃদয়ে

পূর্ণতার ভাব উচ্ছ্বসিত ; তখন একটী ক্ষীণকণ্ঠে কি মা বলিয়া ডাকিলে আর তার আশা মিটিতে পারে? তখন সে পাড়ার সকলকে ডাকিয়া তারস্বরে মা মা বলিয়া ডাকিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন পরিপূর্ণ-হৃদয়ে সে যে মাতৃমূর্ত্তি আঁকিতে চাহে—তখন কেবল তার নিজের জন্ত নহে—বিশ্ববাসীর জন্ত ; তখন তার মা তার একার নহে—এই বিশ্ববাসী জীব সকলের, তখন তার মা এত ছোট সীমাবদ্ধ নহে, তাহার মায়ের মূর্ত্তি তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও যে ধরে না। তখন সাধকের এই মা সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন, তখন সাকার ছাড়িয়া দিলে নিরাকার থাকে না, নিরাকার ছাড়িয়া দিলে সাকার থাকে না। যাহা সত্য শাশ্বত, সনাতন তাহা সাকার নিরাকার দুইই। উচ্চ সাধক নিজের বাহিরের আনন্দলাভের জন্ত ভিতরের মূর্ত্তি এইরূপে কল্পনা করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন অধিকারীকেও ইহার অধিকার দিয়াছেন। ইহাই হইল—আমাদে॰ সাকার মূর্ত্তির কল্পনা।

পণ্ডিত। ভাই প্রসাদ! অতি মনোরম, অতি হৃদয়গ্রাহী, আমার এমন সাধ্য কেমন করিয়া হইবে ভাই ; মা তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন—সময়ে সময়ে তোমার নিকট এই সকল তত্ত্ব কথা শুনিয়া আমরাও ধন্ত হই।

ভজহরি। প্রসাদ! আমি কি শুভক্ষণে যে তোমার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছিলাম—তাহা বলিতে পারি না। তোমার সঙ্গ করে আমারও জন্ম সার্থক হলো। দাদাভাই। ঐরূপ মধুরভাবে একবার সকাম-ভাবের উপাসনার বিষয় বিবৃত ক'রে আমার সন্দেহ দূর কর। আমরা যে সকল ধর্ম্মকার্য্য সকামভাবে করি, ইহাতে কোন দোষ আছে কি না?

রামপ্রসাদ। ভাই! কামনা যতদিন থাকিবে—ততদিন নিষ্কাম হ'য়ে কেমন করিয়া ধর্ম্ম করিবে? তবে নিষ্কাম হইবার জন্ত, কামনা-ত্যাগের জন্ত, ভোগের বাসনা-নিবৃত্তির জন্ত প্রবৃত্তি বা কামনার আশ্রয় লইতেছি—ইহা মনে করিয়া কাজ করিলে ক্রমশঃ ভাল বই মন্দ হইবে না।

ভজহরি। আচ্ছা আমরা যে দেবীর নিকট আয়ুঃ, যশ, ধন, মান, পুত্র এবং আরোগ্য কামনা করি—ইহা কি ভাল?

রামপ্রসাদ। ভাল নয় ত কি? অপূর্ণ আমি পূর্ণের নিকট চাহিব না ত কি? আর সংসার আশ্রমে থাকিয়া সাধনা করিতে হইলে—আয়ুঃ, আরোগ্য প্রভৃতি ত অত্যন্ত আবশ্যক, শরীর অপটু বা অল্পায়ুঃ অথবা ধনের জন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতে হইলে সাধনা হইবে কিরূপে, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মায়ের নিকট ও সব ত চাহিতেই হইবে? আমি মার নিকট চাহিতেছি, আমার দরকার যদি তিনি

দিবার আবশ্যক বুঝেন, দেওয়া যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়—তিনি অবশ্য দিবেন। যতদিন তাঁর পূজা উপাসনা করিতে হইবে, ততদিন সকাম ভিন্ন আর উপায় কি? এ সকলের অতীত হইলে আর চাহিবার দরকার হইবে না। যতদিন চাহিবার দরকার, ততদিন যার তার কাছে না চাহিয়া মার কাছে চাওয়া সম্পূর্ণ উচিত, ইহাতে আদৌ দোষ নাই—বরং অপরের নিকট অন্তভাবে চাহিলে দোষ হয়।

ভজহরি। আচ্ছা! গৃহীলোকের নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল বসিয়া থাকা উচিত, না কাজ কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা উচিত?

রামপ্রসাদ। কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কর্ম্ম অবশ্য করণীয়, ধর্ম্মপথ বজায় রাখিয়া, মায়ের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, ধর্ম্মভাবে প্রাপ্ত সামান্য ধনে সন্তুষ্ট হইতে পারিলে আকাঙ্ক্ষা আপনি কমিয়া আসিবে, বিষয়-বুদ্ধি ক্রমশঃ হীন হইয়া বিবেকবুদ্ধির উদয়ে তোমার মনুষ্যত্ব লাভ হইবে।

ভজহরি।—আচ্ছা ভাই! আমরা যে পূজার সময় বলিপ্রদান করি—নানাবিধ পশু-বধ করি—ইহা কি ধর্ম্মসঙ্গত—এরূপ জীবহিংসায় কি অধর্ম্ম হয় না?

রামপ্রসাদ। ভজহরি! এ সকল বিষয় তর্ক-ভূষণকে জিজ্ঞাসা কর উনি আমা অপেক্ষা ভাল বুঝাইতে পারিবেন, কারণ—উনি অহরহঃ এই কাজ করিয়া থাকেন।

তর্কভূষণ। ভাই প্রসাদ! তোমার মত বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। শাস্ত্রে বিহিত আছে—তাই করি, নতুবা আমারও মনে সময়ে সময়ে ঐ বিষয়ে তোলাপাড়া হয়। কোনও শাস্ত্র বলেন—বলি কর, কোনও শাস্ত্র বলেন—করো না—মহাপাপ। ভাই প্রসাদ! ভজহরি বেশ ভাল প্রশ্নই উত্থাপন করিয়াছে, ইহার সদুত্তর প্রদান করিয়া আমারও সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দাও।

রামপ্রসাদ। আচ্ছা! আজ আর নয়, আর একদিন তখন বলিব। এই বলিয়া প্রসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বলিদান-সম্বন্ধে কথোপকথন

আজি মহাপূজার বিজয়ার দিন, এইদিন বয়সের তারতম্যানুসারে এবং জাতি-নির্ব্বিশেষে বঙ্গবাসী আপন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে চির প্রচলিত প্রথামত

পরস্পর আলিঙ্গন, অভিবাদন, প্রণাম, নমস্কার প্রভৃতির দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া থাকে। হিন্দুর সেই আবাল্য-প্রতিপাল্য প্রথার অনুশীলন-কল্পে তাই আজ প্রসাদের চণ্ডীমণ্ডপে বহু লোকজনের সমাগম হইয়াছে, কতলোক প্রসাদের ন্যায় আনন্দময় সাধুপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যাহারা খুব অন্তরঙ্গ নহে, অথচ প্রসাদকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকে, তাহারা কার্য্য সমাপনান্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। আর যাহারা একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাহারা এখনও বসিয়া আছে, প্রসাদের সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা-লাভ করিবার একান্ত ইচ্ছা, তাই পণ্ডিত তর্কভূষণ ও গোপীনাথ হালদার বসিয়া বসিয়া ভজহরির সহিত প্রসাদের সম্বন্ধে নানাপ্রসঙ্গ করিতেছে। ভজহরি প্রসাদের কায়ার ছায়া, বাহ্যিক-বিষয়ে দুইজনে একপ্রাণ এক আত্মা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভজহরি ও পণ্ডিত প্রায়ই প্রসাদের কাছে কাছে থাকিয়া ধর্ম্মবিষয় আলাপনে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন, কিন্তু গোপীনাথের ইচ্ছা থাকিলেও এ রসাস্বাদনের অবসর ঘটে না, কারণ—তাঁহার বাটী অনেক দূর, প্রত্যহ আসা-যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কাজেই আজ যখন আসিয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত আলাপ না করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখের কিছু উপদেশ না শুনিয়া আর গৃহে যাইবেন না, এইরূপ আশা করিয়াই বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাসাদদেব কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বন্ধুগণের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার সহিত বিজয়ার আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া ধন্য হইলেন, গোপীনাথ হালদার জাতিতে তন্তুবায়, গোপীনাথকে বহুদিনের পর দেখিয়া রামপ্রসাদ তাঁহাকে আলিঙ্গনদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন এবং স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—"ভাই ? বহুদিনের পর তোমাকে দেখিলাম—এতদিন আস নাই কেন ?" গোপীনাথ বলিল—"ভাই! পিতার মৃত্যুর পর একাকী হইয়াছি, সংসারের যাবতীয় ভার নিজের স্কন্ধে পড়িয়াছে, কাজেই আর আসিতে পারি না। পাঠ্যাবস্থায় যাহা হইয়া গিয়াছে—এখন আর ইচ্ছা করিলেও তাহা হয় না। আমাদের মন ত আর তত আসক্তি শূন্য হয় নাই ?

গোপীনাথ রামপ্রসাদের সহপাঠী বন্ধু, এক সময় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব ছিল, উভয়ে একত্র পাঠাভ্যাস করিত, একত্র আমোদ-আহ্লাদে কালাতিপাত করিত, রামপ্রসাদের পবিত্র স্বভাব দেখিয়া পাঠ্যাবস্থায় সে প্রায়ই প্রসাদের বাটীতে অবস্থান করিত। গোপীনাথ বেশ লেখাপড়া জানিত, বাল্য-

কালে ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাহার অনুরাগও বেশ ছিল কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহার সে সকল প্রবৃত্তি আর স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাহার পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট আছে, সেই সকল রক্ষণাবেক্ষণেই সময় কাটিয়া যায়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার আর সময় কই ? বিশেষতঃ লৌহকে চুম্বকে ধরার মত এখন ত আর প্রসাদ তাহার কাছে কাছে থাকেন না কাজেই ধর্ম্মকর্ম্মে লওয়াইবার তেমন লোক মিলে না। আজ বৎসরান্তে বিজয়ার পর যে দেখাটা করিতে আসিয়াছেন—তাহাও বহুকষ্টে।

অনেকদিন পরে সে আজ প্রসাদকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহার সেই জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল, তাঁহার সেই বালকের ন্যায় সরল স্বভাব দেখিয়া গোপীনাথ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, সহসা আর উঠিতে পারিল না। প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা! তোমরা এই পূজার সময় কে কেমন ভাবে কাটাইলে বল ?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"ভাই! আমাদের আর পূজার সময় বা অন্য সময় কি! "যথা পূর্ব্বং তথা পরম্" মায়ের দয়া আর আমাদের প্রতি কই' যে সময়ের ইতর বিশেষ হইবে ?"

প্রসাদ। সে কি ভাই! মায়ের দয়া নাই! দয়াময়ীর দয়া না থাকিলে কি তুমি, আমি বা জগৎ তিলেকের জন্য স্থির থাকিতে পারে ? দয়াময়ীর তিল মাত্র দয়ার ব্যতিক্রম হইলে যে আমাদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ হইয়া যাইবে, তবে এ অসম্ভব কথা কেন বলিলে ভাই ?

গোপীনাথ। অসম্ভব নয় ভাই! কথাটা ঠিক, এ সময় ভাল করিয়া পেট ভরিয়া খাইলে অথবা আমোদ-প্রমোদ কাটাইলে আর সময় ভাল যাওয়া হইল কই। এদিকে যে ভয়ানক একটা নিরানন্দের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, মা ত আমাদের তার জন্য কিছু সুপন্থা দেখাইয়া দিতেছেন না ?

প্রসাদ। ভাই! তিনি ত সমস্ত পন্থাই তোমার চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়াছেন, তোমাকে বিবেকবুদ্ধি দিয়াছেন, সেই বিবেকবুদ্ধি-অনুসারে একটা পন্থার অনুসরণ কর—সময় ভাল হইয়া যাইবে, চিরদিন সমানভাবে আনন্দে মত্ত থাকিবে এবং দুদিন পরে সে দুর্দ্দিনে দিনমণি-সুতের আগমনে তোমাকে সভয়-চিত্তে আর নিরানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হইবে না।

গোপীনাথ। প্রসাদ! মা তোমাকে সুপথ-কুপথ বলিয়া দিয়াছেন, পথের সরলতা-কুটিলতা বুঝাইয়া দিয়াছেন, বিবেকশক্তির স্ফুরণ করিয়া দিয়াছেন, আর আমাদের ত তাহা দেন নাই, আমরা অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিতেছি, দিশাহারা

হইয়া সুপথ-কুপথ চিনিয়া লইতে পারিতেছি না ; ইহার জন্ত দোষ কার ?

প্রসাদ। ভাই! দোষ তাঁর নয়,—তোমার, তুমি যদি মাকে ভাল করিয়া বল, তাহার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ কর, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তোমার কথা শুনেন—তোমাকে হাত ধরিয়া সহজ পথ দেখাইয়া দেন কিন্তু তোমার ত তাঁহাকে কিছু বল না, তবে মা কেমন করিয়া তোমার মনের মত কাজ করিবেন ?

পণ্ডিত। হাঁ৷ প্রসাদ! এ যে কথা বলিয়াছে—ইহার আর উত্তর নাই ; আগ্রহ না থাকিলে তাঁহার দয়া কেমন করিয়া লাভ হইবে ?

ভজহরি। আমাদের ওসকল বিষয়ে আগ্রহ কিছুমাত্র নাই, কেবল কেমন করিয়া সুখে থাকিব, খাওয়া পরা ভাল হইবে ; ইহাতেই আমাদের আকাজ্ঞা বেশী, নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্যে উদরপূর্ত্তি করিতে পারিলেই আমরা সুখী এবং সেই সুখলাভের জন্ত কত প্রকার হিংসাবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, ধর্ম্মের ভাণে কত অধর্ম্ম কার্য্য অবাধে সঞ্চয় করিতেছি, ইহাতে কি আর কখন শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে ?

প্রসাদ। ভজহরি! তুমি এ আবার কি কথা আনিয়া ফেলিলে ধান ভানিতে শিবের গীত কেন ?

পণ্ডিত। ভাই! আমাদের এই সকাম পূজাদিতে ভজহরির বড়ই আক্রোশ জন্মিয়াছে, এবার মুখুজ্যের বাটীর পূজা দেখিয়া সে এ সকল কাম্যকর্ম্মে একেবারে হতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল বলিতেছে—এ সকল পূজায় পুণ্যার্জ্জন না করিয়া আমরা প্রকারান্তরে পাপই অর্জ্জন করিয়া থাকি।

প্রসাদ। ভজহরি! এতদিনের পর তোমার আবার এরূপ ভাবোদয় হইল কেন ? শাস্ত্রপ্রণোদিত এ সকল কাম্যকর্ম্ম অবশ্য করণীয়—ধর্ম্ম উপার্জ্জনের এমন সহজ পন্থা আর নাই ; ইহা আবহমান কাল অপ্রতিহতপ্রভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখন তোমার ন্যায় সামান্ত ব্যক্তি ইহার এরূপ ভাবে নিন্দা করিলে, তোমাকে লোকে উন্মাদ ভিন্ন আর কিছুই বলিবে না। যাহা আর্য্যঋষিগণের অনুমোদিত—শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহার প্রতি-দোষারোপ করা কি বাতুলতা নয় ?

ভজহরি। দেখ ভাই! পূজার প্রতি দোষারোপ করিতেছি না, সাকার পূজায় যে ভক্তির উদ্রেক হয় এবং তাহা যে খুব ভাল, সে বিষয় এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইলে মূর্ত্তি-পূজাই যে শ্রেষ্ঠ-উপায়, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। তুমি সে দিন এ বিষয়ে আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছ কিন্তু স্থানে স্থানে ঐ মূর্ত্তির সম্মুখে যে বলিপ্রদান করা

হইয়া থাকে—উহা দেখিলে আমার বড়ই দুঃখ হয়, সেদিন মুখুয্যেদের বাটীতে বলি দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। পূজা করিতে যাইয়া, মাকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া এরূপ একটা নৃশংস কার্য্য সম্পাদন করা কোন ক্রমেই উচিত নয় ? ইহা কি শাস্ত্রানুমোদিত ?

প্রসাদ। তোমার কি বিবেচনা হয় ?

ভজহরি। আমার বিবেচনায় ইহা আদৌ শাস্ত্রানুমোদিত নহে, কেবল কতকগুলি পেটুক লোক নিজ উদরপূর্ত্তির জন্য ইহাকে ধর্ম্মের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে :—যখন প্রত্যেক জীবের মধ্যে চৈতন্যরূপী আত্মা বর্ত্তমান, যখন তিনি মানুষেও আছেন ; পশুতেও আছেন, তখন ধর্ম্মের নামে তাহাদের হত্যা করিয়া কি যে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়—বলিতে পারি না, কেবল প্রচ্ছন্নভাবে উদর-পূরণ-ধর্ম্মই আমি উহার মধ্যে নিহিত দেখিতে পাই।

প্রসাদ। বলিদান কার্য্যটী শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয়—ইহা লইয়া তোমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে নয় ?

ভজহরি। খুব সন্দেহ। প্রত্যেক জীবে যখন চৈতন্যময় ভগবান অধিষ্ঠিত, তখন জীববলিদানে পাপ স্পর্শিবে না কেন ?

প্রসাদ। প্রত্যেক প্রাণীতেই চৈতন্যসত্ত্বার স্ফুরণ আছে। জীবমাত্রেই চৈতন্যের বিকাশ—ইহা খুব সত্য কিন্তু আধারের বিশেষত্বে চৈতন্যের বিশেষত্ব হয় —তাহা কি বিশ্বাস কর ?

ভজহরি। সে কিরূপ ভাই! দয়া করিয়া সে দিনকার মত এ জটিলতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া আমার দারুণ সন্দেহ অপনোদন কর, বাস্তবিক সে দিন মাতৃ-মূর্ত্তির সম্মুখে ছাগশিশুর সেই কম্পান্বিত কলেবর, সেই আর্ত্ত করুণ রোদন, অবশেষে নিষ্ঠুর ভাবে তাহার ছেদন দেখিয়া আমার প্রাণে যুগপৎ সন্দেহ ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে।

প্রসাদ। আধারবিশেষে যে চৈতন্যের ইতর-বিশেষ হয়—তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ মানুষের ভিতর যে চৈতন্য, ছাগলের ভিতর সে চৈতন্য নাই। চৈতন্য এক হইলে ছাগলে আর মানুষেও এক হইত, যখন ছাগলে ও মানুষে এক নহে, তখন চৈতন্যেরও ইতর-বিশেষ আছে। মলিন-দর্পণে যেরূপ প্রতিবিম্ব পড়ে, নির্ম্মল-দর্পণে তাহা অপেক্ষা ভাল পড়ে—ইহা বোধ হয় স্বীকার কর।

ভজহরি। হাঁ, সে বিষয়ে কেহ অস্বীকার করিতে পারেনা, আমিও অস্বীকার করিনা।

প্রসাদ। মানুষের চৈতন্য ও ছাগলের চৈতন্য ঠিক এক নহে, জিনিষ এক হইলেও আধার বিশেষে পার্থক্য হইয়াছে। প্রতিবিম্ব এক কিন্তু সমল ও নির্ম্মল বা ছোট ও বড় দর্পণে পড়িয়া যেমন পৃথক দেখায়—ইহাও সেইরূপ। এখন বুঝিতে পারিলে যে চৈতন্য এক হইলেও ছাগলের চৈতন্য আর মানুষের চৈতন্য এক নয়?

ভজহরি। হাঁ, আধার-অনুসারে আধেয় ত পৃথক্ ভাবাপন্ন হইবেই—তাহাতে আর ভুল কি?

প্রসাদ। দেখ, পূজা আত্ম-কার্য্য, নিজের কাজ বলিয়া পূজা করিবেন—পুরোহিত তন্ত্রধারক মাত্র থাকিবেন, কোন বিষয় ভুল হইলে তিনি পুঁথি দেখিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন—ইহাই হইল পূজার নিয়ম, পূজা কখনও প্রতিনিধি দ্বারা হয় না, আমার কাজ অপরের দ্বারা সমাহিত হইতে পারে না। এখন কিন্তু অপারকতা বা অনিচ্ছাহেতু স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, প্রতিনিধিরূপে পুরোহিত মহাশয়ের দ্বারাই পূজা হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাটীতে অধুনা তাহাই হইয়া থাকে, কারণ এখন আর তাহাদের বংশে কেহ সাধনক্ষম লোক নাই, পুণ্যবান্ সাধক নিজে দেবীর আবাহন করিয়া পূজা করিলে আর ঐরূপ হয় না।

ভজহরি। নিজে পূজা করিলেও ত বলি করিতে হইবে?

প্রসাদ। বলি যে পূজার অঙ্গ গো, উহা যে শাস্ত্রবিহিত কার্য্য, করিতে হইবে না ত কি?

ভজহরি। শাস্ত্র ঐরূপ নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দিয়াছেন?

প্রসাদ। বলি কি নিষ্ঠুরতা? যদি যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ঐরূপ কোমলতার কার্য্য, ঐরূপ ত্যাগ বা উচ্চ হৃদয়ের পরিচায়ক-অনুষ্ঠান সাধকের কি আর আছে?

ভজহরি। বল কি ভাই? ইহাতে কি কোমলতা এবং হৃদয়বত্তার পরিচয় আছে—আমাকে বুঝাইয়া বল, প্রসাদ! আমি সে দিন হইতে বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছি, দয়া করে আমার সন্দেহ দূর কর।

প্রসাদ। দেখ; যে নিজে পশু, সে পশু বলি করিতে পারে না, করিলে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয় কিন্তু যে সাধক, সাধন-ভজন করিয়া যে বিশেষ পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে, যে নিজেকে পুণ্যপূত করিয়া ঐ পশুজীবন পুণ্যময় করিতে পারিবে, আপনার পুণ্যের অংশ প্রদান করিয়া যে ঐ পশুটির উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে, এমন ক্ষমতা যাহার জন্মিয়াছে—তাহারই পক্ষে বলি প্রশস্ত

এবং তিনিই বলিপ্রদান করিবার উপযুক্ত পাত্র, অন্যে করিলে জীব-হিংসাজনিত পাপ ভাগী হইতে হয়।

ভজহরি আজ কঠিন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, প্রসাদ তাহার মীমাংসা করিতেছেন, আর পণ্ডিত ও গোপীনাথ এই অতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক, তাঁহারাও লোলুপনেত্রে প্রসাদের বদনের প্রতি তাকাইয়া বসিয়া আছেন। ভজহরি প্রসাদের সহিত উত্তর, প্রতি-উত্তর করিতেছেন। ভজহরি বলিল,—"ভাই! বেশ ভাল বুঝিতে পারিলাম না, আরও একটু বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

প্রসাদ। মানুষে যে চৈতন্য থাকে, ছাগলে তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট চৈতন্য থাকে—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষ পুণ্যবলে ছাগলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জন্ম-লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম বা সাধন বলেই পশু-অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠপ্রাণী, তুমি যখন পুণ্যাত্মা, যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার, সাধন-ভজনে অনুরক্ত মায়ের প্রিয় সন্তান, তুমি অপর একটী নিকৃষ্টজীবকে উদ্ধার করিতেও সমর্থ। যদি সমর্থ না হও, যদি তোমার সে তেজঃ, সে পুণ্য না থাকে, তবে তুমি মানুষ নও। এ কার্য্যে অগ্রসর যে সাধক তাঁহার সে ক্ষমতা আছে, নিজের পুণ্যাংশ প্রদান করিয়া তিনি একটা পশুর পশুপাশ বিমুক্ত করিতে সমর্থ, তাই তিনি অভীষ্ট-ফলদাত্রী, বিশ্বজননীর সম্মুখে, তাঁহার এই পরম শুভ-মুহূর্ত্তে, পরম আনন্দদায়ক মাতৃসম্মিলনের পবিত্রবাসের এরূপ একটী মহাপুণ্যকর, পরোপকারক ব্রতানুষ্ঠানে অসীম-ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন। সাধক যখন পশুর যাবতীয় অঙ্গ সুসংস্কৃত করিয়া "পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ" এই মন্ত্র তাহার কর্ণে শ্রবণ করাইয়া দেন এবং বন্ধন মোচন করিয়া বলেন—"রক্ষার্থং বন্ধনস্থোহসি মুক্তয়ে মোচিতো ময়া। দেবীপ্রীতিং সমুৎপাদ্য স্বর্গং গচ্ছ পশূত্তম।" তখন সেই দীক্ষিত-পশু আর চীৎকার করে না বা পলাইয়া যায় না, তখন সে আনন্দিত মনে তাহার সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করে—তাহার চৈতন্য সঞ্চার হয়। তখন "পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ" বলিয়া তাহাকে শিব-স্বরূপ ভাবনা করিতে হয়। সেই পূজা এবং ন্যাসাদি কার্য্য যদি যথার্থরূপে সাধক দ্বারা সমাহিত হয়, তাহা হইলে সে পশু হৃষ্টান্তঃকরণে হাঁড়িকাষ্ঠের সম্মুখে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, কদাচ পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে না। সাধককে তখন পশুর অঙ্গে দেবতার পূজা সমাধা করিয়া করযোড়ে বলিতে হইবে—"ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণং॥" অতএব বলির উদ্দেশ্য নিজে ধন্য হওয়া এবং সেই পশুটাকে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোহস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোহবধঃ॥

আরও বলিয়াছেন :—

ঔষধ্যঃ পশবো বৃক্ষা স্তির্য্যগ্ যোনিশ্চ পক্ষিণঃ।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তা প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তমাং গতিম্॥
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
তত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥
এম্বর্থেষু পশূন্ হিংস্যাৎ দেবতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্॥

ভাই ভজহরি! মনুর স্মৃতি সকলের শ্রেষ্ঠ; তিনি যখন এ বিষয়ে মত প্রদান করিতেছেন, তখন বলিদান শাস্ত্র বিরুদ্ধ কেমন করিয়া বলা যায়? আর উপরোক্ত ইচ্ছাই যদি সাধকের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে, তিনি আপনার তপস্যার্জ্জিত পুণ্য প্রদান করিয়া যদি তাহার উদ্ধার সাধনের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বলিদান দোষ কি?

ভজহরি। আচ্ছা ভাই! অনেক শাস্ত্রেও ত বলিদানের দোষ দেখাইয়া গিয়াছেন।

প্রসাদ। যেমন অনেক শাস্ত্রে দোষ দেখাইয়া গিয়াছেন, তেমন অনেক শাস্ত্রেও আবার বলির ব্যবস্থাও দিয়াছেন। তবে যুক্তির আধিক্য দেখিয়া এবং নিজের ক্ষমতা বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে—শাস্ত্র আরও বলিতেছেন ;—

বিনা বলিপ্রদানেন যদি শক্তিং প্রপূজয়েৎ।
শক্তিহত্যামবাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যাং পদে পদে॥

গায়ত্রীতন্ত্র ৩য় পটল।

অনেকানেক পুরাণে বৌদ্ধমতে বলিদানের দোষ দেখাইয়াছে। তাহাতেই বোধ হয়—তোমার ভ্রম জন্মিয়াছে?

ভজহরি। আচ্ছা! মাংসপ্রিয় ব্যক্তিগণ গায়ত্রীতন্ত্রে ঐরূপ একটা শ্লোক লিখিয়া দিতেও পারেন ত?

রামপ্রসাদ। ইহা অসম্ভব—আচ্ছা, তাহাই যেন হইল, কিন্তু মনুর স্মৃতি আমাদের সকল স্মৃতি অপেক্ষা গ্রাহ্য। কারণ হিন্দুর সকল কার্য্য মনুর স্মৃতি অনুসারে পরিচালিত, আরও এক কথা, ত্রেতা দ্বাপর যুগেও "যজ্ঞার্থে পশুবধ" প্রচলিত ছিল। বৈধ পশুবধে দোষ নাই বলিয়া তখনকার ব্রহ্মভাবাপন্ন ঋষিগণও উহার পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও উহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অবৈধ এবং শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলে, ইহাতে একটা গূঢ় মর্ম্ম না থাকিলে, তাঁহারা কখনই ইহার অনুমোদন করিতেন না।

গোপীনাথ। ভাই! আমার একটী সন্দেহ হইতেছে, ভজহরির কথার পোষকতা করিয়া আমিও বলি—যদি বলি না দেওয়া হয় অথবা প্রতিনিধিরূপে অর্থাৎ ইক্ষুদণ্ড, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়—তাহাতে দোষ কি?

রামপ্রসাদ। দেখ ভাই! মুখ্যের অভাবেই প্রতিনিধির ব্যবস্থা, যাহার মুখ্যে শ্রদ্ধা নাই তাহার প্রতিনিধিতে ফল কি, না দেওয়াই ভাল, উহাতে ফল ভাল হয় না। প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য। প্রকৃতি-বিরুদ্ধ উপাসনা কখনও ফলদায়ক হইতে পারে না। এই মায়ার সংসারে মায়াভিভূত জীব যদি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাতে প্রবৃত্তি বা অনুরাগ জন্মাইতে পারে না। আমাদের দেবোদ্দেশে যে সকল মন্ত্র বা উপচার প্রদান করিতে হয়, তৎ সমস্তই আত্মবৎ ভাবে করিতে হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য প্রবলভাবে ভক্তির উদ্রেক করা মাত্র। ভাই! যাহার ভক্তিভাব সহজেই উচ্ছ্বসিত হয়, তাহার অপর কোন আড়ম্বরের আবশ্যক হয় না। এ জগতে সকলের প্রকৃতি সমান নহে—কেহ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, কাহার প্রকৃতি রজোগুণাশ্রিত আবার কেহ বা ঘোর তমোগুণান্বিত। অতএব যাহার যেরূপ প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি তাহার সেইরূপ ভাবে পূজা করা উচিত, না করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফল পাইবে না। তবে সাত্ত্বিক ভাব এবং ঐ প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিই সকলের শ্রেষ্ঠ, তামসিক ও রাজসিক ভাবে পূজা করিতে করিতে ক্রমে ঐ পরমভাব বা প্রকৃতি আপনাআপনি লাভ হইয়া থাকে। উপাসনাদি কার্য্য কেবল প্রকৃতিকে ভক্তিময় করিবার জন্য অর্থাৎ ভক্তিময় সাত্ত্বিক ভাবের ভাবুক হইবার জন্য। তুমি তামসিক বা রাজসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি, তোমার প্রকৃতি অনুসারেই উপাসনা কর, করিতে করিতে ক্রমেই তোমার হৃদয় সাত্ত্বিক ভাবে ভরিয়া উঠিবে। তুমি যেরূপ প্রকৃতির লোক হওনা কেন, মায়ের পূজা উপাসনা করিতে করিতে লৌহ চুম্বক আকর্ষণের ন্যায় তোমার হৃদয় ক্রমশঃ ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইবেই হইবে। পরা ভক্তির উদ্রেকই সাত্ত্বিক প্রকৃতির লক্ষণ, কৃপণের যেমন ধনের প্রতি আসক্তি, স্ত্রৈণ ব্যক্তির যেমন স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, পরাভক্তি সম্পন্ন সাত্ত্বিক ব্যক্তিরও তদ্রূপ মায়ের প্রতি আসক্তি, এই পরাভক্তি লাভ হইলে জীব ও ভগবান্ এক হইয়া যায়, আর স্বতন্ত্র পার্থক্য থাকে না। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ একই জিনিষ, কেবল পাত্র ভেদে নামান্তর মাত্র, এ তিনেরই অর্থ অন্তরের সহিত ভালবাসা। কোন প্রিয়

বস্তু লাভ হইলে আপনার ভালবাসার জনকে দিয়া বা তাহাকে খাওয়াইয়া যত তৃপ্তি বোধ হয়, তত যেন আর কিছুতেই হয় না। ভগবানের প্রতি ভক্তেরও সেইরূপ ভাব, তাঁহাকে অভেদজ্ঞান . অর্চ্চনা করাই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ, তাই শাস্ত্র বলেন—"শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ" শিবময় হইয়া মঙ্গলময় শিবের পূজা করিতে হয়। সেইরূপ যখন যে ব্যক্তি যে দেবতার পূজা করিবে, তখন তাহাকে আত্মবৎ অর্থাৎ নিজ প্রকৃতির অনুরূপে চিন্তা এবং নিজের প্রবৃত্তি মত সেবা করিতে হইবে। প্রিয়বস্তু যেমন প্রিয়জনকে প্রদান করিয়া তৃপ্তিবোধ হয়, সেইরূপ প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেবীকেও আপনার সমস্ত প্রিয়বস্তু প্রদান করা উচিত—নতুবা আত্মবৎ পূজা হয় না। তবে যে সকল বস্তু অস্বাস্থ্যকর এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ তাহা নিজের প্রিয় হইলেও প্রিয়জনকে এবং ভগবানকে উপচাররূপে প্রদান করিতে নাই। মা আমার ভাবময়ী, তিনি সাধকের মনোভাব গ্রহণ করেন মাত্র। এখন কথা হইতেছে—শাস্ত্রনিষিদ্ধ, অহিতকর বস্তু ভিন্ন যাহা তোমার প্রিয়, ইষ্টদেবতাকে তাহাই প্রদান করিবে। এ জগতে প্রকৃতি ভেদে সকল বস্তুই সকলের প্রিয় বা অপ্রিয় নহে, তুমি যাহা ভালবাস, আমি হয়ত তাহা ভালবাসি না; আমি যাহা ভালবাসি অপরে হয়ত তাহা দেখিতে পারে না; সাত্ত্বিক লোকের আহার রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোকের রসনা তৃপ্তিকর হইতে পারে না। রাজস ও তামস প্রকৃতির পক্ষে মৎস্য-মাংসই প্রিয় খাদ্য, তাহারা ভগবানের অর্চ্চনার সময় তদ্দ্বারাই তাঁহার সেবা করিবে। সাত্ত্বিক সাধক জপ, তপ, নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তি আড়ম্বরের সহিত দেবতার পূজা করে, আর সাত্ত্বিক ব্যক্তি আড়ম্বর রহিত হইয়া অনাসক্ত ভাবে পূজায় ব্রতী হয়, কিন্তু আজ কাল এরূপ লোক অতি দুর্লভ। যাঁহারা এরূপ প্রকৃতির লোক তাঁহারা ত বাহ্যিকভাবে অর্চ্চনা খুব কমই করেন—তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও, তবে বৈধ বলিদানে সকলেরই অধিকার আছে। বৈষ্ণবের ইষ্টদেবতা ভগবান্ বিষ্ণুও প্রকৃতিভেদে বলির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন এবং তিনি তাহা ভক্তের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ইহাতে ক্রমশঃ আসক্তি কমিয়া আসিয়া অনাসক্তির ভাব বদ্ধমূল হইয়া থাকে, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি শীঘ্র সংসাধিত হয়, এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

বিষয়াকৃষ্টচিত্তস্য যন্মহৌষধমুচ্যতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্তবস্তূনাং ভগবত্যৈ সমর্পণম্॥

যে বিষয়ে যাহার যত বেশী আসক্তি, দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া সে সে

বিষয়ের আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে চেষ্টা করিলেই ক্রমশঃই তাহাতে অনাসক্তির উদ্রেক হইয়া নিস্পৃহ বা ত্যাগী হইতে পারিবে। তুমি যদি মৎস্য-মাংস ভোজনে বিশেষ আসক্ত হও, যদি তাহার আহারে তোমার অত্যধিক প্রবৃত্তি থাকে, তাহা কোন প্রকারে ছাড়িবার যদি উপায় নিরাকরণ করিতে না পার, তাই৷ হইলে ভক্তিভাবে, শ্রদ্ধা সহকারে ঐ সকল দ্রব্য ভগবানে উৎসর্গ করিয়া, শাস্ত্রীয় বিধান মতে ভগবচ্চরণে সমর্পণ করত তাঁহার প্রসাদ গ্রহণে অভিলাষী হও; তাহা হইলেই দেখিবে তোমার মৎস্য-মাংস ভোজনে রসনা-তৃপ্তির উৎকট আকাঙ্ক্ষা অচিরেই সংযত হইয়া যাইবে। যথেচ্ছাচারী হইয়া যাহা তুমি অনবরত আহারের আকাঙ্ক্ষা করিতে, এক্ষণে নিয়ম বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মভাবে তাহার পরিচালনা করিলে, দেখিবে খুব সত্বরই তোমার নিবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। শাস্ত্রমতে বৃথামাংস হিন্দুর ভোজন-নিষিদ্ধ। তবে প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে একেবারে বন্ধ করিলে হয়ত হিতে বিপরীত হইতে পারে, এইজন্য শাস্ত্রকারগণ সকাম উপাসককে এইরূপ ভাবে ক্রমশঃ নিবৃত্তির পথে আনিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। সাকার পূজা করিতে করিতে যেমন ভক্ত সাধক নিরাকারের অধিকারী হন, শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ পূর্ব্বক প্রবৃত্তি মার্গে ঘুরিতে ঘুরিতে সাধকও তেমনি নিবৃত্তি লাভ করিয়া জ্ঞানের অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে। হিন্দু যে কোন কার্য্যই করুক—অশাস্ত্রীয় করে না, সকল কার্য্যই যে তাহাদের শাস্ত্রানুমোদিত; বিধিবিহিত ভাবে আচরিত হইলে যে ঐ সকলে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, তাহা বুঝাইবার জন্যই আজ এত কথা বলিলাম। এখন সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে কি? সকলেই একবাক্যে বলিল—'হাঁ, এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, হিন্দু যাহা কিছু করিয়া থাকে, তৎসমস্তই শাস্ত্রানুমোদিত এবং ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে অধিকারী ভেদে তাহা যে আমাদের মঙ্গলপ্রদ, তোমার আজিকার কথায় এখন আমাদের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

তর্কভূষণ মহাশয় এই কথার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন অবস্থায় মানব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে এবং মুক্তি-পথের অধিকারী হয়। সকাম অর্থাৎ প্রবৃত্তি মূলক ভাব ত মুক্তিপথের বিরোধী। তবে জীবের মুক্তি কি অবস্থা হইতে হইয়া থাকে?

রামপ্রসাদ। মানব যতক্ষণ না সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইতে পারে, যতদিন না তাঁহারা নিষ্কাম হয়, ততদিন তাহাদের মুক্তি হয় না, সাত্ত্বিক অবস্থা দ্বিজত্বের অবস্থা, এইজন্য দ্বিজজাতি সকল জাতির এবং সকল অবস্থার শ্রেষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত, অতএব মুক্তি তাহাদের করতলগত, এইজন্য প্রত্যেক জীবের মুক্তির পূর্ব্বে সাত্ত্বিক

ভাবাপন্ন অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভ করিতে হয়। অপরাপর জাতি ক্রমশঃ সংস্কার দ্বারা দ্বিজ হয় আর ব্রাহ্মণগণ অপরাপর হীনাবস্থা হইতে সাত্ত্বিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে দ্বিজত্ব লাভ করিয়া মুক্তিপথের পথিক হইয়াছে—এইজন্য তাঁহারাই যথার্থ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির মুক্তিলাভের অধিকার নাই, মুক্ত হইবার পূর্ব্বে তোমাকে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন দ্বিজ হইতেই হইবে। অদৃষ্টক্রমে অন্য কোন জাতি যদি সাধন বলে মুক্তির উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেও যে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন দ্বিজ হইয়াছে—তাহা বুঝিতে হইবে, তবে অন্য জাতির মধ্যে এরূপ সৌভাগ্য খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রেতাযুগে নীচ জাতির মধ্যে এক গুহক চণ্ডাল এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সাত্ত্বিক ভাবের ভাবুক হইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বন্ধু ভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন। সাত্ত্বিক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের আসন জগতে সকল জাতির উপর। তাঁহারাই তুরীয়-অবস্থাপন্ন দেবত্বে উন্নীত হইয়া মরজীবন হইতে মুক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র।

তর্কভূষণ। আজকাল যে সকল ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহারা সকলেই কি তাই?

—রামপ্রসাদ। হওয়া ত উচিত, নিষ্কামী-ত্যাগী, অতএব সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হওয়াই ত ব্রাহ্মণের লক্ষণ; যদি না হয়, তাহা হইলে পতিত বলিতে হইবে, এরূপ পতন ত দেবতাদের মধ্যেও হইয়া থাকে, উত্থান-পতন কাল মাহাত্ম্য জানিবে।

আজ প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল বিচার-বিতর্ক চলিয়াছে, ভক্তবীর রামপ্রসাদ আর এসকল বিষয়ে মনঃসংযোগ না করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, সমস্তদিন বৃথা কাজে ব্যয়িত হইয়াছে দেখিয়া তিনি নিজের সিদ্ধাসনে গমন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। এদিকেও বেলা পড়িয়া আসিল, দিনকর ক্রমশঃ নিশাকর-করে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণমানসে অস্তাচলে চলিলেন। প্রসাদ এক পা দু'পা করিয়া বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত উদ্যান-মধ্যস্থিত পঞ্চবটীমধ্যে নিজের প্রিয় আসনে আসিয়া সমাসীন হইলেন।

পণ্ডিত, গোপীনাথ ও ভজহরি কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া এই মুক্ত পুরুষের সৌভাগ্যের বিষয় কত জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"ভাই! প্রসাদের যে অবস্থা হইয়াছে, উহা কি এক জন্মের সাধনার ফল, প্রসাদ যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ও অবস্থার তুলনা নাই। জগতে চিরানন্দ উপভোগ একমাত্র রামপ্রসাদের ন্যায় পরম বিশ্বাসী মাতৃভক্ত সাধক ভিন্ন আর কাহার ভাগ্যে ঘটে না। ধনে এ ধন পাওয়া যায় না, এমন কি জগৎ বিনিময় করিলেও এ অপার্থিব আনন্দ উপভোগের সম্ভাবনা নাই। রাজা মহারাজা

অতুল ধনের অধীশ্বর, অর্থাৎ জয় করিয়া ইঁহারাই অধিপতিরূপে সুখ-দুঃখের অধিকারী হইয়াছেন। আর প্রসাদ ত্রিলোকের অধীশ্বরীকে ভক্তিডোরে আবদ্ধ করিয়া হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপিত করত যে বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছে, যে সুখ-সাগরে ভাসিতেছে, তাহার আর জোয়ার-ভাটা নাই, কেবল একটানা আনন্দস্রোতে ভাসিয়া আপন হারা হইতেছে এখন তাহার অবস্থা কিরূপ দেখিতেছ কি? সকল সময়েই ত যেন তাঁহার আত্মভোলা ভাব, কখন কি করে, কি বলে তাহার স্থিরতা নাই, অতি শিশু পুত্রও যেন তাঁহার অপেক্ষা অবুঝভাবে থাকিতে পারে না, বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁহার একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, হিসাব করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই। আমরা তাহাকে পূর্ব্বাপর দেখিতেছি এবং তাহার অবস্থা জানি, তাই তাহাকে একজন মহাপুরুষ বলিব, কিন্তু যাহারা বুঝে সুঝে না, যাহারা তাহাকে এখনও দেখে নাই, তাহারা পাগল ভিন্ন আর কি বলিবে? এমন আত্মভোলা ভাবে বিভোর না হইলে কি কখন সেই ভোলানাথের মনোমোহিনী ভবভাবিনীর রাজীব চরণ লাভ এত সহজসাধ্য হয়!”

ভজহরি। ভাই! যেমনি রামপ্রসাদ আমার বউদিদিও ঠিক তেমনি, মরি মরি মা যেন আদর্শ-মিলন জগতে দেখাইবার জন্যই এই দুইটী স্ত্রীপুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্ব্বাণী এখন আর সংসারের কোন কাজ করেন না, জ্যেষ্ঠা বধূ-মাতার হাতে সংসারের যাবতীয় ভার সমর্পণ করিয়া ঠিক দেবতার মত এই দেবতুল্য স্বামীর অর্চ্চনা করেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমি সময়ে সময়ে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারি না।

গোপীনাথ একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ইহার আর বিচিত্রতা কি? দেবতার কৃপাকটাক্ষ যেখানে পতিত, চারিদিকেই তাহার মঙ্গল সূচিত হইয়া থাকে।

ভজহরি। ঘরের ছেলে পিলে, বউ ঝি, যাহাকেই দেখ যেন সকলে এক একটি ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, শিশু পুত্র রামদুলাল, তাহার এখন ভাল বোল ফোটে নাই, সেও সেদিন হরিবৈষ্ণবের কচি মেয়েটার গায়ে কাপড় ছিল না বলে, নিজের নূতন দোলাইখানা তাহাকে অম্লানবদনে দিয়ে এলো, একটু দ্বিধা বোধ কল্লে না।

পণ্ডিত। “যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে” সমস্তই মায়ের দয়া, এখন এরূপ মহাপুরুষ কিছুদিন জীবিত থাকিয়া আমাদের দেশ পবিত্র করুন, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহাকে দর্শন করিলেও মহাপুণ্য।

গোপীনাথ। তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে। মা তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি করুন।

এইরূপে সকলে পরম ভক্ত প্রসাদের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে সেদিন-কার মত যে যার স্থানে চলিয়া গেলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রসাদের সাধন-সম্বন্ধে নানা কথা

অনেকেই বলেন,—প্রসাদ প্রথম অবস্থায় জড়োপাসক ছিলেন অর্থাৎ সাকার অর্থাৎ সকাম ভাবে পূজা করিতেন, তারপর তাঁহার মত ভিন্নভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি সকাম ও সাকার উপাসনা ছাড়িয়া ব্রহ্মভাবের ভাবুক হইয়া-ছিলেন। কিন্তু এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, কেন না তাঁহার প্রপৌত্র ৺দুর্গাদাস সেন মহাশয়ের সহিত আমাদের আলাপ ছিল, সামান্য দিন হইল, তিনি গরলগাছা গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার মুখে শুনা গিয়াছে—প্রসাদ আজীবন সাকার ভাবে মূর্ত্তি পূজা করিয়াই দেবীর আরাধনা করিতেন। তাঁহার যাবতীয় সঙ্গীত এবং কালীপূজার প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়ে তাঁহার দেহ ত্যাগই তাঁহার সাকারবাদের অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ। আরও প্রমাণ এই যে তান্ত্রিক সাধক ভিন্ন নিরাকারবাদিগণ কখন পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রস্তুত করিয়া সাধনা করেন না, এ সকল সাকারবাদী সাধকেরই অনুষ্ঠেয় বিষয়।

রামপ্রসাদ জ্ঞানের গভীরতায় দেবীকে কখন সাকার, কখন নিরাকার, কখন তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তি কল্পনা করিতেন। তাঁহার একটী গানে আছে—"তারা আমার নিরাকারা"—এইটুকু দেখিয়াই তাঁহাকে নিরাকারবাদী সাব্যস্ত করা নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য। তাঁহার আরও অনেক গানে আছে—"শ্যামা ঘটে পটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।" ইহাতে তাঁহাকে সাকারবাদী ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। নিরাকারবাদীরা কখনও পূজা করেন না, ভগবানকে পূজা বা উপাসনা দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে মূর্ত্তির ভাবনা করিতেই হইবে। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী, মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।" নিরাকারের কখনও পদকল্পনা হইতে পারে না। ব্রহ্ম যখন নিরাকার—সাধক যখন এই নিরাকারের ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন—তখন তাঁহার পূজাদি করিবার আবশ্যক থাকে না, তখন তিনি নিজেই "সোঽহং", সাধকের সহিত সাধ্যবস্তুর তখন কিছুমাত্র প্রভেদভাব

থাকে না, কিন্তু প্রসাদ এ ভাব একদিনের জন্যও হৃদয়ে ধারণ করিতেন না। তুমি মা, আমি ছেলে, বা তুমি প্রভু, আমি দাস, এই ভাবেই তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র ছিল, একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবার বাসনা তাঁহার ছিল না, এই জন্য তিনি বলিতেন—"চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি," ইহাতেই বেশ বুঝা যায়, তিনি অহরহঃ গতায়াত করিয়া মায়ের সেবা করিতে পারিলে যত প্রীত, যত আনন্দিত, গতায়াত বন্ধ করিয়া মুক্তি লাভ করিলে তত আনন্দ পাইবার উপায় নাই, এই জন্য সকাম ও সাকার ভাব তাঁহার সাধনার মূল মন্ত্র ছিল। অপরে যাহাই বলুন—তিনি সাকার ও সকাম ভাবের সাধক ছিলেন, একথা আমরা তাঁহার প্রপৌত্র উক্ত ৺দুর্গাদাস সেন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি এবং তিনি গরলগাছা গ্রামে জীবিত থাকিয়া প্রসাদেরই প্রদর্শিত প্রথা অনুসারে কালীপূজা করিতেন—ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। ৺দুর্গাদাশ সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অমরনাথ সেন এখনও জীবিত থাকিয়া হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে বাস করিতেছেন, এ বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও ইহার সত্যতা বিষয়ে বিশেষ জানিতে পারা যাইবে।

এক দিন তাঁহার প্রিয়ভক্ত ভজহরি প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই প্রসাদ! মায়ের রূপ কিরূপ আমাকে বুঝাইয়া দাও, এমন বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিবার হেতু কি এবং ইহার প্রকৃত ভাবই বা কি, আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া না দিলে আর উপায় কি? আমি তোমার চির আশ্রিত—আমার প্রতি দয়া করিতে হইবে।

রামপ্রসাদ। অত ভণিতার আবশ্যক কি ভাই? যাহা তোমার আবশ্যক হইবে, জোর করিয়া বলিবে, তাহাতে কুণ্ঠা বোধ করিও না। মহাকালীর সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা অসাধ্য, তবে সাধ্যানুসারে কিছু বলিতেছি—শ্রবণ কর। মা আমার কালো কেন জান? কালো বর্ণে সমস্ত বর্ণ লয় হয়, মা হইতে জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছে এবং কালে ইহা মায়ের শরীরেই লয় পাইবে, এই জন্য মা আমার কালরূপা কালী। ঈশ্বরকে যদি নিরাকার পরব্রহ্ম এবং অবাঙ্মনসগোচর বলা যায় তাহা হইলে সাধারণ মানব নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদী হইয়া যাইবে, সে জন্য তিনি এক হইয়াও বহু, পুরুষ হইয়াও প্রকৃতি, মা আমার সেই অদ্বিতীয়-পুরুষের শক্তি, সেই অদ্বিতীয় পুরুষ ধ্যান-ধারণার অতীত, কাজেই তাঁহার শক্তিই আমাদের ধারণার বস্তু; মায়াযোগে তিনিই কালীরূপা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, তাঁহার এই চারিটি হাত, মা আমার ব্রহ্মের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি; তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী; কালে সমস্ত বস্তুই কালকামিনী

কালীর কাল দণ্ডে লয় পাইবে, এইজন্য মা আমার কালো একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রলয় কালে সমস্ত জগৎ গ্রাস করেন বলিয়া কালী করালবদনা, পাপীর পক্ষে ভয়ঙ্করা আর পুণ্যাত্মার পক্ষে অভয়দায়িনী, এইজন্য দক্ষিণহস্তদ্বয় ভক্তের জন্য আর বামহস্তদ্বয় অসি-মুণ্ডধরা—পাপীর জন্য, মায়ের কেশ-জাল জগতের মায়া-জাল, মায়া যেমন চির-বিস্তৃত ও দোলায়মান, কেশজালও তদ্রূপ। মা আমার দিগম্বরী, ইহা তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের পরিচয় দিতেছে। মা আমার চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এই ত্রিনয়ন দ্বারা জগৎ অবলোকন করিতেছেন—এইজন্য তিনি ত্রিনয়ন। কালীর বীজমন্ত্র অভীষ্টফলদায়ক এবং তাহার জপে কালের ভয় নাশ হয়।

রামপ্রসাদ এইরূপে ভজহরির নিকট মায়ের জপ এবং রূপ সম্বন্ধে বিবৃত করিয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহাকে মূর্ত্তি উপাসক না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। আর জগতে মূর্ত্তি উপাসক নয় কে? মূর্ত্তি ভিন্ন যেমন উপাসনা হয় না, তেমনি কামনা ভিন্ন সাধনা হয় না। প্রসাদের সকল কার্য্যে মায়ের উপর দৃঢ় নির্ভরতা দেখা যাইত। নিষ্কাম ও নিরাকার ভাব সাধকের নিজস্ব বস্তু, তাহা কাহাকেও উপদেশ বা লিখিয়া জানাইবার উপায় নাই, ইহা লিখিয়া বা ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ করিতে হইলেই সকাম ও সাকার ভাবে করিতে হইবে, নতুবা অন্য উপায় নাই। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু তাঁহারা কি সকাম এবং সাকার ভাবে কার্য্য করিতেন না?

রামপ্রসাদ সকাম ও সাকার ভাবেই সাধনা করিতেন, তবে তাঁহার কয়েকটি গানে যে নিষ্কাম ও নিরাকারের আভাস পাওয়া যায়, তাহা কেবল তাঁহার হৃদয়ের ক্ষণিক ভাবাবেশ মাত্র, রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলি যে এতদূর হৃদয়-গ্রাহী এবং উন্মাদনাময়, তাহার কারণ তিনি মায়ের সাকার মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ভক্তি-প্রাবল্যে তাহা গ্রথিত করিয়াছিলেন, ঠিক মাতা-পুত্রভাবে আব্দার করিয়া নিজের বচনবিন্যাস করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার গান এত কবিত্বপূর্ণ, তাঁহার অসাধারণ ভক্তিভাব ছিল বলিয়াই তাঁহার কল্পনার এত বৈচিত্র্য এবং সে বিচিত্রতা আমাদের নিকট এত মধুময়। রামপ্রসাদ ক্ষুদ্র বালকের মত জননীকে আপনার গর্ভধারিণীর মত দেখিতেন, তাই তিনি জীবনে কখনও কোন অভাব বোধ করেন নাই, ধর্ম্মশক্তি যাঁহার আছে—এ জগতে মা তাঁহার সকল সুখ-শান্তি ও মঙ্গল বিধান করেন। সাধকগণ দিবা অপেক্ষা রজনীযোগেই বেশী সাধনা করিয়া থাকেন, প্রসাদের সে বিষয়েও বিশেষ মনোযোগ ছিল, তিনি প্রায়ই রজনীযোগে সিদ্ধাসনে আপনার ইষ্ট দেবীর উদ্বোধন করিতেন এবং তাঁহার সমাধির অবস্থা রজনীতেই প্রগাঢ়রূপ ধারণ

করিত। সঙ্গীতেই মনের একাগ্রতা আনিতে পারে—এইজন্য সঙ্গীতজ্ঞব্যক্তি সাধনপথে অগ্রসর হইলে সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যেখানে যত সাধক সিদ্ধ হইয়াছেন—তাঁহাদের সকলেই প্রায় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। এইজন্যই "ভজন" নামে একরূপ ভাবের সঙ্গীত সাধনার জন্য প্রচলিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের রচিত অনেক সঙ্গীতে অশ্লীলতা ও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার কারণ তখন বঙ্গভাষা এখনকার মত এত মার্জ্জিত হয় নাই, কাজেই অতিশয় সরল করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে গ্রাম্য এবং সম্ভবমত অশ্লীল-ভাষা প্রয়োগ না করিলে উপায়ান্তর ছিল না। আমরা দেখিতে পাই—এক একজন কবি এক এক ভাবে আপনার কাব্য পরিপূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কাব্যে নবরসের আধিপত্য এবং একাধারে পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, রসিকতা ও ভাবুকতার ছড়াছড়ি, ঠিক এমনটী বাঙ্গালাদেশে আর কোনও কবির কাব্যমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—রামপ্রসাদ নামে পূর্ব্ববঙ্গে এবং কলিকাতায় আরও দুইজন সাধক ছিলেন। তাঁহারাও সঙ্গীত রচনা করিয়া আপনাদের সাধনশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অনেকের ধারণা তাঁহাদের অধিকাংশ সঙ্গীত, প্রসাদীসঙ্গীতসমুদ্রে লয় পাইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়ও ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়—কারণ ক্ষুদ্রশক্তি মহাশক্তিতে লয় পাওয়া অসম্ভব নহে। অন্য দুইজন রামপ্রসাদ যে বৈদ্য-রামপ্রসাদের মত মাতৃভক্ত এবং সিদ্ধ-সাধক ছিলেন, তাহা মনে হয় না, তবে তাঁহারা যে বিশেষ ভক্ত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এক্ষণে প্রসাদী সঙ্গীত-সাগর হইতে তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতগুলি বাছিয়া লইবার উপায় নাই, তবে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাষার যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য-দৃষ্টে আমরা যে দুই একটী সঙ্গীতে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা প্রচলিত দেখিতে পাই—তাহাই আমাদিগকে রামপ্রসাদদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী রামপ্রসাদের রচিত সঙ্গীত বলিয়াই অনুমান করিয়া লইতে হইবে। কলিকাতায় রামপ্রসাদ, কবিওয়ালা নীলুঠাকুরের কবির দলে গান বাঁধিতেন বটে, কিন্তু তিনি ভাল গাহিতে পারিতেন না বলিয়া একটা অখ্যাতি ছিল। ইঁহারা দুইজনেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইজন্য অনেকের অনুমান, তাঁহাদেরই দ্বিজ ভণিতাযুক্ত পদসকল আমাদের বৈদ্য-রামপ্রসাদের পদাবলীর মধ্যে সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এ যুক্তি আমাদের নিকট তত ভাল বিবেচনা হয় না, এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি—তাহা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়া দিয়াছি।

রামপ্রসাদের সঙ্গীত সংসারের সকল প্রকার অবস্থার মধ্যদিয়া ভুক্তভোগী-ভাবে-রচিত হইয়াছে, কাজেই শোক দুঃখের গুরুভার যখন সংসার-কান্তারে আমাদিগকে একান্ত ব্যতিব্যস্ত করে, যখন সেই অসহ্যভাবে আমরা অস্থির হইয়া জীবন বিভীষিকাময় বোধ করি—তখন তাঁহার সেই সমকালীন সঙ্গীত গাহিলে বাস্তবিক প্রাণে কি যেন এক অভাবনীয় অমিতশক্তির সঞ্চার হয়, হতাশ-বিষাদের অন্ধকার মধ্যে কে যেন আশার বাতি জ্বালিয়া বলে "মা ভৈঃ! জীব! ভয় কিরে, আমি যে তোদের মা আছি; আয় না কোলে করি।" সঙ্গীতে এমন প্রাণের কথা, এমন উচ্ছ্বাসময়ী সাধনশক্তির ভাব আর কেহ পরিস্ফুট করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ইহার প্রত্যেক স্বর-লহরীতে যেন সুধা ক্ষরিত হইতেছে। প্রসাদের জীবন-কুঞ্জে মাতৃ-প্রেরণায় যখন যে রাগিণী বাজিয়া উঠিত, তিনি ভক্তির অনন্ত-প্রবাহে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া গাহিতেন, ভালমন্দ বা ভাষা-পারিপাট্যের অপেক্ষা করিতেন না, এইজন্য তাঁহার গানের সমালোচনা করিতে হইলে—কেবল ভাষার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে, বাঙ্গলায় এমন কোন সমালোচক নাই, যিনি তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ না হইবেন। এককথায় এমন ভক্তিভাবমিশ্রিত-সঙ্গীতের কোথাও সামান্য ত্রুটি লক্ষিত হইলে, তাহার সমালোচনা করা চলে না। সমালোচক যদি গায়ক হয়েন এবং ভক্তিভাবে তিনি যদি প্রসাদের যে কোনও একটি সঙ্গীত গান করেন —তাহা হইলে বুঝিবেন—প্রসাদের গান কত উচ্চ-অঙ্গের এবং ইহার মধ্যে কি গভীর মাতৃপ্রেম, কি গভীর ঐকান্তিকতা একত্র জড়িত হইয়া নিহিত রহিয়াছে। তুমি যে কোনও সম্প্রদায়-ভুক্ত হও না কেন, প্রসাদের সঙ্গীত তোমাকে মুগ্ধ করিবেই করিবে। কাব্যে কবিকুলশিরোমণি কালিদাসের অতুলনীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু রামপ্রসাদ কোন কোন স্থলে তাঁহাকেও পরাজিত করিয়াছেন—বলিয়া বোধ হয়। "অভিজ্ঞানশকুন্তলে" কালিদাস শকুন্তলা-বিদায় চিত্র-চিত্রণে যে অপূর্ব্ব-করুণরসের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছেন, যে করুণ-রসের বিমল উৎসে কাব্য-জগৎ ভোরপুর, কালিদাসের সেই ভাব-তরঙ্গ পার্থিব-ভাবের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, কিন্তু ভক্তকবি রামপ্রসাদের আগমনী-সঙ্গীতে গিরিরাজের প্রতি গিরিরাণী মেনকার করুণ খেদোক্তি জাগতিক ভাবের অতীত, মানবীয় চিন্তাশক্তি সে ভাবশিখরে আরোহণ করিতে আদৌ সমর্থ নহে। বর্ষার মেঘ-মলিনতার অপগমে নির্ম্মল শারদীয় রজনীর সুপ্রভাতে বিহঙ্গমধ্বনির সহিত যখন ভক্তের ভক্তিভরা সুমধুর-কণ্ঠে উচ্চারিত হয়,—

গিরি! এবার আমার উমা এলে,
আর তারে পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া,
জামাই বলে মান্‌বো না।
শ্রীকবিরঞ্জন কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

শারদীয়-উৎসবের পূর্ব্বে যখন প্রতি ঘরে জগজ্জননী দুর্গার আগমন সূচিত হয়—যখন আমরা মন প্রাণে বিশ্বেশ্বরী উমার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকি, তখন প্রসাদের ঐ আগমনী-সঙ্গীতটী শ্রবণে কি এক তীব্র-তাড়িৎশক্তি যে আমাদের সর্ব্বদেহ কণ্টকিত করে, কি যে এক অভাবনীয় অমরীয় আরাম আমাদের হৃদয়কে শান্তিময় করিয়া তুলে—তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

রামপ্রসাদ সাধনমার্গের উচ্চশিখরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিভাব গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া প্রাণের তেজঃ প্রবলরূপে বর্দ্ধিত করিয়া ছিল, তাই ব্রহ্মময়ীর তেজে তেজোদৃপ্ত, ভক্তবীর, সাধকসন্তান রামপ্রসাদ জগতের কাহাকেও দৃক্‌পাৎ করিতেন না। তাঁহার হৃদয়ের অসীমশক্তি যে কিরূপভাবে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল, নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন—

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি।
নাইকো জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটবন্দি মা,
আমি ভেবে কিছু পাই না সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী।
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথটা বাঁটা মা,
জয় দুর্গা নামে জমা আঁটা, ঐতে করি মালগুজারি॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এই মনের সাধ মা,
আমি ভক্তিমূল্যে কিন্‌বো এবার ব্রহ্মময়ীর জমীদারি॥ *

যে বড় গলা করিয়া, বুক বাজাইয়া বলিতে পারে—"আমি এখন মায়ের রাজত্বে প্রজারূপে বাস করছি, কর দিচ্চি এবং তাহার হিসাব নিকাশের জন্য মনোময় শিবকে কর্ম্মচারী রেখেছি, উপযুক্ত কর্ম্মচারীর গুণে অন্য কোন লেঠা ভোগ করিতে হয় না। আমার দেহজমি জয়দুর্গা নামেই জমা করিয়া লইয়াছি,

* জয় জয়ন্তী – তাল জৎ।

এবং উহারই মালগুজারি করিতেছি—কিন্তু এবার আর ভাড়াটিয়া জমিতে বাস করিব না, শীঘ্রই ভক্তিমূল্যে ব্রহ্মময়ীর সমস্ত জমিদারী খরিদ করিয়া লইব।" অত্যাবধি কোন ভক্ত সাধক কি এইরূপ জোর করিয়া নিজের এরূপ ভয়ানক তেজোগর্ব্ব ভাব দেখাইতে পারিয়াছেন? ইহা মাতৃ-নামে কতদূর ভক্তি-বিশ্বাসের ফল, তাহা মাদৃশ ভক্তিবিহীন সামান্য ব্যক্তি কেমন করিয়া বলিবে মায়ের তেজস্বী ছেলে না হলে কি আর এরূপ তেজের কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়? মা ব্রহ্মময়ী, তুমি শ্রীরামপ্রসাদকেই সে অপার্থিব-শক্তি দিয়াছ, যাহার নিকট জাগতিক সমস্ত শক্তি হার মানিয়া যায়—তোমার প্রিয়পুত্র প্রসাদকেই সেই শক্তিতে সম্যক্ প্রকারে শক্তিমান্ করিয়া আপনার শক্তীশ্বরী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছ? আর এ দাস কি তোমার পুত্র নয় মা! যদিচ অকৃতী হইয়াছি, কিন্তু সে দোষ কার? তোমার দোষেই ত আমার এত দুর্গতি, যখন জগতের প্রত্যেক কার্য্য তোমার কর্ত্রীত্বে সম্পাদিত হইতেছে, যখন প্রত্যেক কার্য্যের কর্ত্রী তুমি, তোমার অনুমতি ভিন্ন যখন চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হয় না, সদাগতি যখন তোমার অনুমতি ভিন্ন গতাগতি করিতে অসমর্থ, সামান্য একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত যখন তোমার বিনা অনুমতিতে অঙ্গ সঞ্চালন করে না,—মাথা নাড়ে না,—তখন আমাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার কর্ত্তা তুমি ভিন্ন আর কে হইতে পারে, মা? যাহাতে জীবন ধন্য হইবে, যাহাতে এ অকৃতি সন্তানের হৃদয়কন্দর ভক্তি-প্রাবল্যে পরিপূর্ণ হইবে, যাহাতে তারা তারা বলিয়া তারা বাহিয়া নয়নধারা প্রবাহিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিবে, মা গো! মাতৃ-নামে আমাকে সেই আসক্তি, সেই ঐকান্তিক-অনুরাগ, সেই বিশ্বাসভক্তি দাও, তোমার পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়া আমাকে তোমার করিয়া লও। তুমি পূর্ণ—আমি অপূর্ণ, তুমি অসীম অনন্ত মহিমার্ণব—আমি দীনাতিদীন নগণ্য বিন্দুমাত্র, মা মহিমাময়ী বিন্দুবাসিনী, আমাকে কোলে টানিয়া লও, দয়া কর—আমার মানবজন্ম যেন বৃথা না যায়, আমি যেন তোমার নামে—তোমার গানে প্রাণে অসীম শক্তি সঞ্চয় ক'রে—তোমার পাদপদ্মের অন্বেষণে সাধনপথে অগ্রসর হয়ে তোমাময় হতে পারি। মা আমাকে সেই শক্তি প্রদান করিয়া শক্তিশ্বরী নামের পরিচয় প্রদান কর।

পুরাণ-প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই—পুত্র, পতি বা বন্ধুভাবে ভগবান্‌কে সাধনা করিবার পদ্ধতি আছে, কিন্তু জননীভাবে ইষ্টদেবীকে লাভ করিবার সুবর্ণ-সন্ধান কেবল রামপ্রসাদই আপন সঙ্গীতে দেখাইয়া গিয়াছেন—এইজন্য বাঙ্গালীর সাহিত্যে রামপ্রসাদের স্থান যে সকলের উচ্চে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রামপ্রসাদের পদাবলীর অধিকারী-অনধিকারী, সাধু-অসাধু, ভক্ত-অভক্ত, পণ্ডিত-মূর্খ নাই, ইহা সকলের হৃদয়েই এক নির্ম্মল প্রেমভক্তিপূর্ণ, অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য-ভাবের আবির্ভাব করিয়া দেয়, প্রাণের প্রত্যেক পরতে পরতে কি যে এক অব্যক্ত মদিরাময় সুধার স্রোত প্রবাহিত করে—তাহা যিনি একবার ভক্তকণ্ঠে এ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন—তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। সুবিমল-গগনচন্দ্রের সুধা-কিরণধারা উপভোগ সম্বন্ধে যেমন ধনী-দরিদ্র কাহারও নিষেধ নাই, সকলেরই সমান অধিকার, প্রসাদের মধুর পদাবলীর আলাপনে জগন্মাতার নিকট আত্মনিবেদন করত তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিবার বিষয়েও সেইরূপ সকলের তুল্যাধিকার। তুমি সংসার-সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে, অথবা বৈরাগ্য-সাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে, কিম্বা স্বকৃত-দারুণদুষ্কৃতির অনুতাপানলে জর্জ্জরিত দেহ হইয়া যখনই প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে গাহিতে থাকিবে :—

"মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত,
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত।
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে ত'রে গেল পাপী কত,
একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি দেখি তোমার অভয়পদ।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত,
রামপ্রসাদের এই আশা মা, যেন অন্তে থাকি পদানত।

তখনই তোমার দারুণ অবসাদের মধ্যে, প্রাণের সেই হতাশ বিষাদের মধ্যে মমতাযুত মা শব্দের আবির্ভাবে হৃদয়াভ্যন্তরে এমন এক মন-ভুলান, প্রাণ-জুড়ান শক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাইবে, দুর্গতিহরা দুর্গানামের কলুষনাশিনী-শক্তিতে এমনিভাবে শক্তিমান্ হইয়া পড়িবে, মায়ার তিমিরাবৃত আবরণের মধ্যে তুমি এমন এক প্রাণ স্নিগ্ধ-কর দিব্যজ্যোতিঃ দর্শন করিতে পাইবে—যাহাতে তোমার বহু জন্মার্জ্জিত কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় নিবৃত্তি করিয়া পার্থিব বিষয়াসক্তির পাপ বন্ধন ছিন্ন করিয়া অমৃতনির্ঝরিণী করুণাময়ী জগৎপালিকা জগদম্বার মোক্ষমূলাধার পাদপদ্মে ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রাণ জুড়াইবার জন্য হৃদয়ে এক উৎকট আবেগে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে। প্রসাদের গান যখনই গাহিবে তখনই প্রাণে একটা অজানা

শান্তি আনিয়া দেয় বলিয়াই তাঁহার সঙ্গীত সাধারণের এত প্রিয় ; কালীভক্ত সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ ভূয়োদর্শন ও অত্যধিক বিদ্যাশিক্ষার বলে এ সকল-সঙ্গীতের অবতারণা করেন নাই বা যশঃসৌরভে সৌরভান্বিত হইয়া সমাজে আপন প্রতি-পত্তির স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি ইহার রচনা করেন নাই—ইহা তাঁহার মনঃপ্রাণের অনুভূত ভক্তিভাবের উন্মাদনা-স্রোতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে—কেহ ভাল বলুক বা মন্দ বলুক—তাতে কিছু যায় আসে না ; মাতৃচরণপদ্মের মধুপানাভিলাষী ভক্তসন্তানের আত্মনিবেদন ও প্রার্থনার অশ্রুজলে ইহা বিধৌত। এই সঙ্গীতরচনা-কালে সাধক, লোকের রুচি-অরুচির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, লোকরঞ্জনের আশ-পাশ ছিন্ন করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ শিখরাসীন হইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা হৃদয় মধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন—অভীষ্টফলদায়িনী মায়ের কৃপায় তাঁহার সে আশা সম্যক্ প্রকারে সফল হইয়াছে।

প্রথম হইতে মানুষ একেবারে সকল বিষয়ে পাকা হইতে পারে না। তাহার একটু না একটু ত্রুটি থাকিয়া যায়, রামপ্রসাদ তাঁহার সেই ত্রুটির প্রতিকূলাচরণ করিবার জন্য ভগবতীর নিকট শক্তি চাহিয়াছেন, এই শক্তির বলে তিনি ভোগ্য-বিষয়ের প্রতি আসক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অনাসক্তির পূর্ণ প্রভাব বৈরাগ্য লাভের ভিন্ন ভিন্ন জলন্ত চিত্র তাঁহার গানে বিশদভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন, আবার সকামভাবের অবস্থা হইতে নিষ্কামভাবে মায়ের দর্শনলাভে ভক্তির অনাবিল স্রোত তাঁহার সঙ্গীতের স্তরে স্তরে বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাপত্রয় নিবারণ করিয়া হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে উক্ত-উদ্দেশ্য বিষয়ভোগের দ্বারা পূরণ হইতে পারে না, সকল সুখ-দুঃখের নিয়ামক, চতুর্বর্গ ফল-প্রদাতা ভগবৎশক্তি ইহার মূলীভূত কারণ তখনই তাহার মানস-ক্ষেত্রে অনুরাগের বীজ অঙ্কুরিত হয়। রামপ্রসাদের প্রাণে এই বীজ অঙ্কুরিত হইলেও সাংসারিক নানাবিধ সুখের আশা, বিষয়-সম্পত্তি ভোগের আশা মন হইতে একেবারে তিরোহিত করা সহজসাধ্য হয় নাই—এইজন্য দুর্দ্দমনীয় মনকে স্ববশে আনিবার জন্য তাঁকে কত চেষ্টা, কত প্রকার প্রবোধ দিতে হইয়াছিল। সংসারাসক্তির প্রবল-আক্রমণ তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিলেও তিনি বুঝিয়াছিলেন—ইহার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, কিরূপ বিপজ্জনক। তজ্জন্য তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-গ্রামের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদের সেনাপতি মনকে বশীভূত করিবার জন্য কত প্রকার প্রবোধ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, সেই সকল বাক্যবাণ নিজ সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়া শুধু যে তিনি আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন—তাহা নহে, ধর্ম্মপথানুবর্ত্তী মানবের

বৈরাগ্য আনয়ন বিষয়েও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া দিয়াছেন।

প্রসাদ-কবির কথা ছাড়িয়া দিন, যখন অন্য কোন ভক্ত আবেগভরা কণ্ঠে তাঁহার রচিত গান গাহেন :—

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥
হয়ে ধর্ম্ম-তনয়, ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তাইতে শিবের দৈন্যদশা।
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন, করো না এ কথায় গোসা।
ওরে সুখে দুঃখ, দুঃখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে পূরাইবে আশা ॥
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবে না রতি মাষা।
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা,
ওরে মনের রতন কর যতন
রতন পাবে অতি খাসা ॥

তখন এই গান শুনিলে স্বতঃই কি মন মধ্যে এই নশ্বর জাগতিক সুখ-সৌভাগ্যের আশা ছাড়িয়া ক্ষণিকের জন্যও কৈবল্যদায়িনী কালী-মায়ের চরণ-প্রান্তে আশ্রয় লইবার জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে না? গানের এই ছোট ছোট কথাগুলির মধ্যে এমন একটী বিচিত্র শক্তি আছে, যাহা অন্তরে প্রবেশ করিলেই তাহার দুর্ব্বলতা আর আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে না; বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে সে তখন দুঃখের ভিতরও সুখ আছে এবং সুখের ভিতরও দুঃখ আছে, বুঝিতে পারিয়া অবুঝ বালকের মত আর রাগ করে না। যখন কপটভক্তি করিয়া মনঃ একদিকে বিষয়-বাসনা অন্যদিকে ভগবদুপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, সে সময়ও প্রসাদ মনের উপর তীব্র তাড়না করিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে যখন যে কোন বাধা বিঘ্ন তাঁহার সাধন-পথের কণ্টকস্বরূপ, তাঁহাকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তীব্র-কটাক্ষে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাই রামপ্রসাদের অবস্থা-ভেদের সঙ্গীত-গুলি এত মধুর, এত মনোমদ। তিনি সংসারী ছিলেন, তাঁহাকেও আমাদের ন্যায় অবস্থা-চক্রে ঘূর্ণিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি আমাদের মত সেই ঘূর্ণিপাকে বিচলিত না হইয়া মা-সম্বল শিশুর মত অটল-বিশ্বাসে তাহার

প্রতিকার-কল্পে মাতৃচরণে আশ্রয় লইয়াছেন—আবেগভরে সেই সময়োচিত সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রাণের তীব্র জ্বালা মিটাইয়াছেন। এক্ষণে তুমি যদি ঠিক সেই অবস্থায় পড়িয়া প্রসাদের ঐ গানগুলি বিকল কণ্ঠে গান কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষণেকের জন্য তোমার প্রাণে সেই তেজঃ, সেই সাহস আসিয়া উপস্থিত হইবে—ভয় ভাবনা দূরে যাইবে, আত্মতৃপ্তি আপনি আসিয়া মনোরাজ্যে বিস্তৃতি-লাভ করিবে। প্রসাদী-সঙ্গীত যে এত প্রচলিত, এত সমাদৃত—ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। রামপ্রসাদ এখন নাই, কিন্তু তাঁহার সুধামাখা সঙ্গীতের প্রভাব এখনও সমভাবে বর্ত্তমান, যখনই গাহিবে তখনই যেন নবীনভাবে তোমার প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দিবে, কাণের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করিবে। ভাবের মধুতে মাখা-মাখি হইয়া গ্রথিত হইয়াছে—তাহার আস্বাদ সুমিষ্ট না হইবে কেন? এইজন্য কালীভক্ত রামপ্রসাদ আমাদের জড় চক্ষুর অন্তরাল হইয়া মাতৃক্রোড়স্থিত হইলেও তাঁহার সাধনসঙ্গীতগুলি—সাধনবৃক্ষের উজ্জ্বল কুসুমগুলি সমানভাবে বাঙ্গালীর নিকট সমাদৃত হইতেছে।

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বয়সাধিক্যের ভাব

বয়সের আধিক্য হেতু সাধারণ মানব যেমন সকল বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করে, স্থূল বিষয়ে যেমন তাহাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃঢ়তা লাভ হয়—প্রসাদের তাহা হয় নাই। তাঁহার বয়স যত বেশী হইতে লাগিল ততই যেন তাঁহার বালক ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাংসারিক সকল কাজকর্ম্মে তাঁহার অতিরিক্ত ভুল হইতে লাগিল। পুত্র রামদুলাল পিতার এই অবস্থা দেখিয়া সাংসারিক সমস্ত ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে তুচ্ছ বিষয়-কর্ম্মে অব্যাহতি দিয়া দেবতার আসন প্রদান করিলেন এবং জননীকেও এই আসনে সমাসীনা করিতে ভিন্ন মত করিলেন না। একাধারে দেবতার সেবা করিয়া রামদুলাল তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ-লাভে ধন্য হইতে লাগিলেন।

আমাদের পূর্ব্ব প্রসঙ্গের পর দশ বৎসর অতীত প্রায়, রামপ্রসাদের অবস্থার এখন ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এখন তিনি ঠিক একটী অল্পবয়স্ক বালকের মত, কখন যে কি বলেন, কি করেন, সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে পারে না।

রামদুলাল এই অপূর্ব্ব ভাবাপন্ন পিতামাতার অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া পুত্রজন্ম সার্থক করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বাণীও এখন ভ্রমপ্রমাদযুক্ত, কোন কার্য্য করিতে যাইয়া তিনিও ঠিকভাবে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। সংসারের অনুরূপভাবে কার্য্য সুসম্পন্ন করা, এখন তাঁহার মহাদায় হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য বধূমাতা একদিন পূজনীয়া সর্ব্বাণীকে বলিলেন—"মা! তুমি আজীবন পরিশ্রম করিয়া যে অমূল্যধন প্রাপ্ত হইয়াছ—এখন প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হও এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমিও তোমার প্রদর্শিত এই চরম-লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারি। মা, তুমি বাবার কাছে থাক; এ সকল অসার কার্য্য এখন হইতে আমরাই সম্পন্ন করিয়া লই—ইহার জন্য আর তোমাকে বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইবে না।" এই বলিয়া শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

বধূমাতার কথা শুনিয়া সর্ব্বাণী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং পতি-সোহাগিনী হইয়া প্রতিদিন পতির সেবায় প্রাণপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সময়ে আহার করান, সময়ে স্নান করান প্রভৃতিতে তিনি বেশ ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। মাতৃমন্ত্রে বিভোরপ্রাণ স্বামীর নিকট বসিয়া, তাঁহার সেই স্বর্গীয়ভাব দেখিয়া প্রাণ-মনঃ জুড়াইতে পারিলে সতী আর কিছুই চাহিতেন না। রামদুলাল ও তদীয় পত্নী ভগবতীদেবী দেবদেবী নির্ব্বিশেষে প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা ভোগাদি প্রদান করিয়া তবে নিজেরা আহার করিতেন। যে গৃহে এমন গৃহদেবতা বর্ত্তমান এবং যে গৃহী এরূপভাবে পিতামাতার সেবা করে—তাহাদের ধর্ম্ম অর্জ্জনের কি আর সীমা আছে?

এখন প্রতিবেশী আবালবৃদ্ধবণিতা প্রতিদিন এই দেবদেবীর দর্শনে কৃতার্থ হয়। তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া, তাঁহাদের উপাসনা করিয়া জীবন সার্থক করে। ভজহরি এই দেবদেবীর সঙ্গ করিয়া, তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-মতে কার্য্য করিয়া এখন ধর্ম্মতত্ত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, সে প্রসাদ ও প্রসাদপত্নী সর্ব্বাণীর সেবা করে এবং সময় পাইলে সাধন ভজনে প্রাণপাত করিয়া এই দুর্লভজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করে। এখন প্রসাদকে দেখিবার জন্য, তাঁহার প্রসঙ্গ লাভ করিবার জন্য তাঁহার বহির্ব্বাটীতে বহুলোক সমাগম হয় বটে, কিন্তু এখন আর তাঁহার নিকট হইতে কোন উপদেশ পাইবার তত আশা নাই। কারণ তিনি এখন ঠিক সামঞ্জস্য রাখিয়া সকল কথা কহিতে পারেন না—সময়ে সময়ে খেই হারাইয়া ফেলেন; একটা কথা বলিতে বলিতে বিমনা হইয়া যেন অন্য কি

একটা কথা বলিতে থাকেন। অনবরত এখন মা মা বলিয়া তাঁহার তারা বাহিয়া ধারা পড়িতে থাকে ; প্রত্যেক বস্তুতেই তিনি মায়ের মূর্ত্তি দেখেন, মায়ের রূপে ত্রিজগৎ আলোকময়—অন্ধকার আর কোথাও নাই, তাই অন্ধকারেও এখন আর তাঁহার আলো জ্বালিতে হয় না—তিনি ঘোর অন্ধকারে বসিয়াও সেই তমোনাশিনী মায়ের সেবা করিতে পারেন।

এখন প্রতিদিন তাঁহার সাধনার বিরাম নাই। অবিরত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন আর সময়ে সময়ে তারা নামের হুঙ্কারে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতেছেন,—প্রসাদের মুখে নাদ-সুরে—শ্যামা, কালী বা তারা নাম উচ্চারণ শুনিলে অতি পাষণ্ডের দেহও কণ্টকিত হইত, হৃদয় ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া নয়ন-কোণে অশ্রু দেখা দিত।

তন্ত্রোক্ত সাধনার দিনে রামপ্রসাদ পূর্ব্বের ন্যায় এখনও পূজার আয়োজন করিতেন। ভজহরি আদেশ পাইবামাত্র সমস্ত আয়োজন করিয়া দিত কিন্তু এখন আর তিনি ঠিক নিয়মানুসারে সকল বিধি বজায় রাখিয়া পূজা করিতে পারিতেন না, প্রেমাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত, ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া অনেক সময়ে অনেক বিষয় ছাড় হইয়া যাইত, তথাপি তিনি পূজার নির্দ্দিষ্ট দিনে মূর্ত্তি-পূজার আয়োজন করিতেন, ইহা তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা। ব্রহ্মভাবের ভাবুক হইয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখিয়াও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটিত না ; এই পূজা না করিলে তাঁহার প্রাণ যেন ছট্‌ফট্ করিত। তিনি সদা-সর্ব্বদাই বলিতেন—"ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি, আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে পদে গঙ্গা-গয়া-কাশী।" বহির্দ্দন্তবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন না হাসিলেও দন্ত বাহির হইয়া পড়ে, মা আমার তেমনি দেখা না দিলেও সকল বস্তুতেই স্বপ্রকাশ। ইহাই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান। নতুবা ব্রহ্মকে কেবল নিরাকার বা নির্গুণ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় দিলে—যেন তাঁহাকে অত্যন্ত লঘু করা হয়। যাহা সকলের আছে, তাঁহার তাহা নাই—ইহা অসম্ভব। তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার গুণ নাই, এ কিরূপ কথা! তাঁহার যাহা নাই, জগৎ তবে তাহা পাইল কোথা হইতে? তিনি "নাস্তি আকার বা নাস্তি গুণ" নয়, "নাস্তি আকারো যস্মাৎ বা নাস্তি গুণো যস্মাৎ" এইরূপ প্রমাণ করাই যুক্তিসঙ্গত ; নতুবা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না। যাঁহার অপেক্ষা আর আকার নাই, যাঁহার অপেক্ষা আর গুণ নাই ত্রিজগৎ তাঁহা হইতেই রূপ ও গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে ; ত্রিজগতের প্রত্যেক রূপই তাঁহার রূপে স্বরূপ, তাঁহারই গুণে সগুণ। যাহা রূপযুক্ত দেখি, তাহাই তিনি ; যাহাকে কোন গুণযুক্ত দেখি, তাহা তাঁহারই গুণ. তবে তিনি সাকার বা সগুণ নহেন কেমন করিয়া?

ব্রহ্মের ইহা নাই, উহা নাই বলিলে—তাঁহার পূর্ণত্বে দোষ পড়ে; অমুকের অমুক জিনিষ নাই বলিলেই—তাঁহাকে অপূর্ণ করা হইল।

অতএব তিনি সকল গুণ ও সকল আকারের আকর—কিন্তু আমাদের বুদ্ধির, জ্ঞানের এবং ধারণার অতীত বলিয়া তিনি নির্গুণ-নিরাকার হইতেছেন। সাধকের যখন এই ভাব হয়—যখন চৈতন্যময় ব্রহ্মে মনঃপ্রাণ সংযোগ হইয়া পড়ে—তখন তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি থাকে না, সে অব্যক্তভাব মনুষ্যের মুখের ভাষার দ্বারা বর্ণনা হয় না, তখন সাধক যাহা দেখে তাহাই তাহার নিকট চৈতন্যময়; প্রত্যেক বস্তুতে, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে সে তখন ব্রহ্মদর্শন করে, আপনার রূপগুণ তখন সেই অনন্ত রূপ-গুণ-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া সে সোহহং-ভাবাপন্ন হয়। অতএব জগতের সহিত তাহার এবং ব্রহ্মের স্বতন্ত্র সত্তা তখন আর উপলব্ধি হয় না, এইজন্য ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার;—নতুবা রূপ ও গুণ নাই বলিয়া নহেন। ইহাই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান এবং এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, সে অসাধারণজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া সাধারণ মানব হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, তখন সাধারণ লোক-চক্ষে সে পাগল ভিন্ন, শিশু বা বালক ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরিশেষে রামপ্রসাদের এই ভাব হইয়াছিল—নতুবা তিনি যে সাকার বা সকাম-পূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন—তাহা নহে; জীবনের শেষদিন অবধি তিনি মূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। তিনি ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক ভূতে মায়ের মূর্ত্তি দেখিতেন এবং সমষ্টিভাবে আপন সাকার-মূর্ত্তিতেও তাহা নিয়োজিত করিতেন। যাঁহারা ব্রহ্মের আকার বা গুণ নাই বলিয়া নিরাকার বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাদের হয় নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। পরমজ্ঞানী অর্জ্জুন কি ভগবান্‌কে সকল রূপ গুণের আকর বিরাটরূপে দেখেন নাই? তিনি নিরাকার ভাব কখন কি হৃদয়ে পোষণ করিতেন? তবে তুমি আমি কে? যদি তোমার যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে—তাহা হইলে তোমার প্রিয়বস্তু, যে বস্তুর দ্বারা তোমার জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়, যে প্রিয়বাসস্থানে থাকিয়া তুমি শান্তিসুখানুভব কর, তাহা অপর একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া পরিতৃপ্ত হও দেখি; তবে বুঝিব—তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তুমি অমরবাঞ্ছিত ব্রহ্মজ্ঞানি-পদ-লাভের উপযুক্ত পাত্র, তুমি পরমহংস—পরমতত্ত্বে তত্ত্ববান্।

জান কি প্রিয় পাঠক! ব্রহ্মময়ীর প্রিয়পুত্র ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ রামপ্রসাদ জীবনের শেষভাগে, দুর্গাচরণ মিত্র প্রেরিত মাসিক ৩০৲ টাকা, যাহা তাঁহার প্রধান জীবনোপায় ছিল, তাহা তিনি প্রার্থী জনগণকে প্রদান করিতেন এবং

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রপ্রদত্ত-সম্পত্তি তিনি একজন নিঃস্ব জমিদারকে প্রদান করিয়াছিল, এই জমিদারের জমিদারী লাটে বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। নিজের পুত্রাদির ভাবনা না ভাবিয়া, ভবিষ্যতের আশা-ভরসার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া পরকে আপনার জানিয়া এরূপ দান আর কেহ করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। পুত্র রামদুলাল পিতার এই দানে কিছু মাত্র দুঃখিত হন নাই বরং আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে নিজ শ্বশুরালয় গরলগাছায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; আমরা ইহা তাঁহার প্রপৌত্রের পুত্র অমরনাথ সেনের মুখে শুনিয়াছি। তাঁহারা মাতামহের বিষয় পাইয়া এই গরলগাছা গ্রামে কতদিন বাস করিতেছিলেন। ইহাই না ব্রহ্মদর্শন, ইহাই না ব্রহ্মভাব এবং ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। নতুবা আমি ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া ভোগ-সুখের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ স্বার্থপরতার চরম-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক বিষম-কপটতা অবলম্বন করিলে কি আর ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়?

রামপ্রসাদ জীবন-সন্ধ্যায় কেবল চৈতন্যময়ীর চৈতন্যে বিভোর হইয়া থাকিতেন। জগতের কোন বিষয় আর তিনি হিসাব-নিকাশ করিয়া সমাধা করিতে পারিতেন না। আহার-বিহারে ভুল হইয়া যাইত, পরিহিত বসন স্খলিত হইয়া যাইত; টানিয়া পরিবার সময় হইত না। সর্ব্বাণী অনবরত তাঁহার কাছে কাছে থাকিয়া এই সকল কার্য্য সমাধা করিতেন। ক্ষুদ্র শিশুটীর লালনপালনে যেমন জননীর অধিকার, অবশেষে সর্ব্বাণীরও সেইরূপ অধিকার হইয়াছিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মায়ের ছেলে

যাহার হৃদয়ে ভাব নাই, তাহার সাধনা হয় না। ভাববিহীন সাধনভজন ক্ষণভঙ্গুর—অত্যল্পকালস্থায়ী। ভাবই সাধন-সৌধের মূল ভিত্তি, ভক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয় করিয়া যাহার হৃদয়ের ভাব যত গাঢ়—তত পরিপক্ব, তাহার সাধন-সৌধ তত দৃঢ়—তত স্থায়ী, সুমেরুবৎ ততই অচল ও অটল।

সঙ্গীতেই ভাবের স্ফুরণ, আবার ভাব হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। যাহার সঙ্গীত ভাবযুক্ত নয় তাহা শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু মর্ম্ম স্পর্শ

করিতে পারে না—কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে সঙ্গীত প্রাণের স্পন্দন সমাহিত করিতে পারে, যাহা শুনিলে হৃদয় ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া যায় সেই সঙ্গীতই যথার্থ সঙ্গীত।

প্রাণ ভরিয়া এইরূপ সঙ্গীত গাহিতে পারিলে, সাধনা আরম্ভ করিয়া ভাবাবেশে এইরূপ সঙ্গীতের অবতারণা করিতে পারিলে শীঘ্রই সাধনার উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে পারা যায়। সত্বরই সাধ্য বস্তু তাহার খুব সন্নিকট হইতে থাকে।

প্রসাদের সাধনার মূল সঙ্গীত; সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ সঙ্গতি ছিল। সঙ্গীতেই তাঁহার ভাবের স্ফুরণ হইত, আবার ঐ ভাব হইতে অজস্র সঙ্গীত রচিত হইয়া শ্রোতৃবর্গের শ্রবণ-কুহর দিয়া মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত। এ সঙ্গীতে মানবসাধারণ ত মুগ্ধ হইতই, তাহারা ত প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিতই, তাঁহার আরাধ্যা দেবী ভগবতীও তাঁহার ভাবময় প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত শুনিবার জন্য সময়ে সময়ে কত ছলনা করিয়াছেন; ভক্তের হৃদয়ভেদী মাতৃনাম শুনিয়া তিনিও অশ্রুনীরে বুক ভাসাইয়াছেন। গান ত অনেকেই গাহিতে পারে, পৃথ্বীতলে গাহক ত অনেকেই জন্মিয়াছিল, কিন্তু নাদধ্বনিসম্ভবা, সুরলয়-সংযোজিতা ভাবময়ী ভবভাবিনী কেবল একমাত্র প্রসাদ ব্যতীত আর কাহার গান শুনিবার জন্য কন্যারূপে আসিয়া বেড়া বাঁধিয়াছিলেন? ত্রিলোকপালিকা; বিশ্বমাতা কালিকাকে গান শুনাইবার ক্ষমতা আর কাহার হইয়াছিল?

যে সাধনায় সে সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এ জগতে তাহার আর অন্য কোন বিদ্যায় কি অসিদ্ধি থাকিতে পারে? যাঁহাকে পাইবার জন্য সকল সিদ্ধি, যাঁহার চরণতলে সকল সিদ্ধি অবস্থিত, সেই সিদ্ধেশ্বরী মাকে পাইলে সাধকের অভাব কিসের?

"মা আমার, আমি মার"—ভাবপূর্ণ হৃদয়ে মাতৃময় হইয়া যে একথা বলিতে পারিয়াছে—ত্রিজগতে তাহার আর চিন্তার বিষয় কি আছে? মাতৃ-সাধনা সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ—সাধককে সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিয়া ধন্য করিতে এমন সাধনা আর নাই। প্রসাদ বলিতেন—"মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত"। তুমি যত কেন অকৃতী অধম হও না, যতই কেন পাতিত্য-দোষ তোমার থাকুক না, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া অনুতপ্ত প্রাণে প্রাণেশ্বরী মাকে একবার তাহা নিবেদন কর, ভাই! কর দেখি প্রাণ দিয়া প্রাণময়ীর পদে তোমার আত্মদুষ্কৃতি নিবেদন—দেখিবে নিমেষ মধ্যে তোমার পাপ-তাপ দূর হইবে—পাপঘনে ঘনাকার-হৃদয়ক্ষেত্র অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ আলোকরশ্মিসমুজ্জ্বল হইবে, তোমার যাবতীয়

পাতিত্য-দুষ্কৃতি ঘুচিয়া পবিত্রতা ও সুকৃতের আধাররূপে দীপ্ত-দিনমণির ন্যায় সমুজ্জল প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে। তন্ত্র শাস্ত্র ত তাই কলির জীবের পক্ষে এই সহজ-সাধ্য সাধনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এ সাধনা যে কেবল তোমারই নিজস্ব, দয়াময় সদাশিব যে কেবল তোমারই দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই প্রাণারাম, ভোগ-মোক্ষ-করতলগতকর সাধনতন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। ভাই! মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়-পথ অনুসরণে আর কালবিলম্ব করো না—হৃদয়কন্দরের অর্গল মোচন করিয়া তারস্বরে মা মা বলিতে বলিতে এস এই সাধনসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ি এবং প্রসাদের মত বলি :—

মা! আমরা তোমার জপ জানি না,
তপ জানি না, ভজন সাধন কিছু জানি না,
অকৃতী অধম বলে আমাদিগকে চরণে স্থান দিয়া
নিজ গুণে কৃতার্থ কর।
আমরা কেবল মাকেই জানি।
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা,
তবে আমরা কি ছাড়া জগত ?

ভাই! যখন সংসার-দাব-দাহে দগ্ধ হইয়া, রোগেশোকে জর্জ্জরীভূত দেহে, কাতরপ্রাণে শয্যাশায়ী হইয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে মা বলিয়া আমরা মাকে ডাকি, তখন কি এই সুধামাখা মা বুলিতে তোমরা সেই অশেষ যন্ত্রণার শান্তি অনুভব কর না, তখন কি সেই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে বিশ্ব-জননীর অংশসম্ভূতা মাতৃ-শক্তির প্রাণারাম সহানুভূতি,—"কেন বাবা, কি হয়েছে ? এই আমি" বলিয়া সেই প্রাণের সমবেদনা-সূচক আশ্বাসবাণী কি তোমার ওষ্ঠাগত-প্রাণে শান্তির সঞ্চার করে না? বাঙ্গালার প্রতি ঘরে ঘরে বিশ্বজননীর স্নেহময়ী, আনন্দময়ী, বাৎসল্যময়ী মূর্ত্তি মাতৃরূপে, কন্যারূপে, পত্নীরূপে তোমাকে সকল বিপদে আপদে রক্ষা করিতেছেন। তিনি যে তোমার নিজের, তুমি যে তাঁর পাগল ছেলে, আঁতের ধন! মা কি—তোমাদিগকে তিলমাত্র ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? তোমরাই যে ইচ্ছা করিয়া তাঁকে ছাড়িতেছ, তাঁকে ভুলিতে যাইতেছ—এইজন্য ত তোমাদের এত জ্বালাযন্ত্রণা, সংসার-দহনের এত তীব্র তাড়না! তাই বলি, ভাই! এস আমরা এই সারভূত সাধনা,· তন্ত্র যাহাকে তোমার নিজস্ব বলে উপদেশ দিয়াছেন—সাকার-রূপে যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে বলিয়াছেন—আমরা সেই সাধনা প্রকট করিয়া তাহাতে জীবন উৎসর্গ করি এবং

কলির তান্ত্রিক সাধকচূড়ামণি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের ভাবস্রোতের ভাসা ফুল সাধন-সঙ্গীগুলির ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধনার পথ সুপ্রশস্ত করি।

ভারতের অন্যান্য সাধক যেমন শাস্ত্রব্যাখ্যা, শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইবার সুবিধা বিধান করিয়া দিয়াছেন; কলির সাধকাগ্রগণ্য শ্রীরামপ্রসাদও সেইরূপ কেবল নিজে উত্তীর্ণ হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই; সংসারের ত্রিতাপতপ্ত, ব্যথিত-হৃদয় ব্যক্তিগণের জন্যও তিনি নিজ সঙ্গীতে অতি সহজে তান্ত্রিক সাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব সকল সন্নিবেশিত করিয়া উদ্ধারের পথ সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কেবল সাহিত্যের দিক্ দিয়া সাধক কবি রামপ্রসাদের গান-গুলির উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিলে চলিবে না। তাহাতে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক পথ কেমন করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাও আমাদের আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান নিধিধ্যাসন হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মনিবেদন, পরাভক্তি প্রভৃতি আয়ত্ত করা সাধন পথের পথিকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এরূপ করিতে করিতে আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে হৃদয়ে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়—তৎপরে তাঁহার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত হৃদয়ে প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হয়। এই সময় শাস্ত্রকথিত ধ্যানমন্ত্রগুলি ভালরূপ ব্যাখ্যার সহিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করা একান্ত আবশ্যক, ইহাতে ভক্তি-প্রাবল্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎপর সমস্ত কর্ম্ম ইষ্টে সমর্পণ করিয়া এই ভক্তিযোগে দৃঢ় করিতে পারিলেই হৃদয়ে সাধনানন্দ উপভোগ অনিবার্য্য—আনন্দময়ী মা এই সময় আনন্দরূপে সাধকের হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া সাধনার পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। এইরূপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিলেই প্রসাদের ন্যায় মাতৃক্রোড় প্রাপ্তির আশা সুনিশ্চিত।

প্রসাদের জীবনে আমরা তাঁহার সুললিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই মায়ের ধ্যান-ধারণা, অর্চ্চনা-বন্দনা, আবেদন-নিবেদন সমস্তই পরিস্ফুট দেখিতে পাই। মায়ের সেবার জন্য যখন তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হইত, বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া যখন তাঁহার প্রাণকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিত—তখনই গাহিতেন—

মায়ের চরণ-তলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথায় যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব, ক্ষতি কিসে,
মায়ের নাম ভরসা করে
উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥
প্রসাদ বলে উমা আমার, বিদায় দিলেও নাহি যাব,

আমার দুই বাহু প্রসারিয়া,
চরণ-তলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥

এইরূপ অচল অটল বিশ্বাস না থাকিলে, ধন-জন-যৌবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণার অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত বিশ্বজননীর প্রেমসাগরে এমন করিয়া আত্মবিসর্জ্জন দিতে না পারিলে কি সংসারী রামপ্রসাদ, এত শীঘ্র চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী মহামায়ার চরণলাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিতেন? নিম্ন-অধিকারীর পক্ষে কর্ম্মে দৃঢ়তা রাখিয়া ইষ্ট-প্রীতির জন্য জপের সঙ্কল্প বর্দ্ধিত করত সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিলে মনে একাগ্রতা আসে এবং সেই অবস্থায় সাধক কিছু অনুভব করিতে পারেন।

জাগতিক কোন বিষয়ে সাধকের প্রাণের পিপাসা মিটে না, আশার শান্তি হয় না, ধন জন যৌবন, বিষয়-বৈভব—প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর লাভে সাধকের মন লুব্ধ নহে, তাই সে অপার্থিব ধন,—মায়ের চরণ লাভের তীব্র-লালসা অতি সন্তর্পণে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে গোপন রাখিয়া কেবল মায়ের কাছে ধীরে ধীরে তাহা নিবেদন করে—তাই প্রসাদ গাহিয়াছেন :—

এলোকেশী দিগ্‌বসনা
কালী পূরাও মনের বাসনা ॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কিনা হবে দয়া
বলে দে মা ঠিক ঠিকানা।
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
ও মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে
সে বাসনা কেহ জানে না ॥

কোন কার্য করিতে অগ্রসর হইয়া প্রথমে যদি সাফল্যলাভের একটা আশা পাওয়া যায়, তাহা হইলে উৎসাহের সীমা থাকে না। এইজন্য রামপ্রসাদ আজীবন যে আশা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছেন সে বাসনার তীব্র সাধ তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই সাধ পরিপূরণের জন্য আজ দীনতারিণী মায়ের নিকট বলিতেছেন—"মা! আমি যাহা পাইবার জন্য এত যত্ন, এত চেষ্টা, এত প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছি, তার ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, এক্ষণে ঠিক করে বলো, আমার প্রতি সে দয়া হবে কিনা।" মায়ের নিকট পুত্রের যেরূপ আব্দার খাটে, যেরূপ আব্দার করিয়া মায়ের নিকট কিছু পাইবার জন্য আশা করা যায়, তেমন আর কাহারও নিকট করা যায় না। রামপ্রসাদ

বিশ্বেশ্বরকে জগতের আদি-কারণ মা বলিয়াই জানিয়াছিলেন—কাজে কাজেই ছেলে মায়ের নিকট যেরূপ সরল ও প্রশান্ত হৃদয়ে আব্দার ক'রে সকল কথা, সমস্ত অভাবের বিষয় মায়ের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"যে আমাকে দেখা দিতে হবে, কোলে লইতে হইবে, নতুবা আমার আকাঙ্ক্ষা অন্য কোন ভাবে মিটিবে না"—এইজন্য তিনি যখন মাকে দেখিতে না পাইতেন, কঠোর সাধনা করিয়া মায়ের দর্শনলাভে যখন সময় সময় নিরাশ হইতেন—তখন গাহিতেন :—

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।
মা সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা।
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা,
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,
দেখা নাই আর এথা সেথা।
প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা,
ওমা যেজন তোমার নাম করে,
তার হাড়মালা আর ঝুলি কাঁথা।

কালী মূর্ত্তিই প্রসাদের ইষ্টমূর্ত্তি, কালিকাদেবীকেই তিনি মাতৃভাবে আরাধনা করিয়া ধন্য ও বরেণ্য হইয়াছিলেন। এইজন্য কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ বলিয়া তিনি অনেক সময় আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। ভক্ত গানে তাই বলিতেছেন—'মা কালী, তোমাবিনে আর আমার কেউ নাই—পৃথিবীতে তুমি আমার একমাত্র মাতৃরূপা, আশা ও ভরসা স্থল। মা আদর করিলেই বাপের আদর সহজ লভ্য, এ দৃষ্টান্ত যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে তোমাকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া, তোমার কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত হইয়া যদি আমি পিতা মহেশ্বরের নিকট যাই, তাহা হইলে তিনি কখনই কোলে করিবেন না তাঁহার কোলে উঠিবার ভরসা বৃথা, কারণ তিনি যখন বিমাতা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়া মত্ত, তখন দাসখৎ না দেখাইলে কি আর আমার আশা পূর্ণ হইবে? তবে তুমি কৃপা না করিলে আমি বিমাতার কাছেই যাব; যদি তিনি কৃপা না করেন—তাহা হইলে একবার তোমার কাছে একবার তাঁর কাছে কেন ক'রবো, তোমার দয়া ত সহজে লাভ হয় না? বিমাতা গঙ্গা

বরং পতিত-পাবনী, তিনি এ পতিত সন্তানকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন—এক্ষণে সেইরূপ করাই আমার পক্ষে ভাল, কারণ বেদবেদান্ত বলেন—কালীমায়ের কৃপালাভ ক'র্ত্তে হ'লে তোমার হাড় কালী, মাস কালী ক'র্ত্তে হবে—তাঁহার নাম কর্‌লে এ জীবনে তোমার ঝুলি কাঁথা সার হবে। মা, তাহাতেও আমি ভীত নহি, তোর নাম করে যদি আমার দিনান্তে অন্নও না হয়—সে ভাল, তথাপি দর্শন চাই—দেখা পেলে তারপর বুঝবো—ত্রিদিবেশ্বরীর পুত্র কেমন করে দরিদ্র হয়। কুবের যার ভাণ্ডারী, তার ছেলে দরিদ্র হবে, একি কখন সম্ভব? সকলে বলে অর্থ থাক্‌লে মাকে ভুলে যেতে হয়—কিন্তু তা ঠিক নয়, যে অর্থকে অনর্থ জেনে—তাঁর সদ্ব্যবহার করে, তাকে আর মা ভুলতে হয় না—এ জগতে ধন জন, জীবন সবাই ত মাতৃদত্ত—একথা মনে থাক্‌লে আর মাকে ভুল হবে কেন?

এত সাধ্য সাধনা, এত স্তবস্তুতি করিয়া যখন তাহার দেখা পাইতে বিলম্ব হইত, তখন প্রসাদ আব্দারে ছেলের মত কখন কখন "মর" বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিয়া গাহিতেন—

কেন ডাকিস্ মা মা বলে, মায়ের দেখা পাবি নাই।
থাক্‌লে দেখা দিত আসি, সে সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশান মশান কত, পীঠস্থান আদি যত,
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত, তবু দেখা পেলাম নাই।
(এবার) বিমাতার তীরে গিয়ে, কুশপুত্র দাহাইয়ে,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিতে কালাশৌচে কাশী যাই।
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভণে, মায়ের জন্য ভাবনা কেনে,
মা গেছে, নাম ব্রহ্ম আছে, তরিবার ভাবনা নাই।*

মাতৃনামে ভক্তের এইরূপ অটল বিশ্বাসই বটে। আরাধ্যের সাক্ষাৎলাভে বিলম্ব হওয়ায় প্রসাদ বলিলেন—"বেটী! সর্ব্বনাশী মরেছে, নতুবা এত শ্মশান মশান, এত দেবালয় অন্বেষণ করিলাম—কই দেখা ত পেলাম না, তাহ'লে নিশ্চয়ই মরেছে, এখন বিমাতার তীরে (গঙ্গাতীরে) গিয়ে কুশপুত্র দাহন করিতে হইবে—কারণ কোথায় এবং কিরূপে মরিল—তাহার ত ঠিক ঠিকানা নাই—অতএব কুশপুত্র দাহ করে, কালাশৌচে কাশী যাওয়াই শ্রেয়ঃ, আর এখানে থেকে দরকার কি? আচ্ছা, কাশীতে ত গেলেম কিন্তু এতদিন যে খেটে মলেম, এত কষ্ট করে তার দর্শন পাবার জন্য যে এত সাধ্য-সাধনা করলেম, তার ফল কি

* পিলু বাহার—খং।

হ'লো, এখন আমার পরকালে নিস্তারের উপায় কি? মা যখন মরে গেছে, তখন এ ভবজলধি উত্তীর্ণ হবার ভরসা কোথায়? প্রসাদ বলেছেন—"ভাই! তার জন্ম আর ভাবনা কি, মা মরেছে, তার জন্ম আর ভয় কিসের, মা মরে গেছে কিন্তু তাঁর নাম ত আছে, নামই যে ব্রহ্ম, ব্রহ্মময়ী আর তার নাম যখন একই বস্তু, তখন আর উদ্ধারের কোন চিন্তা নাই।" ইহাই যথার্থ নামে রুচি, মাতৃনামের প্রতি হৃদয়ের দৃঢ়তা—ইহাকেই বলে।

রামপ্রসাদ সকল বিষয়েই মাতৃসত্তা উপলব্ধি করিতেন। মা ভিন্ন যে জগতে আর কিছু নাই—একথা শুধু রামপ্রসাদ কেন, সকল উন্নত ভক্তই আপন অভীষ্ট-দেবকে জগতের প্রত্যেক বস্তুতে জাড়ত দেখেন। এইজন্য গীতায় শ্রীভগবান্ সাধক শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

যে ব্যক্তি আমাকে সকল প্রাণী এবং সকল প্রাণীতে আমি বর্ত্তমান এইরূপ দর্শন করে, আমি তাহার অদৃষ্ট হই না, অর্থাৎ তাহাকে আমি কখন চক্ষের বহির্ভূত করি না। সাধক যেমন সকল বস্তুতে মাকে দেখেন—জগতের প্রত্যেক কার্য্যও তেমনি মায়ের বলিয়া অনুভব করেন—কোন কার্য্যই তাহার নিজস্ব বলিয়া বোধ থাকে না—ইহাই তাহার কর্ম্মসংন্যাস। রামপ্রসাদ কাজেই ইহা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিবার জন্য গাহিয়াছেন :—

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কি দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
প্রসাদ বলে ভক্তি-মুক্তি উভয়ে মাথে রেখেছি।
এবার শ্যামা নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥

এই গানেও ব্রহ্ম ভাবের ভাবুক রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের নামই ব্রহ্ম বলিয়া দৃঢ় করিয়াছেন। মোহনিদ্রা আর এখন তাঁহাকে মোহিত করিতে পারে না; তিনি এখন মায়ের নাম-সাগরে ডুবিয়া অনবরত সঙ্গীত সুরাপানে মত্ত থাকিতেই ভালবাসেন। তাহাতে তিনি কি যে এক অনির্ব্বচনীয় শাশ্বত সুখের আস্বাদ

প্রাপ্ত হন, তাহা তিনিই জানেন। এইজন্য পুনরায় বলিলেন—"যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক ভাবুক লোক পেয়ে, তারই কাছে সমস্ত ভাব শিখেছি; তাই এখন দিবারাত্র আমার সমান ভাব; আমার মোহ-ঘুম ছুটে গেছে বলে এখন আমি চিরজাগ্রত, এখন মায়ের ঘুম মাকে দিয়ে তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি এবং শ্যামার নামই সর্ব্বস্ব ব্রহ্মময় জেনে ভক্তি-মুক্তি মাথায় করে বসেছি।" নামেই যদি মজিতে হয়—মায়ের সারাৎসার নাম লইতেই যদি তোমার প্রাণ চায়, তাহা হইলে আর কিছুই করিবার আবশ্যক নাই, তুমি প্রসাদের মত একান্ত বিশ্বাসে, তন্ময় ভাবে নামেই আত্মহারা হও, নামেই অনুরাগ বর্দ্ধিত কর, এই মাতৃনাম মহামন্ত্রই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করাইয়া তোমাকে মায়ের কোলে বসাইয়া দিবে, তোমার সাধন-ভজনের, জপ-তপের সকল ক্রিয়া এক নাম গানেই সিদ্ধ হইবে। ভক্তি-প্রাবল্যে এই নাম গানই তোমার পরিণামে সকল সুখের নিদানভূত হইবে। হৃদয়ে বিশ্বাস দৃঢ়, প্রাণ সাহসবদ্ধ কর, মনকে অনাবিল ভক্তিস্রোতে ভাসাইয়া দাও—দেখিবে, আর তোমাকে কোনপ্রকার সাধন করিতে হইবে না, ভক্তিভাবে নাম গানই তোমার মানবজীবন ধন্য করিয়া দিবে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সাধনার ভাব

রামপ্রসাদ ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তিনি আধুনিক ব্রহ্ম-উপাসকদিগের মত নিরাকার পূজা করিতেন—ইহা অনেকেরই বিশ্বাস। বিশেষতঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রামপ্রসাদের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের তুলনা করিয়া তাঁহার নিরাকার-সাধন-ভজনের সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রামপ্রসাদের শেষ-জীবনের কয়েকটী গান দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন—রাজা বাহাদুর জ্ঞানের গভীরতায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, রামপ্রসাদ ভাবপ্রবণতায় এবং ভক্তিবিহ্বলতায় তৎপূর্ব্বে সেই সকল অনুভব করিয়াছিলেন। বেশী শাস্ত্রপাঠ বা দূরদর্শনের জ্ঞানগরিমায় মণ্ডিত না হইলেও প্রসাদ কেবল ভক্তিভাবে পুঁথিগত বিদ্যা-শিক্ষার অনেক উচ্চে

উঠিয়াছিলেন! দীনেশ বাবু উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের তুলনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"রামপ্রসাদ তাঁহার অনেক গানে পার্থিব বিষয় অকিঞ্চিৎকর দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না, মাটির ধাতু পাষাণ মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে, ইত্যাদি এবং রাজা রামমোহন রায়ের "আবাহন বিসর্জ্জন তুমি কর কার "ইত্যাদি গানের তুলনা করিয়া প্রসাদকে তিনি নিরাকারবাদী প্রমাণ করিয়াছেন। তান্ত্রিকগণ ভগবানকে ঠিক নিজের ভাবে পূজা করেন, নিজেকে জানিয়া—নিজের মত করিয়া পূজা করিবার উপদেশই তন্ত্রের সারতত্ত্ব। তন্ত্রের সাধকগণ তিনি আছেন বলিয়া এ জগতের সমস্তই মায়ের মূর্ত্তি বলিয়া কেবল আকাশ-কুসুম ভাবনায় পরিতৃপ্তি লাভ করেন না। মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে যেমন সন্তানের আশা মিটে না, মায়ের প্রিয় সাধক তান্ত্রিকগণও ঠিক সেরূপ প্রত্যক্ষ না করিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করেন না; মাকে দেখিয়াছি, মায়ের করুণা লাভ করিয়াছি, একথা এক তান্ত্রিক সাধক ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে রাজা রামমোহন ভগবানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ একেবারেই স্বীকার করিতেন না। কিন্তু রামপ্রসাদ উপাসনার সময় প্রতি কথাতেই মূর্ত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—"মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া, আমার আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরে মুণ্ডমালী, গঙ্গাজল বিল্বদলে বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব" এবং শেষের দিন অবধিও তিনি মূর্ত্তিপূজা করিয়া ইহধাম হইতে অপসৃত হইয়াছেন—ইহা তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট আমরা বেশ ভাল করিয়া জানিয়াছি; দীনেশবাবু এহেন রামপ্রসাদকে নিরাকারবাদী কেমন করিয়া বলিলেন—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভক্তিভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মূর্ত্তিপূজা ভিন্ন উপায় নাই—আর এই ভক্তি প্রাবল্যেই মা মূর্ত্তিমতী হইয়া সাধকের দর্শন-সাধ পূর্ণ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজার পদ্ধতি আছে এবং সাধক রামপ্রসাদ সে পূজার বিরুদ্ধে কোন মতবাদ প্রচার করেন নাই। তাঁহার হৃদয় সহজে যেরূপ ভাববিহ্বল হইত, ভক্তিভাবে তিনি যেরূপ আত্মহারা হইয়া যাইতেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে বাহ্যিক কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইত না—কোন কোন সঙ্গীতে তিনি এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার জীবনীর অনেকস্থলে পরিস্ফুরণ দেখাইয়াছি। তাঁহার উত্তর সাধক আজুহরিও সে বিষয় অনেক সময় বলিয়াছেন—"আহা! এরূপ অবস্থায় আর ইঁহার বাহ্যিক পূজার আবশ্যক কি" কিন্তু তথাপিও প্রসাদ প্রতি তান্ত্রিক তিথিতে মূর্ত্তিপূজা না করিয়া ছাড়িতেন না।

রাজা বাহাদুর প্রতীচ্যভাবে প্রচারকের পদানুসরণ করিয়া পৌত্তলিকতা বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তাই হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে তিনি নানা-প্রকার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন চক্ষুঃ মুদিত করিয়া কেবল প্রার্থনাতেই তৃপ্ত হইয়াছিলেন, মূর্ত্তি সমন্বিত মন্দির প্রতিষ্ঠা না করিয়া কেবল প্রার্থনার জন্য ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আর রামপ্রসাদ মন্দিরাভ্যন্তরে বিগ্রহের মধ্যে ভক্তিপ্রাবল্যে তাঁহার প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া, তাঁহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার গানে যে সময়ে সময়ে একটু ব্রহ্মভাব, একটু নিরাকারের আভাস, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল তাহার ভক্তিভাবেরই চরমোৎকর্ষ। প্রকৃতির নিয়মানুসারে নববসন্ত সমাগমে বৃক্ষের পুরাতন পত্রগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া আবার যেমন নবপত্র সুশোভিত হয়, ভক্তিপ্রাবল্যে প্রসাদের জীবন-বসন্তে তাঁহার উপাসনা-বৃক্ষেরও তেমনি নবজীবন লাভ হইত; উক্তরূপ ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ভিতরের মাকে বাহিরে আনিয়া মূর্ত্তিপূজা করিতেন। আর রাজা রামমোহন হিন্দুরুচির প্রতিকূলে প্রচারকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের প্রাণপ্রিয় উপাসনা-বৃক্ষের জীবনস্বরূপ, ভক্তিসলিল-সমুদ্ভুত বিগ্রহপূজা ও বাহিক অনুষ্ঠানগুলিকে জিগীষা-পরবশ হইয়া তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, ইহাতে সামান্য কর্ম্মীর মস্তক কর্ত্তন করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না।

রামপ্রসাদ জন্মান্তর মানিতেন—কর্ম্ম অনুসারে যে মানব জননী-জঠরে জন্মলাভ করে—একথা তিনি গানের অনেক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন এবং জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে ঝগড়া করিয়া প্রসাদ মাকে বলিয়াছেন—"গর্ভবাসে যে কষ্ট তুই কি জানিবি মা, তুই জনমিলি না, মরিলি না।" অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে যে মানব জন্ম হয়েছে, তাহাও তিনি গানে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মসূত্র অনুসারে যে জীবের জীবন গঠন—ভাগ্যাভাগ্য লাভ হয়, একথা "কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন কে বা পাবে তার বাড়া" ইত্যাদি গানে তিনি বলিয়াছেন।

জগতের সামান্য কাজে যখন গুরুর আবশ্যক হয়, লেখাপড়া শিখিতে হইলে যেমন গুরু চাই, কোনো অজানা স্থানে যাইতে হইলে যেমন কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যাওয়া যায় না—জগতের প্রত্যেক কাজে যখন এই রীতি, তখন এ জগৎ ছাড়িয়া মৃত্যুরাজ্যে যাইতে হইলে, সে পথের পথ বলিয়া দিবার জন্য অর্থে আমাদের একজন লোক চাই—নতুবা অজানা রাস্তায় যাইয়া, বিপথে পড়িয়া যে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। এজন্য রামপ্রসাদ সাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্য

গুরুর আবশ্যকতা আছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার অনেক গানেই এ কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং তিনি বিনা গুরুর উপদেশে কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার প্রথম দীক্ষাগুরু মাধবাচার্য্য। মাধবাচার্য্যের এ নাম আশ্রমোচিত কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল—শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রসাদ যখনই বিপদে পড়িয়াছেন—তখনই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। পীড়ার সময় যখন পুত্র পিতাকে ঔষধ খাইয়াইবার কথা বলিল—তখন তিনি বলিলেন—"আছে শ্রীনাথ দত্ত পটলসত্ত্ব—মাঝে মাঝে সেইটা খাবা, গুরুদত্ত রত্নতোড়া বাঁধরে যতনে কসে" ইত্যাদি বহু গানে তিনি শ্রীগুরুর শরণ লইয়া সাধনা করিবার জন্য বারবার বলিয়াছেন, ভজহরিকেও ইহার জন্য কত উপদেশ দিয়াছিলেন। গুরু যে স্বয়ং ভগবান্ সদাশিব—তাহাও তিনি প্রমাণ করিতে পূর্ব্বে এক পৌরাণিক গল্পের অবতারণা করিয়া দিয়াছেন। অতএব সাধন-ভজন করিতে হইলে শ্রীগুরুর নিকট সাধনার বীজমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই বীজ জপমালা করিতে হয়। তুমি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত, যে বীজে তোমার দেহ গঠিত, গুরু গণনা করিয়া সেই দেবতার বীজ তোমার কর্ণে প্রদান করিলে এবং তাহার দ্বারা সাধন পথে অগ্রসর হইলে তুমি সত্বর কাম্যবস্তু লাভে সক্ষম হইবে—নতুবা অন্ধকারে, অজানা পথে চলিলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। বীজ অর্থাৎ গোড়া না ধরিয়া কার্য্য করিলে যে নিস্ফল হইবে—তাহার আর সন্দেহ কি ?

রামপ্রসাদ আর্য্য ঋষি কথিত হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিষয়ই সামান্য মনে করিতেন না। হিন্দুশাস্ত্রের যাবতীয় উপদেশ যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহার কোন স্থানে যে কিছুমাত্র গোলমাল নাই, তাহা তিনি অবনতমস্তকে স্বীকার করিতেন। শাস্ত্রে এরূপ অচল অটল বিশ্বাস না থাকিলে কি আর এত উন্নতিলাভ কাহার ভাগ্যে ঘটে ?

পরজন্ম ঠিক, কর্ম্মফল ঠিক—এই কর্ম্মের তারতম্যানুসারেই মানুষ জন্মান্তরে ভালমন্দ অদৃষ্ট লইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হয়, কর্ম্মফলই তাহাদের নিয়ামক রূপে সংসারে সদসৎকার্য্যে নিয়োজিত করে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সাধক সে কর্ম্মফলের খণ্ডন করিতে পারে না, সাধনবলে যে সে তাহার হাত এড়াইতে পারে না—তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে। যার মা সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্বকর্ত্রী, ত্রিলোক যার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে, যার মার এত ক্ষমতা, তার ছেলে কি মাতৃবলে বলীয়ান্ হইলে সামান্য কর্ম্মফলের নিপীড়ন ব্যর্থ করিতে পারে না—অনায়াসেই পারে। মাতৃপ্রাণ সাধক যখন মা ভিন্ন কিছু জানে না, তখন তাহার আবার অদৃষ্টবাদ কি ?

পুত্র যখন জোর করিয়া আব্দার করিবে—মায়ের কাছে কাঁদিয়া যখন বলিবে—"মা! আমার এ অভিলাষ তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে, না করিলে আমি কিছুতেই ছাড়িব না।" পুত্রগতপ্রাণা স্নেহময়ী পুত্রের সে আসা যদি ফলবতী না করেন, যাবতীয় ক্ষমতার আধারভূতা তাহার মা যদি পুত্রের সেই আব্দার পূর্ণ করিতে অসমর্থন হন, তবে আর তিনি মা কিসের? এইজন্য তান্ত্রিক সাধক সাধনবলে অদৃষ্টের ফের ফিরাইতে পারে, প্রকট সাধনাবলে সে কর্ম্মডোর ছেদন করিতে সমর্থ হয়। পুত্রের কাছে জননীর অদেয় কিছুই নাই। মায়ের কাছে যাইয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সমস্ত অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারিলেই যে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে—তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে তৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য ক্ষমতা ত তোমাকে লাভ করিতে হইবে। সে ক্ষমতালাভের একমাত্র উপায় মাতৃ সাধনা। এ সাধনায় কোন আড়ম্বর করিতে হইবে না, অপারক হইবে না, অপারক হইলে কোন প্রকার কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিবার আবশ্যক নাই, কেবল প্রতিদিন তাঁহার দর্শনলাভের জন্য তুমি ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদিতে থাক, তাঁহাকে পাইবার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া নেত্রনীরে বুক ভাসাইয়া দাও—তাহা হইলে তোমার আর অন্যতর সাধনার কিছু আবশ্যক হইবে না। ছেলে কাঁদিলেই মায়ের আসন টলে—কান্নার চেয়ে মাকে পাইবার সহজ উপায় ছেলের পক্ষে আর দ্বিতীয় নাই। ধ্রুব যেমন অনন্যশরণ হইয়া বনে বনে "হা পদ্মপলাশলোচন হরি, দেখা দাও প্রভু! বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়া ছিল—ধ্রুবের আকুল ক্রন্দনের সহিত প্রাণের ডাক যেমন অচিরে সেই প্রাণেশ্বরের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল, তোমার প্রাণের ডাকও তেমনি মায়ের প্রাণ চঞ্চল করিয়া তোমার দর্শন সাধ মিটাইবে, ঋষিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় কর্ম্মফল টুটিয়া যাইবে, তুমি ধন্য হইবে। একবার ভাই! প্রাণের কবাট খুলিয়া ডাক দেখি, মা আসেন কিনা। তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইলে এমন সহজ উপায় আর নাই।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাবৃটে সাধনা

বর্ষার আকাশ—ঘনঘটাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার পর মেঘের আড়ম্বর কিছু বেশী হইয়া আসিল, বিদ্যুৎ-বিকাশে দিঙ্মণ্ডল চমকিত হইতে লাগিল। মেঘের কড়কড়

শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। অদ্য রাত্রে ভয়নাক বারিপাত হইবে—ভাবিয়া কুমারহট্টবাসী সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্য পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। প্রকৃতির ভাবগতিক দেখিয়া কেহ আর গৃহের বাহির হইতেছে না।

আজ কিন্তু প্রসাদের প্রাণ সিদ্ধাসনে বসিয়া মাতৃনামজপের জন্য অস্থির হইয়াছে। এ দারুণ দুর্য্যোগ সাধকের প্রাণে তিলমাত্র ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। ভজহরি প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিল কিন্তু প্রসাদকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না, নিতান্ত অনুগতের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রসাদ বলিলেন—"ভজহরি ভাই! সংসারে সামান্য বস্তু আয়ত্ত করিতে হইলে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়—আর এই অসামান্য বস্তু-লাভের জন্য তুমি কিছুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিবে না—কষ্ট না করিলে যে ইষ্টলাভ হয় না।

এই জন্য তান্ত্রিক সাধনার প্রথমে শরীরকে দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইতে হয়। দেহ, অগ্রে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা তন্ত্রের নিয়ম—কারণ শরীর সুস্থ না হইলে ধর্ম্ম হয় না! যে মনকে লইয়া তুমি ধর্ম্ম করিবে, সেই মনের সহিত শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকিতে পারে না, এই জন্য তন্ত্র বলিতেছেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" শরীরকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য যাহা করা আবশ্যক, সাধক তাহা সংগ্রহ করিবে, তাহাতে কোন পাপ নাই। এইরূপ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইলে শরীর এত দৃঢ় এবং কর্ম্মণ্য হইবে যে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করিয়া যাবতীয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে সে আর পশ্চাৎপদ হইবে না। এইজন্য তান্ত্রিক সাধক রামপ্রসাদ শরীর অপটু বলিয়া জীবনে কখন কোনপ্রকার বাধা প্রাপ্ত হন নাই, তবে সময়ে সময়ে তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ দেখিয়া প্রিয়জনেরা মনে করিত—তাঁহার বুঝি কোনও অসুখ হইয়াছে,—তাই তাহারা বিচলিত হইয়া নানাপ্রকার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিত। প্রসাদ যে কেন অপ্রকৃতিস্থ হইতেন. কেন অসুস্থভাবে অভিভূত হইতেন, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা কাহার ছিল না। কিছুদিন বেশী সংসারকার্য্যে লিপ্ত থাকিলে ক্রমে ক্রমে সংসারভাব তাঁহাকে ধীরে ধীরে আশ্রয় করিত, স্বভাবের অভাব হইলে প্রসাদ বুঝিতে পারিতেন এবং তজ্জন্যই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িতেন—ইহার দ্বারা সকলে মনে করিত, বুঝি তাঁহার কোন পীড়া হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু তাঁহার শরীর কোন পীড়াগ্রস্ত হইত না।

প্রসাদ ভজহরিকেও শরীর সুদৃঢ় করিবার জন্য অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং সকল সময়ে পরিবারবর্গকেও বলিতেন,—"শরীরকে আগে দেখো,—তারপর কাজে অগ্রসর হইও।" ভজহরিও বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে পারিত,

কিন্তু প্রসাদের ন্যায় চিত্তস্থির হয় নাই বলিয়া—অনেক সময়ে কার্য্য বিশেষে সে ভয় পাইয়া পিছাইয়া আসিত।

আজ প্রসাদ বলিলেন,—ভজহরি, ভয় নাই, অগ্রসর হও, মায়ের নামে প্রাণ মাতাও—সকল ভয় তিরোহিত হইবে।" কথা শুনিয়া ভজহরি মাতৃনামে সাহসবদ্ধ হইয়া প্রসাদের অনুসরণ করিল।

সে দিন শনিবার অমাবস্যা, তান্ত্রিক সাধকের পরম শুভদিন, বর্ষাকাল বলিয়া বৃষ্টির ভয়ে গৃহে আবদ্ধ থাকিলে কি হইবে? ভয়বিহীন, পুলকপূর্ণিত-তনু সাধক নিজের সিদ্ধাসনে উপস্থিত হইলেন এবং মহানিশায় দেবীর আরাধনার জন্য পূজা পাঠ আরম্ভ করিলেন। এই সময় বাতাসে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল এবং বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অনাচ্ছাদিত আসনে বৃষ্টিপাত হয় দেখিয়া প্রসাদ উঠিলেন এবং আসনের চারিধারে একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তারপর আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সীমার বাহিরে ঝড়-বৃষ্টি হইতে লাগিল, কিন্তু প্রসাদের গণ্ডীর মধ্যে বৃষ্টিপাত হইল না এবং পবনদেবও উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা প্রদানে অসমর্থ হইল।

ভজহরি ভক্তের অমিত-শক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে পুনরায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া প্রসাদের পশ্চাতে বসিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপে মনোনিবেশ করিল। আজ সে যেরূপ নিবিষ্টচিত্তে জপ করিতে পারিয়াছিল, জীবনে সেরূপ নিবিষ্টচিত্তে জপ বোধ হয়—আর একদিনও করিতে পারে নাই।

প্রসাদ মানসোপচারে মহাকালী ও মহাকালের পূজাদি শেষ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জপ শেষ করিয়া ভগবতীর স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, কটিতটের বসন খসিয়া গেল। দিগম্বরীর পুত্র দিগম্বর হইয়া মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগরিত করিয়া সহস্রদল কমলস্থিত শিবের সহিত যোগ করিয়া তন্নিঃসৃত অমৃতপানে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রসাদকে দেখিলে সাক্ষাৎ শঙ্কর ধ্যানোপবিষ্ট বলিয়া বোধ হইত।

চারিদিকেই বৃষ্টিপাত হইতেছে, কেবল গণ্ডীর মধ্যে বারিপাত হয় নাই। উদ্যানস্থিত শৃগাল, সর্প প্রভৃতি জন্তুগণ সিদ্ধাসন নিরাপদ দেখিয়া তাহার মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইল, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভজহরি প্রথমে ভীত হইয়াছিল, তারপর সাহসে ভর করিয়া মাতৃ-কবচে দেহ আচ্ছাদিত করিল, কাজেই তাহারা একস্থানে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল—কাহার কোন অনিষ্ট করিল না।

রামপ্রসাদ এইবার দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী দুই কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দুই তর্জ্জনী

দুই চক্ষুর মধ্যে রাখিয়া কুম্ভক করিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিলেন—তাহাতে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ বিদ্যুদ্বিকাশ দেখিতে পাইলেন। দেহ ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হইতে লাগিল সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত, পুলকপূর্ণিত হইয়া উঠিল। এত দুর্য্যোগ, বিদ্যুতের এত কড কড় শব্দ—তথাপি সেই উন্মুক্তস্থানে বসিয়া নগ্নদেহ সাধকের কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না; সমভাবে সমস্ত রাত্রি সমাধিস্থ থাকিয়া শেষ-যামে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য লাভ হইল। সম্মুখে শিবারূপিণী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া বলিপ্রদান করিলেন এবং গললগ্নীকৃত-বাসে প্রণত হইলেন। প্রসাদের প্রণাম লইয়া যখন তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে; বর্ষার আকাশেও সূর্য্যোদয় হইবার উপক্রম হইতেছে।

প্রসাদকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভজহরির প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইল। এতক্ষণ সে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিল, জপ তপঃ করিতেছিল বটে কিন্তু মনের গুণে সে তন্ময়তা লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; কাজেই কতক্ষণ আর একাসনে এমন ভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায়, সাধারণ মানুষ কতক্ষণ নিষ্কর্ম্মা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? প্রসাদকে বাহ্য চৈতন্য লাভ করিতে দেখিয়া সে বলিল—"ভাই! সাপ ও শিয়ালের উপদ্রব দেখিয়া প্রাণে বড় ভয় হইয়াছিল।

প্রসাদ হাসিয়া বলিলেন—"ভাই! মায়ের ছেলের এত মৃত্যুভয় কেন, মায়ের ছেলেকে কেহ কি হিংসা করে—না মায়ের ছেলে কখন মরে—মৃত্যু যে আমার মায়ের পায়ের ধূলা! যে মাতৃপদ পেয়েছে—মা বলে যে ডাকতে শিখেছে, মা যার কাছে রয়েছেন, মৃত্যু তার কি করিতে পারে? মাতৃমন্ত্রে জপসিদ্ধ হইলে, শমন-শাসনে শাসিত হইবার ভয় কাহারও থাকে না।" ভজহরিকে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে প্রসাদ ভাবমগ্ন হইয়া গাহিলেন,—

মন কেন রে ভাবিস এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত,
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্‌ভুত,
ওরে তুই করিস কি কালের ভয় হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হ'লিরে পাগলের মত,
(ও মন) মা আছে যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয়রে ভীত।
মিছে কেন ভাব, দুঃখে দুর্গা বল অবিরত,

যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি হবে রে তোর তেমনি মত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কররে মনের মত,
ওরে গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করবে রে রবিসুত ॥

ভজহরিও গান শুনিয়া গলিয়া গেল, সে বলিল—ভাল! আজ সেই মনে করিয়াই ত বসিয়া ছিলাম—কিছুতেই দৃক্‌পাত করি নাই। আজ বেটী যেন আমার প্রাণের ভিতর ঢুকে আমাকে অভয় দিতে লাগ্‌লো—তাই ত এত সর্পের হিলি হিলি কিলি কিলির মধ্যে আমি স্থিরভাবে বস্‌তে পেরেছিলুম।

প্রসাদ। ভয় পাইও না; জগদম্বার কোটাল সাধককে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করবার জন্য চারিদিকে ঘুরছে। কিন্তু যার সিদ্ধ মন, সে কি ও সকলে ভয় পায়, না ও সকল বিভীষিকা সে মানে, কালীচরণ করে স্মরণ সে বীরাসনে বসে থাকে।

ভজহরি। আচ্ছা ভাই প্রসাদ! সিদ্ধি লাভ জিনিসটা কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারি না।

প্রসাদ। একি বুঝবার জিনিস, না হলে বুঝান যায় না।

ভজহরি। একটু আভাসও ত পেতে পারি?

প্রসাদ। আভাস আর কি—যেমন খিচুড়ী তৈয়ার ক'র্ত্তে হ'লে—হাঁড়িতে জল দিয়া চাল, ডাল, ঘৃত, মসলা সব ফেলে দিতে হয়—তারপর সেগুলো যখন সমস্ত মিশে এক হয়ে যায়, পরস্পরের অস্তিত্ব হারায়—তখন খিচুড়ী ঠিক প্রস্তুত হ'য়েছে ব'লে জান্‌তে হবে। সেই রকম দেহ-হাঁড়িতে ভক্তিরূপ জলে জীবের জীবত্ব, অহংতত্ত্ব কামনা, বাসনা, বৈরাগ্য-অনলে সিদ্ধ করিয়া নিজত্ব হারাইতে পারিলেই সিদ্ধ হওয়া হইল। প্রেমময়ীর প্রেম-সিন্ধুতে ডুবিয়া আত্মহারা হইতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়! মানুষ এইরূপ সিদ্ধিলাভের জন্যই সাধনক্ষেত্ররূপ-মর্ত্ত্যে আসিয়াছে—এখানে আসার উদ্দেশ্যই তাহাদের মা-ময় ভাবে সিদ্ধিলাভ করা। মনুষ্যজন্মে যে এরূপ সিদ্ধপুরুষ হইতে না পারে—তাহার আসা-যাওয়াই সার। সে ছেলে মাকে জানিতে না পারে, মায়ের আদর ভালবাসা না পায়, তার জন্ম বৃথা নয়ত কি?

ভজহরি। বৃথা বলে বৃথা—তাহাকে ত মানুষ বলাই যায় না—আমরা কি আবার মানুষ।

এই কথা শুনিয়াই প্রসাদের কি ভাব হইল, তিনি একদৃষ্টে আকাশের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। আকাশ তখন বেশ পরিষ্কার হইয়াছে; প্রাতঃকালে গ্রামের ছোট ছোট বালকগণ রৌদ্র উঠিয়াছে দেখিয়া ঘুড়ি উড়াইতে আরম্ভ

করিয়াছে। অনেক ঘুড়ি শূন্য মার্গে উড়িতেছে। প্রসাদ ভাবের ঘোরে বিভোর হইয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন আর গাইতেছেন :—

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভবসংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যে মন ঘুড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুইটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ী॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি,
ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়্‌বে গিয়া তাড়াতাড়ি।

বাস্তবিক সাধনায় সিদ্ধ হইতে না পারিয়ে মানবজীবন ধন্য করিতে পারা যায় না। প্রসাদ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া একাধারে ভাবুক, কবি, পণ্ডিত ও মনুষ্যোচিত যাবতীয় গুণে গুণবান্ হইয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এক একটী সঙ্গীত ভাবের সমুদ্র, কবিত্বের অনন্ত প্রবাহ, পাণ্ডিত্যের বিজয়-কেতন, তাই তাঁহার এক একটী সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যমন্দিরের এক একটী মহার্ঘরতন। সাধক কবি ঘুড়ি উড়ান দেখিয়া ভজহরির সহিত পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের মীমাংসা করিয়া ভাবসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই সঙ্গীতটীতে কি পরমার্থ তত্ত্বই না জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

প্রসাদ বিশ্বজননী মাকে ভিন্ন জগতে অপর কোন কর্ত্তার অস্তিত্ব দেখিতে পাইতেন না—তাই তিনি ঘুড়ির প্রতি চাহিয়া ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন,— "ভাই ভজহরি! আমার মা ভবরাণী ঐ দেখ ভবসংসার বাজারের মাঝে ঘুড়ি উড়াইতেছেন—ঘুড়ি পাকশাট খাইয়া উড়িতেছে। সংসার মায়া-সুতায় আবদ্ধ মন-ঘুড়ি আশা-বায়ুতে উড়িতেছে। তাহাতে কাকগণ্ডী মণ্ডিত দেহ এবং পঞ্জরাদি নাড়ি গাঁথা। ঘুড়ি আপন কর্ম্মফলেই নির্ম্মিত—তাই কারিগরীরও সীমা পরিসীমা নাই। বিষয়রূপ মসলায় মাঞ্জা দিয়া মায়া-দড়ি খুব শক্ত হইয়াছে —তাই লক্ষের মধ্যে দুই একটা কাটে অর্থাৎ মায়ার হাত এড়াতে পারে, মায়ামুক্ত কটা লোক হ'তে পারে? মা আমার নিজে এইরূপ ক'রে হাসেন অর্থাৎ বাহবা দেন। দক্ষিণা বাতাস বহিলে অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই মন-ঘুড়ি যদি মায়াপাশমুক্ত হ'তে পারে—তাহা হ'লে অনায়াসে ভবপারে গিয়ে তাড়াতাড়ি মায়ের চরণতলে আশ্রয় লইতে পারিবে।"

প্রসাদ পূর্ব্বে ভজহরিকে বলিয়াছেন—মনুষ্য জন্মে যে মাতৃনামে সিদ্ধিলাভ ক'র্ত্তে না পার্‌লে তার জন্ম বৃথা। কিন্তু সেই কথার সমর্থন জন্য বলিলেন—সে রূপ করা কি সহজসাধ্য, সিদ্ধিলাভ করা কি এক জন্মের সাধনায় হয়? কত জন্ম জন্ম ধরে ভোগ ক'রে ত্যাগী হয়ে, তবে মায়ার হাত, বাসনার প্রলোভন এড়াতে পারে, সেরূপ লোক এক লক্ষের মধ্যে দুই একজন। তবে মায়ের নাম যে যত ক'র্ত্তে পারে—ততই ভাল, অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যে হাততালি দিয়া যাহার যে নাম ভাল লাগে—তাহার সেই নামে চীৎকার ক'রলে প্রাণটা কতকটা খোলসা হয়ে যায়। মাকে পাবার একটা কিনারা হয়।

সে দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইল। মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যদেব গগনে সমুদিত হইয়া অবসাদগ্রস্ত জীব-জীবনে নবীন আশার সঞ্চার করিতে লাগিলেন। বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া প্রসাদও আর অপেক্ষা না করিয়া ভজহরির সহিত গৃহে আগমন করিলেন। স্বামীকে সেই দুর্য্যোগে সিদ্ধাসনে গমন করিতে দেখিয়া সর্ব্বাণী সাতিশয় চিন্তান্বিতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে নিরাপদে গৃহে সমাগত দেখিয়া অতুলানন্দ উপভোগ করিলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার ভোগের জন্য আহারাদি প্রস্তুত করিতে পাকশালায় গমন ক'রিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমিত্বের বিচার

জীবের জীবনেতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়—তাহা কতকগুলি কারণের একত্রীকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যতদিন ঐ কারণগুলি একত্র অভিন্নভাবে অবস্থান করিবে—ততদিনই তাহার অস্তিত্ব বজায় থাকিবে—আর কারণগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িলেই তাহার লয় অবশ্যম্ভাবী, সে অচিরেই লোকলোচনের অন্তরাল হইয়া পড়িবে। এই অবস্থান্তর—কারণ সকলের এইরূপ রূপান্তর হেতু জগতের সমস্ত বস্তুরই পরিণাম প্রদর্শন করিতেছে। জগতের প্রত্যেক ধূলিকণা হইতে মহামহীরুহ, চন্দ্র, সূর্য্য, অনন্ত কোটী গ্রহমণ্ডলীসহ বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টি কারণভেদে প্রতিমূহূর্ত্তে নূতন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ পরিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়াই ইহা জগৎ নামে অভিহিত, ভোজের বাজীর ন্যায় ইহা

মিথ্যা—অনিত্য নশ্বর। একটী মানব জন্মগ্রহণ করিলে, স্থিতি হইল—তারপর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় প্রভৃতি অবস্থায় অবস্থান্তর জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তারপর হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। এতদিন মানবটীর নাম ছিল না—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব নাম উপাধি স্থিরীকৃত হইল, তৎপরে সে বড় হইল, কত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া, নানাপ্রকার গুণমণ্ডিত হইল, দেখিতে দেখিতে দশজনের একজন হইয়া যখন সে উন্নতির চরম সীমায় পৌছিল—তারপরই তার কারণগুলি ক্রমশঃ একতা বিহীন হইয়া পৃথক্ হইতে লাগিল, কার্য্য কারণে লয় হইয়া গেল—ইহাই মৃত্যু। অনিত্য জগতের ইহাই পরিণাম—মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা এইটুকু বুঝি বলিয়াই জগতের কিছুই কিছু নহে—সবই মিথ্যা—সব ফাঁকিবাজী বলিয়া অনুমান করি। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই—বাস্তবিক কি ইহার মধ্যে অবিনাশী—সার সত্য পদার্থ কিছুই নাই?

একদিন তর্কভূষণ আসিয়া প্রসাদের সহিত এই ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। প্রসাদ বলিলেন—"ভাই! তোমার আমার অস্তিত্ব ধার করা, তাই ক্ষণভঙ্গুর, তাই পরিণামী। কিন্তু একটী অস্তিত্ব আছে, যাহা সমস্ত কারণের কারণ এবং চিরস্থায়ী; কাল যাহাকে কবলিত করিতে পারে না, দেশ যাহাকে দশাগ্রস্ত করিতে অক্ষম। যিনি নিজের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান—যিনি নিজেই স্বপ্রকাশ, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য; আর এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সার বস্তু। এই সত্যের ক্ষয়-ব্যয় নাই; এই সত্য হইতেই আমার মা উদ্ভূত, আর মা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। এই সত্য-সনাতনী ইচ্ছারূপিণী মাকে জানিতে পারিলেই তোমার মিথ্যা ভ্রম দূর হইবে। তুমি কি জান না—কলিতে সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম—আমার মাকে জানিতে হইলে সত্যব্রত হইতে হইবে—সত্যনিষ্ঠ না হইলে, কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিতে না পারিলে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে মায়ের প্রিয় পুত্র হওয়া যায় না; মাতৃভক্ত মাত্রেই সত্যব্রত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মন হইতে সমস্ত মিথ্যা-কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া অকপটে সত্যপ্রিয় হইতে হইবে। সত্যবাদী ব্যক্তি সকল গুণের আধার। যে সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, মা সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করেন।"

তর্কভূষণ। আচ্ছা ভাই! এই সত্যবাদী কেমন করিয়া হইতে পারা যায়?

প্রসাদ। মা তোমাকে বিচার-শক্তি দিয়াছেন, সদসৎ বিচার করিয়া যেটী

মিথ্যা বলিয়া মনে হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিবে। বাক্যের সংযম শিক্ষা সত্যবাদীর প্রধান কর্ত্তব্য। বেশী কথা বলিলেই তাহাকে মিথ্যা বলিতে হইবে। কপটতা হৃদয়ে স্থান দিবে না। যদি কখনও কোন মন্দ করিয়া ফেল, তৎক্ষণাৎ তাহা অকপটে প্রকাশ করিবে—নতুবা একটী মিথ্যাকে গোপন করিতে গিয়া তোমায় পুনরায় দশটী মিথ্যা কথার অবতারণা করিতে হইবে। সত্য হৃদয়ে সৎসাহস আনয়ন করিয়া দেয়, হৃদয়-নিহিত যাবতীয় শক্তির বিকাশ করিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে। সত্যবাদীর নির্ম্মল হৃদয়-মুকুরে দিন দিন নব নব চিন্তার মনোহর ছবি প্রতিফলিত হয়। ক্রমশঃ সে এ অনিত্য নশ্বর সংসার ছাড়িয়া সার-সত্য-রাজ্যের উচ্চ সীমায় আরোহণ করে, তখন সে প্রতি কার্য্যে, প্রতি কথায়, এমন কি প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চায়,—তখন তাহার বদন মণ্ডলে যে এক অপূর্ব্ব সুবিমল জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত হয়, তাহাই আমার জননীর আশীর্ব্বাদ, তাহাই আমার সত্যস্বরূপিণী মায়ের অমিত শক্তি-প্রভাব বুঝিতে হইবে।

পণ্ডিত। ভাই! আজ কাল এরূপ সত্যের আদর্শ ত সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে আদর্শ পুরুষ হইতে পারা যায় না বটে, কিন্তু কলিতে সেরূপ পুরুষ কোথায় পাওয়া যাইবে?

প্রসাদ। নাই বা পাইলে ভাই! নিজেই নিজের আদর্শ হও, আপনাকে সত্যের দ্বারা গঠিত করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে এই জগতকে মিথ্যার কারণ বা মায়াপ্রপঞ্চ বলিয়া যে ভ্রম, তাহা দূর হইয়া যাইবে। যে জীবনে কোন শুভ উদ্দেশ্য নাই, যাহা সত্যের আদর্শে গঠিত নহে, যাহার লক্ষ্য স্থির হয় নাই, সে জীবন জীবনই নহে, সমাজ-শরীরে সে একটা বিষম বিস্ফোটক ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষ অপূর্ণ, তাহার পূর্ণতা লাভের জন্য সতত চির-সম্পূর্ণ সেই ভগবদ্‌শক্তির প্রতি ধাবিত হইতে হইবে। সেই পথে ধাবিত হইতে হইলে প্রথমতঃ নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—নতুবা অন্য আদর্শ কোথায় পাইবে দাদা! আমাদের দেশে যে এত আদর্শ মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁহারা কেহ কি কখন আপনাকে বাদ দিয়া আদর্শ পুরুষ হইতে পারিয়াছেন? আমি ছাড়া কি কোন আদর্শ হইতে পারে? আমি আমার আদর্শ, "আমি" আদর্শ-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, এইরূপ দৃঢ়তা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া কাজ কর তাহা হইলেই ত সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে! যখন জগতে আমার কিছু নাই, তখন আমি জগতের সব—সকলের আদর্শ এবং আমার উপর নির্ভর করিয়াই এই জগৎ এত মনোরম, এত সুন্দর দেখাইতেছে। অতএব এই বিশ্বজগতের মাঝে

"আমি"ই সব! এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সত্যের উপর তোমার "আমিত্বের" প্রতিষ্ঠা কর, আদর্শ-স্থলাভিষিক্ত হও, তারপর নাম উপাধিরূপ "আমি"কে কাটিয়া ছাঁটিয়া বাদ দিলেই "তিনি" হইয়া পড়িবে।

ভজহরি এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে কেবল প্রসাদের মুখের প্রতি চাহিয়া তাঁহার জ্ঞানময় উপদেশগুলি শুনিতেছিল। এক্ষণে তর্কভূষণ ও প্রসাদের কথোপকথন শুনিয়া বলিল,—"ভাই! ঘোর দার্শনিক তত্ত্ব, মাথা গুলাইয়া যায়, কিছু বুঝিতে পারা যায় না!"

প্রসাদ। কেন গো, শক্ত কি? পেঁজের খোসার মত আমি পর্দ্দায় পর্দ্দায় সজ্জিত হ'য়ে আছি; পেঁজের খোসা ক্রমশঃ ছাড়াইতে ছাড়াইতে যাহা অবশিষ্ট থাকে—তাহাই সার পদার্থ, সেইরূপ তোমার অহঙ্কার, মায়া, জ্ঞান, নাম, উপাধি এবং দেহাভিমান ত্যাগ করিলে কি থাকে? যখন তুমি গাঢ় নিদ্রা যাও, ঘুমে অচেতন হও, তখন যেমন তোমার আত্ম-অনুভূতি কিছুই থাকে না; কেবল তোমার চৈতন্য জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সকল অবস্থাতেই সমানভাবে অবস্থান করে। এই চৈতন্যই জীবের "আমিত্ব"—সার—সত্য, ইহাই আমার আদর্শ; আমাদের আদর্শ অন্বেষণের জন্য বাহিরে কোথাও যাইতে হইবে না, চৈতন্যরূপিণী জননী যে আমার আমিত্বের সহিত মাখামাখি ভাবে জড়িত রহিয়াছেন। নিজেকে চিনিতে পারিলে, আমিত্বকে ভালরূপে আদর্শ করিতে পারিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে, এইজন্য তন্ত্র বলিতেছেন—অন্য আদর্শ কিছু দেখিতে হইবে না, তুমি আমাকে আদর্শ করিয়াই আগে চল, বুঝ—তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়া ধন্য হইবে, তখন আর প্রমাণের আবশ্যক হইবে না। দেখ, আমি চিরদিনই সত্য—মিথ্যা নয়; তবে নিজেকে আদর্শ করিতে না পারিয়া, আমার আমিত্বের অস্তিত্ব হারাইয়া আমরা কেবল পাগলের মত চিরদিন অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিতেছি। পূর্ব্বে আমাদের ঋষিগণ আপনাকে আদর্শ করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণরূপে আমিত্বের বিকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, দেহভাণ্ডের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ তাঁহাদের কিছুই অজানিত ছিল না বলিয়াই অনায়াসে গৃহে বসিয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধান লওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় নাই।

প্রসাদের এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া পণ্ডিত ও ভজহরি অবাক্ হইয়া রহিলেন। বেদান্তের এই কথা পণ্ডিত মহাশয় কতবার পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু এই বিষম বিশুষ্ক বিষয় তখন আদৌ তাঁহার ভাল লাগে নাই। আজ হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে প্রসাদদেব বেদের সহিত তন্ত্রের এই সকল সামঞ্জস্য বেশ ভাল

করিয়া দেখাইয়া দিলেন। সাধকের মুখের কথা না হইলে কি এরূপ সরল ভাবে কেহ আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারে? বাস্তবিক আমরা যে নিজস্ব হারাইয়া নিজেকে না বুঝিয়া এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানুষের মত মানুষ হইতে হইলে আগে আমাকে ঠিক করিতে হইবে, আমার আমিত্বের উপর নির্ভর করিয়া আদর্শরূপে দাঁড়াইতে হইবে। আমরা "শান্ত" তাই আমাদিগকে প্রথমে "শান্ত" রূপে নিজেকে ঠিক করিয়া তবে সেই অশান্ত-অনন্তরূপিণী মায়ের প্রতি অগ্রসর হইতে হইবে। আমাকে ঠিক করিতে পারিলে মাকে পাইতে আর বিলম্ব কতক্ষণ, তিনিই ত "আমি" রূপে আমারই মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন; কিন্তু আমি কই; আমি যে আমার নহি, আমি যে আমিত্ব হরাইয়া ফেলিয়া বিস্মৃতির অগাধ সলিলে ডুবিয়াছি। একটা সামান্য কার্য্যেও এখন আমরা নিজেকে বাদ দিয়া ফেলি, মনে করি যেন আমি কিছুই নই। আমরা নিজেকে এত ছোট করিয়া ফেলিয়াছি যে, নিজের ধর্ম্মকর্ম্মেও আমরা একজন প্রতিনিধি প্রদান করি—ভাবি, আমার দ্বারা কেমন করিয়া ঐ কাজ হইবে, আমি ত কিছুই করিতে জানি না, তাই সকল কাজ পুরোহিতকে দিয়া করাইয়াই ক্ষান্ত হই। নিজেকে জানিবার জন্য, নিজেকে কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য কিছুতেই চেষ্টা করি না। একটা গল্প বলি শুন—একবার কোন একটী সান্ধ্যভোজে প্রায় কুড়িজন বন্ধু মিলিত হইয়া আমরা নানাপ্রকার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়াছি, বাহির বাটীতে নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ চলিতেছে; একদিকে আহারাদিও প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু কাষ্ঠের অপ্রতুলতা বশতঃ বেশী খাদ্যাদি প্রস্তুত হইল না। যাহা হইয়াছিল, তাহাতে বহু কষ্টে আঠারজন খাইতে পারে। ব্রাহ্মণঠাকুর আমাদের মধ্যে একজনকে বলিলেন—"ঠিক কতজন লোক আছেন—একবার গণিয়া আইস, আমি পাতা করি" সে গণিয়া আসিল এবং বলিল—"আঠারজনের পাতা করুন।" আঠারজনের পাতা করা হইল; আঠারজন খাইতে বসিল, কিন্তু যিনি গণিয়া আসিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহার বসিবার স্থান হইল না। ইহাতে বুঝিতে পারা গেল, তিনি নিজেকে বাদ দিয়া আঠারজন গণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় কি, চুল্লী নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। বহুকষ্টে তখন আমাদের আঠরজনের মধ্য হইতে তাঁহার আহার দেওয়া হইল।

প্রায় সকল কাজেই এখন আমরা এইরূপ নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া কাজ করিতে যাই, কাজেই কোন ফলোপলব্ধি করিতে না পারিয়া "ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্টঃ" হইয়া লাভে মূলে হারাইয়া ফেলি। আত্মশক্তিই যে মহতী শক্তি;

আমিত্ব জ্ঞানে ভালরূপ জ্ঞানবান্ হইলে যে "তুমিত্বে" পৌছিতে বেশী বিলম্ব হয় না, তাহা এখন আর আমরা ভাল বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা, এত অধঃপতন। এখন আমাকে কেবল অহঙ্কারের "আমি" সাজাইয়া উপর চাকচিক্য করিতেছি, ভিতর কিন্তু অন্তঃসার শূন্য হইতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি নাই। আমাদের বিশ্বাস—মা আমাদের সশরীরে দেখা দেন না, বিশেষতঃ এই কলিযুগে এমন কেহ নাই যে সশরীরে তাঁহার দেখা পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি—রামপ্রসাদ কি সত্যযুগের লোক, না পরমহংসদেব সত্যযুগের, না তারাপীঠের পাগল বামাক্ষেপা সত্যযুগে মায়ের দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহারা ত এই প্রবল কলিকালেই মাতৃ-দর্শন লাভে জীবন ধন্য করিয়াছিলেন! তুমি তাঁহাকে কিরূপে দেখিবে ভাই! যে শক্তি সঞ্চয় করিলে আত্মদর্শন হয়, সে শক্তিই যে তোমার নাই, তোমার নিজের শক্তি যে তুমি কার্য্যদোষে হেলায় হারাইয়া ফেলিয়াছ—যখন নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছ তখন মাতৃ-দর্শন, ঈশ্বর-দর্শন হইবে কিসে? আমরা এখন অপরের কিছু একটী আশ্চর্য্য দেখিলে একেবারে আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া যাই, মনে করি—বুঝি আমাদের এমনটী নাই, এমন শক্তিটী সঞ্চয় করিতে বুঝি আমরা অক্ষম। কিন্তু আমরা বুঝি না যে আমরা অমৃতের সন্তান, বিশ্বজননীর প্রিয়পুত্র, মায়ের অফুরন্ত ভাণ্ডারে আমাদের জন্য নাই কি? সে ভাণ্ডারে তোমাদের জন্য যাহা নাই—জগৎ তাহা কোথা হইতে পাইল? ভাই! আমরা কোন কার্য্য করিব না, নিজেকে বিশ্বাস করিব না, অথচ পরের দেখিয়া তাহা লইবার জন্য ব্যস্ত হইব। বিনা আয়াসে কি কিছু পাওয়া যায়? এখন দেখা যাইতেছে—শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কার্য্যকরি শক্তি হারাইয়া আমাদের এ অবনতি হইয়াছে, এইজন্য তন্ত্র আরও বলিয়াছেন—আগে শরীর রক্ষা কর, তার পর ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে, নষ্টস্বাস্থ্য বলহীন-দুর্ব্বল ব্যক্তি কোন কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারে না। তন্ত্রে বিশ্বাস কর, তন্ত্রের বিধি-বিধানানুসারে কার্য্য কর, তোমরা মায়ের সন্তান, চৈতন্যরূপিণী মা তোমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, এইরূপ দৃঢ়তা সহকারে সদাচার সম্পন্ন হইয়া সত্যের সন্ধানে তৎপর হও! তাহা হইলে সত্য সত্যই মায়ের কোলে উঠিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

অনেকে বলেন—তন্ত্রের মতে সমস্তই একাকার, তথায় জাতি বিচার নাই। যাহারা তন্ত্র বুঝে না, তাহারাই এই কথা বলে, ভজহরির এ বিষয় একদিন সন্দেহ হওয়ায় রামপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হ্যাঁ ভাই প্রসাদ! তন্ত্রে ত অনেক স্থলে লেখা আছে—সকলেই একত্রে কাজ করিতে পারিবে, জাতি-বিচার করিতে হইবে না।" তদুত্তরে প্রসাদ বলিয়াছিলেন,—"তুমি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে

পার নাই, তন্ত্রের উপদেশ কি বেদ-পুরাণ ছাড়া? গৃহীর পক্ষে, সামাজিক সাধকের পক্ষে আচার-বিচার, পূজা-আহ্নিক, দেব-দ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি সকলই প্রয়োজন, নতুবা সমাজের অনিষ্ট সাধন করা হইবে যে। হিন্দু হইয়া অহিন্দুর সহিত অনাচারে আহার-বিহার করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। তন্ত্রে নানা প্রকার সাধনার ব্যবস্থা আছে। সংসার ত্যাগী কৌলের পক্ষে ভৈরবী-চক্র, তত্ত্ব চক্র প্রভৃতিতে একত্র বসিয়া সাধনা করিবার বিধান আছে। সন্ন্যাসী যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে কোন শাস্ত্রেই ত জাতিবিচার নাই, যাঁহার সমাজ নাই, তাহার আবার জাতি কি, আর আচার-বিচারই বা কি? কিন্তু যতক্ষণ তুমি সমাজবদ্ধ হইয়া সংসারে থাকিবে, ততক্ষণ তুমি যত বড সাধকই হও না কেন, ইহার প্রথা সকল মানিয়া চলিতেই হইবে। ভগবান্ অবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া যখন এ প্রথার অন্যথাচরণ করেন নাই, তখন সামান্য সাধকের কথা কি বলিতেছ?

আজ প্রসাদের চণ্ডীমণ্ডপে তত বেশী লোক সমাগম হয় নাই, তাহার কারণ আজ গ্রামে একস্থানে কালীয়-দমন যাত্রা হইতেছে, বহুলোক তথায় সম্মিলিত হইয়াছে বলিয়া আজ প্রসাদের চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য, কেবল ভজহরি ও তর্কভূষণ প্রসাদকে লইয়া আপনাদের সন্দেহ অপনোদন করিতেছেন, আর প্রসাদও আজ প্রাতঃকাল হইতে বেশ বাহ্যিক ভাবে তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

বেলা যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, তখন যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল কয়েকজন লোক প্রসাদের দর্শনাভিলাষে তথায় সমুপস্থিত হইল। প্রসাদ তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিগো, আজ তোমরা মায়ের কোন্ লীলার বর্ণনা শুনে এলে?"

নিত্যানন্দ নামক একজন বৈষ্ণব বলিল—"প্রভুর কালীয়-দমন লীলা শুনিয়া আসিলাম। আহা! যাত্রা অতি মধুর হইয়াছে।"

প্রসাদ। কালীয়-দমন আর মধুর হইবে না? কালীয়-দমন না হইলে ত জীবের হৃদয়-সরোবরে মায়ের লীলা বিস্তার হয় না।

নিত্যানন্দ গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন না, শক্তির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল, শাক্ত-ভক্ত প্রসাদের মুখে কালীয়-দমনের কিছু নূতন বিষয় শুনিবার জন্য বলিলেন—"ভাই! কালীয়-দমন বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও না।"

প্রসাদ। আমাদের হৃদয়-কালিন্দী মধ্যে মনোরূপী কালীয় সর্প হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি ফণায় দেহ আবরিত করত বিষয়-বিষে পরিপূর্ণ হইয়া তমোময় হইয়া রহিয়াছে—তাহার বিষে হৃদয়-কালিন্দীর জল বিষময়—তথায় যে যায় এবং তাহার জল পান করে, সেই প্রাণ হারায়! ক্রূর সর্প কাহারও কোন কথা শুনে

না, কোন উপদেশ মানে না, জীবহিংসা তাহার জীবনের প্রধান ব্রত। শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, প্রভৃতি তাহার স্ত্রীগণ তাহাকে হিংসাকার্য্যে নিরস্ত হইতে কত উপদেশ দেয়, কিন্তু মনোরূপী কালীয় হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির সহস্রফণা লইয়া অহঙ্কারেই উন্মত্ত, কাহারও কথা তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না, যখন মা আমার কর্ষণ-রূপ শক্তির দ্বারা তাহার উক্ত প্রকার সহস্রফণাময় প্রবৃত্তিকে নাশ করিবেন, তখনই কালীয়-দমন হইবে, হৃদয়-কালিন্দী যখন আবার ভক্তির নিরালা অম্বু-বিমিশ্রিত হইয়া সুধাময় হইয়া উঠিবে, তখন তাহাতে আবার মায়ের মধুর লীলা ফুটিয়া উঠিবে—চিত্ত তখন মাতৃপদে আত্ম-সমর্পণ করিয়া মাতৃময় হইবে। ইহাই কালীয়-দমন।

রামপ্রসাদ মন-কালীয়ের অত্যাচার স্মরণ করিয়া শুম্ভিত হইলেন, সেই যে মায়ের এই শিশুসন্তানগুলোকে অধঃপাতে দিতেছে,—তাহাদের অদৃষ্ট চুরমার করিয়া ফেলিতেছে, তবে সে কি আমারও কপাল এরূপ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিবে? কি জানি আমার কপাল ত তত ভাল নয়, এইজন্য দুঃখ করিয়া প্রসাদ তাঁহার দুঃখহারিণী জননীকে বলিতেছেন :—

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে।
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্প মতি, ভাসালে সাগরের জলে॥
স্রোতের সেহালার মত, মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কিন্তু নামে না অগাধ জলে।
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আর দিব আলার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা দিব তোমার চরণ তলে॥
শ্রীরামপ্রসাদের এই বাণী, শুনগো মা নারায়ণী,
তনু-অন্তকালে আমার টেনে ফেলো গঙ্গাজলে॥

রামপ্রসাদ আজ বহুদিন পরে বিষ্ণুভক্ত নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখানুভব করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ আজব গোস্বামীর শিষ্য, প্রসাদ আজব গোস্বামীকে যেরূপ মান্য করিতেন, তাঁহার প্রিয়শিষ্য নিত্যানন্দকেও সেইরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

প্রসাদ নিত্যানন্দের নিকট বন্ধুবর আজব গোস্বামীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি কিরূপ আছেন, পূর্ব্বের মতন আজকাল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান, না বাটীতেই অবস্থান করেন ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ বলিলেন—"ঘুরিয়া বেড়াইলে ত একবার না একবার তোমার নিকট আসিতেন, তিনি এখন আর প্রায় বাটীর বাহির হন না। এখন প্রায়ই সকল সময়ে ভাল অবস্থায় গৃহ মধ্যে কালযাপন করেন।"

প্রসাদ। গোঁসাই ঠাকুরকে কেবল তুমিই বুঝিতে পারিয়াছ নিত্যানন্দ! কিন্তু অপর কেহ তাঁহাকে বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টা করে না, সাধারণ লোক পাগল বলিয়া উপহাস করে, কিন্তু ঠাকুরের ঐ পাগলামীর মধ্যে যে কত জ্ঞানগর্ভ সাধুভাব নিহিত রহিয়াছে—তাহা যে দেখিতে জানে—সেই দেখিতে পায়।

"আজ আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'র্ব্বো না, বহুদিন আপনার সহিত দেখা হয় নাই বলে একবার এসে প'ড়লাম, এসে কালীয়-দমনের যে মধুর ভাব শুনিলাম, তাহাতে আমার আশা সফল হ'লো, এক্ষণে বিদায় হই।" এই বলিয়া নিত্যানন্দ প্রসাদকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন, প্রসাদ তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পত্নীসনে

বধূমাতা সংসার কার্য্যে সুনিপুণা হওয়া অবধি সর্ব্বাণী বেশ অবসর পাইয়াছেন। এখন রামপ্রসাদ ঘরে থাকিলেই আর তাঁহার সঙ্গ-ছাড়া হন্ না, ইচ্ছা—স্বামীর কাছে কাছে থাকিয়া এইবার নিজের কিছু কাজ করিয়া লইবেন; তাই সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার সাধনার সহায়তা করেন এবং আপনি তাঁহার মত হইবার জন্ম চেষ্টা করেন।

রামপ্রসাদের শক্তি-সাধনার প্রধান সহায় সর্ব্বাণী; শক্তিরূপা সর্ব্বাণীকে পত্নীরূপে না পাইলে হয়ত রামপ্রসাদ সাধন-মার্গে এতদূর উন্নত হইতে পারিতেন না। মা ভগবতী ভক্তপ্রবর প্রসাদের সাধন-মার্গের সহায়রূপে সর্ব্বাণীর ন্যায় শক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন; এরূপ শক্তি বহু তপস্যার ফলে লাভ হইয়া থাকে। তান্ত্রিক সাধনায় শক্তিই প্রধান অবলম্বন—যদি সেই অবলম্বন ভাল না হয়—যদি তাহা সাধারণ রমণীর ন্যায় হীনশক্তি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার সাধনায় পদে পদে ব্যাঘাত ঘটে, সে কিছুতেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

আজকাল আমরা যে শক্তি লাভ করি, যে শক্তি আশ্রয় করিয়া আমরা সংসার-সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হই, সংসার-রূপ সাধন-সমরে যাহার শক্তি লইয়া আমরা জয়ের আশা করি, আমাদের এই শক্তি, শক্তি নামের অযোগ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা জীবকে শক্তিমন্ত না করিয়া বরং শক্তিহীন নির্জীব করিয়া ফেলে, প্রকারান্তরে সাধন-পথের কণ্টক-স্বরূপ হইয়া অধঃপাতের তমসাচ্ছন্ন কূপে নিমজ্জিত করিয়া দেয়, এইজন্য ভক্তকবি তুলসীদাস বলিয়াছেন। —"দিন্‌কা মোহিনী রাত্‌কা বাঘিনী, পলক পলক লহু চুষে, দুনিয়া সব বাউরা হোকে, ঘর ঘর বাঘিনী পুষে।" আজকাল আমাদের ভাগ্যে এইরূপ মোহিনী-শক্তিই লাভ হইয়া থাকে; যাহার মায়ামুগ্ধ হইয়া আমরা কেবল সংসার-পঙ্কে ডুবিয়া অশেষবিধ পাপসঞ্চয় করিতেছি, পরন্তু সহধর্ম্মিণীর সহায়তা লাভ করিয়া ধর্ম্মপথে একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। ধর্ম্মের সংসার পরিচালনের জন্য, পতিকে ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পত্নীই একমাত্র সহায়, আদ্যাশক্তির অংশসম্ভূতা এইরূপ পত্নী যাহার লাভ হইয়াছে, এ সংসারে সেই ধন্য, তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মে উন্নতি লাভ করিবার কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। কিন্তু আজকাল আমরা সেরূপ সদ্বংশজাতা গুণবতী শক্তির আশ্রয়লাভ না করিয়া নিজের অনুরূপা পত্নীর প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন না করিয়া অজস্র অর্থলোভে, পণের টাকাপ্রাপ্তির আশায় যথায় তথায়, যে-সে পাত্রীর প্রতি আসক্তি দেখাইয়া ভালবাসার ভানে কুটিলতার প্রশ্রয় দিয়া থাকি। যে ভালবাসার সহিত জীবনমরণ সম্বন্ধ, ইহপরকালের উন্নতি অবনতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম যে স্ত্রীর ভালবাসার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, আজ আমরা অর্থলোভে এবং রূপজ মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহা অপাত্রে স্থাপন করিতেছি, ভুলেও একবার নিজের রাশিচক্র, বংশ এবং স্বভাবের অনুরূপা পাত্রীর অন্বেষণ করি না, তাহাতে আকৃষ্ট হই না, কাজেই আমাদের মন্দ হইবে না ত হইবে কার?

পূর্ব্বে রূপজমোহ অথবা অনর্থ অর্থ লোভে আমাদের এই অতি বড় গুরুতর কার্য্য সমাহিত হইত না, বিশেষ বিবেচনা করিয়া সুলক্ষণা সৎস্বভাব-সম্পন্না পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিতাম, তাই তখন আমাদের সংসারে সুখ ছিল, ধর্ম্মকর্ম্মে তাই তখন আমরা মতিমান্ ছিলাম, ইহকালে সুখে-স্বচ্ছন্দে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে কাল যাপন করিয়া তাই আমরা পরকালেও উত্তম গতি লাভ করিতে পারিতাম। রামপ্রসাদের পিতা অর্থের লোভ না করিয়া, বধূর রূপজ্যোতিতে অন্ধচক্ষু না হইয়া, একটী পবিত্রতম দরিদ্রের পর্ণ-কুটির হইতে সর্ব্বাণীর ন্যায় রমণী-রত্ন বাছিয়া আনিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া আজ তাঁহার গুণে সংসার উজ্জ্বল, কুল

উজ্জ্বল, পুত্রের ভবিষ্যজ্জীবন চির উজ্জ্বল হইয়াছে। নির্লোভ হইয়া নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই এইরূপ মহীয়সী পাত্রী লাভ হইয়া থাকে। যে রমণী অবস্থা-ভেদে পত্নী, জননী, দুহিতা, মন্ত্রী ও গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে—সেইরূপ অমিত-শক্তি-সম্পন্না রমণী-রত্নে কণ্ঠ সুশোভিত করাই ত হিন্দুর প্রার্থনীয় এবং তাহাই ত তাহাদের শাস্ত্রের অমোঘ উপদেশ, নতুবা কেবল মাত্র হাবভাব-যুক্তা, সৌন্দর্য্যশালিনী, পত্নী-কন্যা লইয়া সন্তুষ্ট হইলে, তাহার তীব্র-উৎকট তেজে জীবন-তরু ঝলসিয়া যাইবে না ত কি? জীব সংসারে নানাবিধ অবস্থায় আতপতাপ-ক্লিষ্ট লইয়া পত্নীর প্রেম—বাৎসল্য, স্নেহ, করুণা, মন্ত্রণা উপদেশরূপ অমৃত-মন্দাকিনীর সুশীতল সলিলে স্নাত হইতে না পারিলে, জীবনভার যে দুর্ব্বিবহ হইয়া পড়িবে, শক্তির অভাবে এ দুর্ব্বহ ভার বহন করিবার শক্তি যে তাহার চির বিলুপ্ত হইবে।

রামপ্রসাদ অদৃষ্ট-গুণে পরমা-প্রকৃতি সর্ব্বাণী শক্তিকে আপন শক্তিরূপে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ তাঁহার এত সৌভাগ্য, যে সৌভাগ্যের অমরদুন্দুভি আজ বাংলার ঘরে ঘরে নিনাদিত। রামপ্রসাদ ও সর্ব্বাণী নাই—তথাপি তাঁহাদের গান আজ পতি-পত্নীকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। "রমণী জননী, জননী রমণী", ইহাই তন্ত্রের কথা, "যে রমণী জননী, তিনিই আবার গৃহিণী"। আদিতে শক্তি মাতৃরূপা—জগৎ প্রসবিত্রী, তারপর পত্নীরূপা, সেই গর্ভে নিজেই পুত্ররূপে প্রকাশমান, মরি মরি সৃষ্টি-তত্ত্বের কি অপূর্ব্ব ক্রমবিকাশ! তাই রামপ্রসাদ স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেই মাতৃমূর্ত্তির ভাবে বিভোর হইতেন। বনিতা, দুহিতা, বধূ, সহোদরা, প্রতিবেশিনী স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলেই তাঁহার মনে সেই পরম তত্ত্বের, সেই সৃষ্টিতত্ত্বের আদিভাব জাগিয়া উঠিত, তিনি সকলেরই পদধূলি লইতেন এবং তন্ময় হইয়া গাহিতেন :—

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গব হাঁড়ি কি চাতরে।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারীরে।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী তার সমভিব্যাহারে।
জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা কি অপরে।
প্রসাদ বলে বল্‌বো কি আর, বুঝে লও মন ঠারে ঠোরে।

আমি যখন সাধক—জ্ঞানের উচ্চ সীমায় সমারূঢ়, অজ্ঞানতা, মায়ামোহ যখন আমার কাটিয়া গিয়াছে, তখন আমিই শিব আর আমার শক্তিই আমার মা ব্রহ্মময়ী, মায়াতীত হইলে আমি ও আমার শক্তি এক, জগতের সমস্তই শিবশক্তি-

মন্ত্র। সাধক যখন মৈথুনযোগে সুসিদ্ধি লাভ করেন—যথার্থ মৈথুন-ভাব যখন তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন—তিনিই ত তখন জগৎ মা-ময় দেখিয়া ধন্য হন। উলঙ্গিনী ষোড়শী যুবতী-মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া মাতৃভাবে তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করা, প্রত্যেক অঙ্গ ন্যাসযুক্ত করিয়া স্পর্শ করত মাতৃভাব উপলব্ধি করা, ধ্যানযুক্ত হইয়া তাঁহাকে আদ্যা কালিকারূপে অবিচলিত-চিত্তে হৃৎকমলে স্থাপিত করা কতবড় নির্ব্বিকারচিত্ত সাধকের কাজ—তাহা সহজেই বিবেচ্য। বিশিষ্টভাবে নির্ব্বিকার এবং সংযত চিত্ত হইবার জন্যই শাস্ত্র প্রথমে আমাদের গর্ভাধানের নিয়ম প্রতি-পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন। ঋতুস্নাতা পত্নীতে শাস্ত্রানুসারে গর্ভাধান করিতে করিতে কামরিপু জয় করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে; তখন এ দুরন্ত প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে তারপর পঞ্চ মকার সাধনার সময় নগ্না ষোড়শী, শ্যামাঙ্গিনী রমণীকে অনায়াসেই জননী বলিয়া ভাবিতে পারা যায়; নতুবা একে বারেই মৈথুন যোগাবলম্বন করিয়া ঐরূপ আচরণ করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী এবং সে পতনে উত্থানের উপায় নাই—তাহার দ্বারা তোমার উর্দ্ধতন চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হইবে। এইজন্য কোন কোন তন্ত্রশাস্ত্র কলিতে মৈথুন-যোগ নিষিদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং এই জন্যই তন্ত্রের সাধনা একপক্ষে অতি সহজ আর এক-পক্ষে মহা কঠিন—ইহাতে প্রায়ই সাধককে পতিত হইতে দেখা যায়, বুঝিতে না পারিয়া তাহারা সদাশিবের অমূল্য উপদেশ প্রায় ব্যর্থ করিয়া ফেলে। প্রসাদের ন্যায় দৃঢ়চিত্ত বীর-সাধক না হইলে ইহাতে সফলতা লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য প্রসাদ সকল সময়ে ভক্তির পথ সুপ্রশস্ত বলিয়া কলির জীবকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার গানে ভক্তিমার্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তুমি অতীব শিশুসন্তান, জ্ঞানহীন, পতিত অধম, মায়ের কোলে উঠিবার জন্য কাঁদিয়া আকুল হও, আবেগকণ্ঠে কেবল চীৎকার কর, দয়াময়ী কখনই থাকিতে পারিবেন না, তোমাকে কোলে তুলিয়া লইতেই হইবে, তোমার সে আশা পূর্ণ করিতে তিনি বাধ্য, প্রাণে এইরূপ সরল বিশ্বাস লইয়া কার্য্য কর দেখি—সাধক! তোমার প্রাণের আশা পরিতৃপ্ত হয় কি না, একবার দেখ দেখি। কেবল সকল বিষয়ের আধ্যাত্মিক ভাব বুঝিতে যাইয়া শঙ্করের অমূল্য তন্ত্রশাস্ত্রটাকে মিথ্যা করিতে যাইও না, সবই সত্য, সবই হইতে পারে, তুমি অপারক বলিয়া কি আধ্যাত্মিক-ভাবে তন্ত্রশাস্ত্রটাকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিবে। মিথ্যা কিছুই নয়, যে পারে, তাহার কাছে সবই সত্য। তুমি সত্য, জগৎ সত্য; যাহা কিছু দেখ, শুন, পড়ো, সবই সত্য, সত্য না হইলে সত্যস্বরূপিণী মা তাহার সৃষ্টি করিতেন না, শাস্ত্রাদিতে তাহার স্থান হইত না।

প্রসাদ বলিতেন—"সত্যে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, নতুবা কি ইহার স্থায়িত্ব এত সুদৃঢ় হইতে পারে? মূর্ত্তি-পূজা সত্য, তুমি প্রশান্তচিত্তে, প্রগাঢ় বিশ্বাসভরে, একদিন দুইদিন করিয়া কিছুদিন এই মাটির মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া, আপন ভাবে বিভোর হইয়া প্রাণেরকাতর আবেদন কর দেখি, দেখিবে ঐ মূর্ত্তি তোমার সহিত কথা কহিবে, তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবে। মা আমার নাই কোথায়! স্ফটিক স্তম্ভমধ্যে প্রহ্লাদের ইষ্টদেব যদি বিরাজিত থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তোমার প্রতিষ্ঠিত প্রাণ-দিয়া ভক্তিভাবে পূজিত এই মূর্ত্তি মধ্যে তোমার মাকে দেখিতে পাইবে না, এ অসম্ভব মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল? অতএব সম্মুখে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কর, পুত্রের মত প্রাণের ডাকে তাঁহাকে ডাকিতে শিখ, তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন। যখন শিক্ষার পরিপকতা লাভ করিবে, তখন আর মূর্ত্তির আবশ্যক হইবে না, তুমি আত্মবিস্মৃত তাই, নতুবা এ মূর্ত্তি যে তোমার চেনা মূর্ত্তি, ভাল করিয়া দেখিলে সদা সর্ব্বদা যে তোমার এ ইষ্ট মূর্ত্তি হৃদয়-মধ্যে বিরাজিত, ভক্তি-বিশ্বাসের ক্ষেপণী লইয়া অগ্রসর হও, ধরিতে পারিবে, মানবজন্ম সফল হইবে।"

আজ কিয়দ্দিন হইল ভজহরি কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে; কাজে নূতন ব্রতী হইয়া তাহাতে কিছু রস্ পাইলে সহজে অতিরিক্ত পানের আশা বলবতী হয়, কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ অভ্যাস না করিলে শারীরিক অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়! ভজহরি প্রসাদের কৃপায় সাধনার সুগম পথ দেখিতে পাইয়া আজ অত্যধিক পরিশ্রমে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। প্রসাদ প্রতিদিন তাহার শিয়রে বসিয়া মাতৃনাম শুনাইতেছেন, তজ্জন্য জ্বরের প্রবলতা হয় নাই; ক্রমশঃই আরোগ্যের পথে উপনীত হইতেছে। ভজহরির আজ আর কোন শারীরিক গ্লানি নাই দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই সুখী হইয়াছেন।

যাহাকে আশ্রয় দেওয়া যায়, তাহাকে নিজে আত্মীয়-স্বজনের মত প্রতি-পালন করা উচিত; ভজহরির প্রতি প্রসাদের সেরূপ অনুকম্পার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না; সংসারের যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব ভার, তিনি তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; তাহার কোন কিছু আবশ্যক হইলে ভজহরিকে না জানাইলে হইত না। ভজহরিও প্রাণ দিয়া প্রসাদের সংসারে সুশৃঙ্খলা বিধান করিত, এই জন্য প্রসাদ এ সকল বিষয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ভজহরি আজ মায়ের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত। জ্বরের প্রবলতা বৃদ্ধির সহিত তোমার যেরূপ মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিয়াছিল, তাহাতে ভজহরির আরোগ্য সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু প্রসাদের ন্যায় বন্ধু

যাহার শিয়রে অনবরত বসিয়া আছেন, মাতৃনামের মৃতসঞ্জীবনী অনর্গল যাঁহার মুখ-নিঃসৃত হইয়া ভজহরির কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহার কি আর মৃত্যুভয় থাকে? পীড়া কঠিন হইলেও ভক্ত প্রসাদের ভবরোগবিনাশন মাতৃনামামৃত পানে ভজহরি সত্বর আরোগ্য লাভ করিল। সুবিজ্ঞ কণ্ঠাভরণ কবিরাজ যাহাকে বলিয়াছিল,—"বাঁচিবার আশা নাই; রোগী এ যাত্রা কিছুতেই রক্ষা পাইবে না, বিকার উপস্থিত হইয়াছে, নাড়ী নাই।" প্রসাদ নিকটে বসিয়া ভক্তির মাতৃ-নামের কবচ আঁটিয়া দিলেন; দেখিতে দেখিতে সে বিকারভাব কাটিয়া গেল। ভজহরি আবার মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় ক্রমশঃ দীপ্তিমান হইতে লাগিল। প্রসাদের ন্যায় সাধকেরা ইচ্ছা করিলে সব করিতে পারেন, অঘটন ঘটাইতেও তাহারা সক্ষম, তবে তপঃক্ষয় হইবার ভয়ে কিছু করেন না।

প্রসাদের তপোবল অতিশয় প্রবল, সাগর বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভজহরির আরোগ্য জন্য যে শক্তিটুকু ক্ষয় হইয়াছিল তাহা অতি সামান্য হইলেও একদিন সস্ত্রীক মাতৃ-সাধানার দিন স্থির করিলেন। একদিন শনিবার অমানিশায় মায়ের সেই পূজা আরম্ভ হইল। সর্ব্বাণীও এইদিন নিভৃতে পতির সহিত মায়ের পূজা করিবার মনস্থ করিলেন; তাই আজ গৃহকোণে ইহার আয়োজন, এ সাধনায় কোন আড়ম্বর নাই, লোক জানাজানি নাই, এমন কি বাটীর ছেলে মেয়েরাও ঘুণাক্ষরে ইহার বিষয় জানিতে পারিল না।

দারুণ বর্ষাকাল, আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন, শ্রাবণের বারিধারার বিরাম নাই; কখন টিপি টিপি, কখন মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছে, গৃহ হইতে কেহ বাহির হয় না। তখন বর্ষাকালের জন্য গৃহস্থমাত্রেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিত, তাই গৃহের বাহির হইবার আবশ্যক হইত না। সমস্ত দিন এইরূপ কাটিয়া গেল, অমানিশার সন্ধ্যা সময়ে আকাশ আরও ঘোরতর ভাব ধারণ করিল; সকলেই কাজ-কর্ম্ম সারিয়া গৃহের মধ্যে আশ্রয় লইল। প্রসাদের পুত্র, কন্যা, বধূ প্রভৃতি সকাল সকাল গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া শয়ন করিয়াছে, ভজহরির রুগ্নদেহ আজ কয়েকদিন হইল সবল হইয়াছে বলিয়া সেও সুযোগে শয্যার আশ্রয়ে মানস-জপে কাল কাটাইতে লাগিল। সর্ব্বাণী ও প্রসাদ একটী নিভৃত কক্ষে পূজায় উপবিষ্ট; সুন্দর মাতৃমূর্ত্তির একখানি আলেখ্য সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে; তান্ত্রিকমতে পূজার সাধ্যমত আয়োজন হইয়াছে। প্রসাদ প্রথমে মায়ের উদ্বোধন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দিলেন, তার পর সর্ব্বাণী পূজায় বসিলেন, প্রসাদ ভিন্ন আসনে বসিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। একে অমানিশার অন্ধকার, তাহার উপর বর্ষাকালীন প্রকৃতির গাঢ় অন্ধকার মিশ্রিত

হইয়া যেন চারিদিকে অন্ধকারের রাজত্ব বিস্তৃত করিয়াছে। প্রবল বায়ু বহিতেছে, গৃহ মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা দায়, এখনকার মত ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ তখন অনেকের ছিল না, বিশেষতঃ প্রসাদের ত ছিলই না; কাজেই ছিদ্রপথে প্রবল বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। বায়ুবেগে যদিও গৃহ-দীপ শিখাহীন হইল, তথাপি একি এ! দীপ না থাকিলেও প্রসাদের পূজাগৃহ এ কি এক সুশীতল আলোক রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া গেল; যাহার স্নিগ্ধ রশ্মিতে সাধকের প্রাণ পুলকে পরিপ্লুত হইল! জগদম্বার আবির্ভাবে যে সে গৃহ স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, দীপাধার বা কৃত্রিম আলোকরশ্মি তাহার নিকট স্থান পাইবে কেন? যাঁহার পদনখরের তিলমাত্র রেণু লইয়া সূর্য্যচন্দ্র জগৎজোড়া আলোক বিতরণ করেন, আজ সেই বিশ্বজননী যখন হাসিমুখে সম্মুখের আলেখ্যে আবির্ভূতা, তখন তাঁহাদের আবার আলোকের অভাব কি? আর ভক্ত-হৃদয় ত চির-আলোকময়, আজ সেই আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া কক্ষতল আলোক-প্লাবিত হইল।

প্রসাদ সমাধিমগ্ন; সর্ব্বাণী করযোড়ে মাতৃ-আবাহন করিলেন। মূর্ত্তির বক্ষে হস্তস্থাপন করিলেন, নাসিকার অগ্রভাগ পরীক্ষা করিলেন; দেখিলেন মূর্ত্তিতে জীবনী-শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, প্রাণময়ীর প্রাণের স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বাণী শিবসম স্বামীর ক্রোড়ে বসিয়া মহাশক্তি হইতে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন; তার পর আলেখ্য সরাইয়া তৎস্থানাভিষিক্তা হইয়া বসিলে, তান্ত্রিক প্রসাদের সাধনা আরম্ভ হইল। পাঠক! এ সাধনার বিষয় আর বেশী লিপিবদ্ধ করা যায় না এবং করাও উচিত নহে, নিজ নিজ অভিজ্ঞ গুরুর নিকট অবগত হইয়া কৃতার্থ হউন। তবে "শিব" ইকার রূপ শক্তি বিচ্যুত হইলেই "শব", তাই প্রসাদ আজ শক্তির পদতলে বিলুণ্ঠিত। সমস্ত রজনী শক্তিসাধনা করিয়া শিবশক্তির সহায়ে তাঁহারা পরম শক্তিময় হইয়া পরদিন আবার সংসার-খেলায় মত্ত হইলেন।

প্রসাদ এক একদিন এক একপ্রকার নূতন সাধনার ইচ্ছা করিয়া তাহাতেই পরমানন্দময়ী পরমেশ্বরীর ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। প্রসাদের ন্যায় আব্‌দেরে ছেলের নিকট মায়ের যেন নিস্তার ছিল না; তিনি যখন যে ভাবে দর্শন ও উপভোগের ইচ্ছা করিতেন, বেটীকে তখন সেইভাবেই দর্শন দিয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে হইত। প্রহ্লাদের জন্য ভগবানকে যেমন কত রূপ ও কত প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, পরম ভক্ত প্রসাদের জন্যও ভগবতীকে সেইরূপ বহু প্রকার ভাবে আসিয়া দর্শন দানে তাঁহাকে চরিতার্থ করিতে হইয়া-

ছিল। ভক্তগতপ্রাণা মা যে সদাই ভক্তের অভীষ্ট পূরণে ক্ষিপ্রহস্তা, জগতে তাঁহার মহিমা যে এত প্রকট হইয়াছে ; সে কেবল ভক্তের জন্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তিরোধানের পূর্ব্বাবস্থা

ভক্তি বড় কি জ্ঞান বড় ? ভক্ত খোলা প্রাণে উত্তর করিলেন,—"ভক্তিই বড়"। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন—"সকলের মূল ভক্তি মুক্তি হয় মন তার দাসী।" ভক্তির উচ্ছ্বাস হৃদয়ে উচ্ছসিত হইলে ভক্ত দিব্য-দর্শন ও শ্রবণ লাভ করিতে পারে, ভক্তিভরে অনায়াসে ভগবানের আসন টলাইয়া তাঁহাকে নিকটস্থ করিতে পারে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারে! সাধনমার্গে অঘটন ঘটাতে ভক্তির ক্ষমতাই সর্ব্ব উচ্চে। এই ভক্তির বলেই অর্জ্জুন শ্রীভগবানের বিরাটমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। অশেষ সাধ্য-সাধনা করিয়া যে মূর্ত্তির দর্শন দেবভাগ্যেও ঘটে নাই, অর্জ্জুন তাহা অনায়াসে অবলোকন করিয়া ধন্য হইয়া ছিলেন। ভক্তি হৃদয়ে দৃঢ় হইলে মন সরল হইয়া যায়, বুদ্ধি নিবাতনিষ্কম্প দীপের ন্যায় স্থির ও নিশ্চল হইয়া থাকে, সাধক তখন আপনাহারা হইয়া কি বলে, কি করে, তাহা বুঝিতে পারে না, ভক্তির উচ্ছ্বাসে জ্ঞান থাকে না, লজ্জা-ভয় একেবারে তিরোহিত হয়, হৃদয়ের বক্রভাব দূর হইয়া যায়, উহা সরলতার আধার হইয়া থাকে। সরলপ্রাণ শিশুভাবাপন্ন না হইলে ভক্ত হওয়া যায় না। মনঃস্থির না হইলে ভক্তির কার্য্যকরী ক্ষমতা জন্মায় না। ভক্তির বলে ভাব-সাগরে তলাইয়া যাইতে পারিলে তবে ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক যখন ভক্তিভরে ভাব-সাগরে হাবুডুবু খায়, তখন কি তাহার আর বাহ্যজ্ঞান থাকে, না বিচার বুদ্ধি তাহার সামনভাবে কাজ করিতে পারে, ভক্তিভাব হৃদয়ে জাগিলে, এ সকল অসম্ভব। এই স্থানে একটী পৌরাণিক কথা মনে পড়িতেছে —একদিন ভগবান্ পরম ভক্ত বিদুরকে দেখিতে তাঁহার বাটী আসিলেন, তখন বিদুর বাটীতে ছিলেন না, ভিক্ষায় গিয়াছিলেন। কাজেই বিদুরপত্নী তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। বিনা আয়াসে আজ ভবারাধ্য ধনকে গৃহে পাইয়া বিদুরপত্নীর বড় সাধ হইল, তাঁহাকে কিছু খাওয়াইবেন। এদিক্ ওদিক্ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, গৃহে কিছু নাই, প্রাণে

বড়ই ধিক্কার হইল। হায়! যাঁহার সেবা করিতে ত্রিলোক লালায়িত, আজ বিনা আয়াসে তাঁহাকে গৃহে পাইয়াও কিছু খাইতে দিতে পারিলাম না; ধিক আমার জীবনে, আমার তুল্য হতভাগিনী আর কে আছে? এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে তাঁহার পূর্ব্বদিন-রক্ষিত একটী রম্ভার কথা মনে পড়িল এবং তাড়াতাড়ি তাহা লইয়া আসিলেন ও তাহার খোলা ছাড়াইয়া প্রেমগদ্‌গদ প্রাণে, ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া তন্ময়ভাবে তিনি রম্ভার সারাংশ ফেলিয়া দিয়া খোলাটী ভগবানের মুখে প্রদান করিলেন। অসীম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া তাঁহার নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভক্তপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রদত্ত ভক্তিমাখা কলার ছোপা অম্লান বদনে ভোজন করিতে লাগিলেন। দ্বিরুক্তি করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিদুররমণীর চক্ষু সেই পরিত্যক্ত রম্ভার প্রতি পড়িল। তখন তিনি জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিলেন—"হায়। আমি কি করিতে কি করিলাম, ভগবান্ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর, হে জগন্নাথ! এ জগতে কত ভক্ত তোমাকে কত উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী ভোজন করাইয়া থাকে; ক্ষীর, সর, নবনী প্রভৃতি কত সুখাদ্য তোমার সুন্দর অধরে স্থান পায়, আর হতভাগিনী আমি, তোমার শ্রীমুখে কলার ছোপা দিলাম—শতধিক্ আমাকে।" ভগবান্ ভক্তিমতী বিদুর-পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"মা। তোমার ভক্তিমাখা কলার ছোপা খাইয়া আমি পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি, অমৃত ভোজনেও আমার এমন তৃপ্তি হয় না। ভক্ত, ভক্তিভরে আমাকে যা নিবেদন করিয়া দেয়, আমি সুধাজ্ঞানে আগ্রহ সহকারে তাই ভোজন করি। মা! তুমি কি জান না, ভক্ত প্রহ্লাদের নিকট হইতে আমি বিষকেও অমৃত বলিয়া ভোজন করিয়াছিলাম। এখন যদি তুমি আমাকে অমৃত আনিয়া দাও, তাহা হইলেও উহা আমার নিকট ছোপার মত সুমিষ্ট লাগিবে না। কারণ তখন তোমার হৃদয়ে কেবল ভক্তিই প্রবলা ছিল, তাহা মাখাইয়া যাহা দিয়াছ তাহাই মধুময় হইয়াছে। এখন জ্ঞানের উদয় হইয়া তোমার সে ভক্তিভাব নষ্ট হইয়াছে, কাজেই এখন অতি উপাদেয় সামগ্রীও আমার ভাল লাগিবে না।" পাঠক দেখিলেন কি? ভগবানের নিকট ভক্তি কত প্রিয়! আর ভক্তি-উৎস উচ্ছ্বসিত হইলে ভক্তের যে ভেদ-জ্ঞান থাকে না —মন বুদ্ধি যে নিশ্চল হইয়া যায়, তাহা বিদুর-পত্নীর কার্য্যে বুঝিলেন কি? আমাদের প্রসাদেরও এখন এই অবস্থা, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইলেও তিনি সর্ব্বদা ভক্তি-স্তরে সন্তরণ দিয়াই মনপ্রাণ সুশীতল করিতেন। মুক্তির অধিকারী হইলেও সেই নীরস বিষয় আয়ত্ত করিতে তাঁহার প্রাণ চাহিত না—তাই তিনি

গাহিতেন—"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল, ও মন চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।" ইহাই হইল ব্রহ্মজ্ঞানী, শ্রীরামপ্রসাদের অন্তরের কথা। অনবরত যাতায়াত করিব—প্রভু ও দাস, মা ও ছেলে হইয়া তোমার সেবা করিব, ভক্তিভাবে মা মা বলিয়া কাঁদিব ; প্রেমাশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইবে—ইহাই তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা। তবে মা কি এমন ছেলেকে কাছ ছাডা করিতে পারেন ; কলি ক্রমশঃ ঘোরতর হইতেছে—ধর্ম্মপ্রভাব আর তত প্রভুত্ব বিস্তার করিবে না, অধর্ম্মে ক্রমশঃ জগৎ পূর্ণ হইলে অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য, "ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—ইহাও করিতে হইবে! এইজন্য মা আমার কোলের ছেলে প্রসাদকে বোধ হয় কোলে টানিয়া লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন, কারণ প্রসাদ এখন অবস্থা ভেদে প্রায়ই মৃত্যুবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিতেছেন।

লোকে কথায় বলে—"জপ তপ কর কি, ম'র্ত্তে জান্‌লে হয়।" তুমি কত বড ধাম্মিক বা কত বড সাধক তাহা তোমার মৃত্যু দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। যে যত সজ্ঞানে এবং হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে ; মৃত্যুভয়ে যাহার হৃদয় তিলমাত্র ভীত হইবে না, বলদর্পিত হইয়া কালকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিবে, যিনি গীতার সেই প্রাণভুলান শ্লোক উচ্চারণ করিয়া কালকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া বলিবেন :—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
> বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

অথবা যিনি আত্মার অবিনাশী অবস্থা বুঝিয়া বলিবেন :—

> নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
> ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

এই ভাব যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া হৃদয়ে তিলমাত্র ভীতি সঞ্চার করিতে পারে না, সেই যথার্থ বীর সাধক। প্রসাদের অন্তর মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়া ত দূরের কথা, তিনি মৃত্যুকেই ভয় দেখাইতেন—মৃত্যুকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া কত উপহাস করিতেন ; তাহাকে তিনি তিলমাত্র গ্রাহ্য করিতেন না ; প্রসাদের নিকট মৃত্যুর জোর খাটিত না—তিনি হাসিয়া টিট্‌কারী করিয়া এ ভয় উড়াইয়া দিতেন—এ বিষয়ে তাঁহার অজস্র সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটী অবস্থা-ভেদে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে ॥
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ,
কি করে তার মরণ ভয়ে।

কালী পূজার কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রসাদ স্বহস্তে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়াছেন। মাতৃনামে কি অচল অটল বিশ্বাস, এ বিশ্বাস যাঁর হৃদয়ে আছে, যিনি সদা সর্ব্বদা কালী নামের গণ্ডীর মধ্যে বাস করিতেছেন, কাল তাঁর কি করিতে পারে? প্রসাদের জননী কালীর পদতলে যখন মহাকাল শায়িত হইতেছেন—তখন তিনি আবার কালের ভয় করিবেন কেন? তবে যত দিন যাইতেছে, ততই এবার তাঁহার মনে সংসার ছাড়িবার ভাব প্রকাশ পাইতেছে; তিনি এখানকার সুখে আর তত বিভোর হইতে পারিতেছেন না, যেন কিছু-দিনের জন্য আর কোথাও যাইবার ইচ্ছা হইতেছে; যেন সে পুরীর কিছু কিছু দেখিয়া আসিবার সাধ তাঁহার মনোমধ্যে জাগরিত হইয়াছে। তাই তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এই জন্য পরের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া এখন আর বৃথা কাল কাটান না, নিজের কাজেই বিভোর থাকেন এবং মনের চমক ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বলেন :—

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত ॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারী, বাইতে নারি ডুবে মরি,
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু
এবার এরাই ক'চ্ছে দাগাদারী ॥
এনেছিলে, বসে খেলে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন. তখন তহবিল হবে হারি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর;
আপন ঘরে যায় যে চুরি ॥

সময়ে সময়ে মনকে এরূপ উপদেশ না দিলে পাচ্ছে সে অসামাল্ হইয়া পড়ে, পাছে সে পরের কাজে মত্ত হয়ে আপনার কাজ ভুলে যায়, তাই প্রসাদ তাহাকে বলিতেছেন—"মন! যা মূল আছে—তাহা যতই বাড়াতে পার ততই মঙ্গল; এই ভবের বাজারে বাজার ক'র্ত্তে এসে লাভে হারা হইও না; দ্বিগুণ লাভ

করিয়া বাড়ী যেতে পারিলেই তোমার মূলে সুনাম হইবে এবং আজীবন সুখে কাটাইতে পারিবে—নতুবা দুঃখভোগ অনিবার্য্য, তোমার দুঃখের কপাল তাহা হইলে আর ঘুচিবে না। তাহার পর তাহাকে আরও মিনতি করিয়া বলিতেছেন—কারণ মনকে যত বশে রাখিতে পারিবে; তাহাকে তোয়াজ করিয়া যত আপনার করিতে পারিবে, ততই মঙ্গল, তাই বলিতেছেন—

মন রে তোর চরণ ধরি।
কালী ব'লে ডাক্ রে ওরে ও মন,
তিনি ভব পারের তরী।
কালী নামটা বড় মিঠা, বল রে দিবা শর্ব্বরী।
ওরে যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি রে শমনে ডরি।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী ব'লে যাব তরি,
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে তরাবেন এ ভববারি।

মনকে লইয়াই সব, সাধন ভজন যাহা কর, মনকে সরল করিতে হইবে, তাহাকে বশে রাখিবার জন্য অহরহঃ যত্ন করিতে হইবে; খুব পাকা সাধক হইলেও মনের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা চাই, কারণ সে যে কখন কি বিপদ ঘটাইয়া ফেলিবে—তাহার ত স্থিরতা নাই। তাই প্রসাদ হেন সাধকও জীবনের সন্ধ্যা-কালে একবার মনকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন,—"এখন অন্য ভাবনায় কাজ নাই—এখন নিজের ভাবনা ভাব, স্বধামে যাইয়া মায়ের কোলে বসিবার জন্য চেষ্টা কর, আর যেন কোল ছাড়িতে না হয়—সদাসর্ব্বদাই যেন তাঁহার কোলে বসিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে পার—যেন চিরদিন তাঁহার হইয়া থাকিতে পার।" প্রসাদের মন তাহাতে সাড়া দিয়া বলিল—"প্রসাদ! এখনও আমার প্রতি তোমার বাল্যভাব যায় নাই, এখনও কি আমাকে সুদৃঢ় হইতে দেখ্‌ছো না, আমার এমন কি হীনতা আছে যে তাহার জন্য আমার প্রতি তুমি এতদূর অবিশ্বাস করিতেছ! প্রসাদ মনের উক্তি শুনিয়া আশান্বিত হইলেন, সে ঠিক সমভাবে আছে এবং চিরকাল থাকিবে দেখিয়া তিনি গাহিলেন,

শমন আমার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্দ দূরে গেছে।
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে চারি শিব চৌকি র'য়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর র'য়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে॥
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা, চৌকীদারী ভার ল'য়েছে।

যে শক্তির জোরে চেতন করে, তাতেই প্রাণ নির্ভর আছে॥
মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠানে, কণ্ঠমূলে, ভুরু মাঝে॥
এ চারি স্থানের চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে।
ওরে তমোনাশ করি তারা, হৃদি মন্দিরে বিরাজিছে॥

একবার মনকে নাড়াচাড়া দিয়া প্রসাদ দেখিলেন, যে তাঁহার মন আর অন্যমন করিবে না—সে ঠিক আছে জানিয়াও তাহার প্রতি কত কথা বলিয়া লইলেন, তারপর বলিলেন :—

তাই বলি মন জেগে থাক,
পাছে আছে রে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল।
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে ক'রতে পারে জোর॥
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা জোর।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া তুমি রজনী কর ভোর।
কালী যদি না তরাবে কলি মহাঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর॥

রামপ্রসাদের প্রস্তুত মাতৃমূর্ত্তি যেন মুচকি মুচকি হাসিতেছেন, প্রসাদের ভাব দেখিয়া তিনি যেন হাস্য সংবরণ করিতেছেন না। ভজহরি কাছে বসিয়া নয়ন-জলে ভাসিতেছেন। আজ পূজার পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদ নানারূপ মৃত্যু-বিষয়ক সঙ্গীত গাহিতেছেন, এইজন্য তাহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, সে মনে করিতেছিল—এ আবার কি? প্রসাদের ন্যায় ভক্ত কি সত্য সত্যই পৃথিবী অন্ধকার করিয়া এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন? হায়! আজ তাঁহার মনের ভাব এরূপ হইয়াছে কেন? অন্য সময় হইলে তাঁহাকে নানাপ্রকার কথায় বুঝাইতেন কিন্তু এখন প্রসাদের যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহাকে বুঝান আর চলে না, আর বুঝাইলেই বা শুনিবে কে? প্রসাদ যে এখন আর কোন কথা শুনে না, অন্য কাজ করে না, অন্য বিষয় ভাবে না, আজকাল সে যে অনন্য-শরণ কেবল মা মা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তারা বাহিয়া কেবল তাহার ধারা প্রবাহিত হয়, সে যেন পৃথিবীর কোন কিছু আর চাহে না, কি যেন এক অনন্ত ভাবে সে বিভোর, যেন সে কোথায় যাইবার জন্য সতত উদ্‌গ্রীব। হায়! তবে কি সত্য সত্যই প্রসাদ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে? আজ মায়ের নিকটও তাহার সেই ভাব, অন্য অন্য বারের মত আজ পূজায় ত তাহার সে ভাব দেখিতে পাইতেছি না। হায় হায়! এ কি হইল, মা, তোমার প্রসাদের মতিগতির

পরিবর্ত্তন কর। যে যাহাকে ভালবাসে, তাহার অমঙ্গল চিন্তা করিতেও যেন তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। হায়! প্রসাদ যে ভজহরির আশ্রয়-দাতা বন্ধু, এ সংসারে প্রসাদব্যতীত তাহার আর কে আছে! সে জগতের সমস্ত ছাড়িতে পারে, জগতের প্রত্যেক বস্তু চক্ষের অন্তরাল করিয়া সে চিরজীবন কালযাপন করিতে সক্ষম, কিন্তু প্রসাদকে নয়নের অন্তরালে রাখিয়া এ দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করা ভজহরির পক্ষে একান্ত অসম্ভব। রামপ্রসাদ যে ভজহরির প্রাণে প্রাণে গাঁথা, রামপ্রসাদ যে ভজহরির জীবন অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু—সে যে এ জগতে রামপ্রসাদ ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, আর কাহাকেও মানে না, সে যে রামপ্রসাদের কায়ার ছায়া, রামপ্রসাদের বাক্য যে তাহার পক্ষে বেদ-বাক্য; অতএব এ হেন প্রাণ-প্রিয় বন্ধু ছাড়িয়া সে কি লইয়া জগতে থাকিবে! কিন্তু প্রসাদের যেরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আজ কাল সে যেরূপ ভাবে মৃত্যুর সাহচর্য্য করিতেছে—তাহাতে সে যে অতি শীঘ্র মরধাম পরিত্যাগ করিবে—তাহা তাহার এখনকার ক্রিয়াকলাপ এবং সঙ্গীত রচনার ভাব দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ভজহরি রামপ্রসাদের সহিত আজ বহুদিন এক সূত্রে গাঁথা থাকিয়া দেখিতেছে, প্রসাদ যখন যে বিষয় ভাবে, কার্য্যে ঠিক তাহাই সম্পাদিত হয়। সে যখন কেবল মৃত্যুভাব ভাবিতেছে, মৃত্যুর স্মরণ করিয়া নির্ভীক চিত্ত সাধক যখন তাহাকে হেলায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য অজস্র সঙ্গীত গাহিয়া নানাভাবে উপহাস করিতেছে, তখন রামপ্রসাদের যে আর ইহ সংসারে থাকিবার ইচ্ছা নাই—তাহা নিশ্চয়, কারণ প্রসাদের ইচ্ছামাত্র ইচ্ছাময়ী তাহার সকল ইচ্ছা সংপূরণ করিয়া থাকেন। ভক্তের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী জননী যে তাঁহাকে আপন অঙ্কে টানিয়া লইবেন, ভজহরি তাহা বুঝিতে পারিয়া আর প্রসাদের কাছছাড়া হইল না। পূজার আয়োজন সমভাবেই চলিতে লাগিল। পাঠকের এই স্থানে সন্দেহ হইতে পারে যে, রামপ্রসাদের শেষ জীবনের পূজা কিরূপভাবে সমাহিত হইত? স্বতঃই এ কথা সকলের মনে উদয় হইতে পারে যে প্রসাদ হেন সাধকও কি চিরজীবন সকাম ও সাকারভাবে পূজা করিতেন? এ কথার উত্তরে আমরা বলি—যে সাকার ও সকাম ভাবে পূজা করিয়া তিনি হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেন বলিয়া শেষ দিন পর্য্যন্ত সাকার ও সকাম ভাবেই উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, তবে সে দশায় তিনি পূজা করিবার সময় আর তত নিয়মাদি বজায় রাখিতে পারিতেন না—প্রতিমার সম্মুখে পূজায় বসিলেই তিনি এরূপ ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়িতেন যে, মন্ত্রাদি উচ্চারণের সময় হইত না, ভক্ত কেবল মা মা বলিয়াই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন; সম্মুখের

মাটির মূর্ত্তি যেন আনন্দভরে প্রসাদের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত। সে মূর্ত্তি যেন প্রাণভরা, ভক্ত কথা কহিলেই যেন তাহার উত্তর দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু কথা কয় কে, আর উত্তর লইবার জন্য এত আগ্রহই বা কার? প্রসাদের ত আর অভাব নাই, তাই তিনি তখন তত লালায়িত নন। এখন তুমি লালায়িত হইয়া পুত্রের প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিতে বাধ্য।

হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মময়—একথা রামপ্রসাদ প্রাণে প্রাণে জানিতেন। হিন্দুর কার্য্য কখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে না, ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণ হিন্দুদের শাস্ত্রবেত্তা গুরু—তাঁহারা যাহা শিখাইয়াছেন, যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলই সত্য, এক তিল মিথ্যা হইতে পারে না; তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে কার্য্য করিলে ফল অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য প্রসাদ পূজার সময় তাঁহাদের প্রদর্শিত উপদেশানুসারে পূজা করিতেন; তান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসারে পঞ্চতত্ত্ব বলির ব্যবস্থা করিতেন, ক্রমশঃ সেই পথে অগ্রসর হইয়া সাধক এখন যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছেন, যে অবস্থা এখন তাহার ভোগ হইতেছে—তাহা মনুষ্য মাত্রেরই প্রার্থনীয়, শুদ্ধ সকাম এবং সাকারের মধ্য দিয়া সাধক আজ কামনা রহিত, তন্ময় অবস্থায় অবস্থিত। আনন্দময়ীর আনন্দদুলাল প্রসাদ আনন্দ-স্রোতে ভাসমান, তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র প্রেমে ডগমগ, এখন আর তাহার ঠিকভাবে সমস্ত নিয়ম বজায় রাখিয়া ক্রিয়া করিবার সময় নাই—যাগ করিতে যান, যে জিনিষ ছুঁইতে যান, তাহাতেই মা-ময় দেখিয়া তাঁহার প্রেমসাগর উথলিয়া উঠে; সাধক সে সাগরের অতলতলে কোথায় ডুবিয়া যান—তাঁহার সন্ধান পান না, কাজেই হাত নড়ে না, মুখ বলে না, চক্ষু চাহে না, যদিও চাহে—তাহার কোন বাহ্যশক্তি বা চাঞ্চল্য থাকে না, পলক পড়ে না, যেন সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী শক্তি, শক্তি-স্বরূপিণী মাতৃ-প্রতিমায় লয় হইয়া নিজত্ব হারাইয়াছে। তাই সাধক ব্রহ্মময়ীর ভাবস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া বিভোর হইয়া গাহিলেন;—

মন তোমার কি ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তা জান না।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়া কত রত্ন সোণা,
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাও তাঁয়, দিয়ে
ছার ডাকের গহনা।

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা,
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াবি তাঁর আতপচাল
আর বুট ভিজোনা।
জগৎকে পাল্‌ছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না,
ওরে কেমনে দিতে যাও বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥

পাঠক দেখিলেন—সাধক রামপ্রসাদ সাকার এবং সকামের মধ্য দিয়া আজ কত উচ্চে আরোহণ করিয়াছেন। তুমি যদি শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সকাম ও সাকার ভাবে কার্য্য কর তাহা হইলে সেই ঋষি-প্রদর্শিত পথ তোমাকে উন্নতির পথেই লইয়া যাইবে, তদ্দারা কখনও তোমার মন্দ হইবে না। তন্ত্র শাস্ত্রে প্রথমে শরীরকে রক্ষা করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে ব্যবস্থা আছে—তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য, নূতন সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়া তাহার ব্যভিচার করিলে বা সকল বিষয়ের আধ্যাত্মিক অর্থ করিলে চলিবে কেন? প্রসাদের ন্যায় অবস্থিত হও; তাঁহার ভাবে ভাবুক হইয়া ক্রমশঃ কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হও—তারপর তাঁহার মত প্রাণ-মাতান সুরে গাহিও—

মন তোমার এত ভাবনা কেনে,
কালী জপ রে হৃদি-পদ্মাসনে।
মাটি, ধাতু, পাষাণ মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
এখন মনোময় প্রতিমা গড়ি পূজা কর মনে মনে।
ঝাড়লণ্ঠন বাতির আলো, সে আলো না যায় সেখানে,
তুমি জ্ঞান-প্রদীপ জ্বেলে দাও মন, জ্বলতে থাকুক রাত্রদিনে।
ঘৃত দুগ্ধ মণ্ডা ছানা, কাজ কি রে সে আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে মাকে তৃপ্ত কর নিজ গুণে।

প্রাণের এ সন্তোষ, এরূপ ভাবে পূজা করিয়া তৃপ্তি সাধন করা, সাধকের কোন্ অবস্থায় সম্ভব? সংসারাসক্ত স্বার্থান্ধ, অহং পরায়ণ কলুষপূর্ণ জীব, আমরা কি এভাবে সাধনা করিয়া তৃপ্তি-লাভ করিতে পারি, প্রথমে এভাবে সাধনা করিলে যে তুমি সাধনার আরাধ্য ধন মাতৃচরণ লাভে সমর্থ হইতে পারিবে না—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এভাব যে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারিয়াছে, তাহার যে আর বাহ্যিক পূজার আবশ্যক নাই, তাহা কে না স্বীকার করিবে।

মা যাহাকে দয়া করেন—সাধন বিষয়ে প্রতিদিনই সে একটু না একটু করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ক্রমশঃ তাহার ভেদ-বুদ্ধি ঘুচিয়া যায়, সে ঘোর অন্ধকারেও আলোকের রেখা-পাত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে থাকে, মনের

মধ্যে একটা তীব্র তেজ উদ্দীপ্ত করিয়া সে নির্ভয়ে পথ চলিতে থাকে। প্রসাদ সাধনাআরম্ভ করিয়া অবধি একদিনের জন্য হতাশ হন নাই, প্রতিদিন তিনি নূতন সত্যের উপলব্ধি করিয়া দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইয়া বহুদিন পরে আজ এই চির-ঈপ্সিত তুরীয় অবস্থায় আসিয়া মরধামে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

পূজার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আহারাদির পর প্রসাদ সপরিবারে চণ্ডীমণ্ডপে বধূমাতা ভগবতীর স্বহস্তে প্রস্তুত শয্যায় শয়ন করিলেন। আজ কালের সহিত তাঁহার সমানভাবে কথাবার্ত্তা হইবার পর পুত্রকন্যাগণকে কত আদর আপ্যায়ন করিতেছেন, পাগলীকে (স্ত্রীকে) পারমার্থিক বিষয়ে কত প্রশ্ন করিতেছেন, সর্ব্বাণী জ্ঞানানুসারে তাহার উত্তর দিতেছেন। মৃত্যুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"মৃত্যু আবার কি, মায়ের ছেলের আবার মৃত্যু কি? মায়ের কোলে যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

প্রসাদ বলিলেন—"আমি যদি মায়ের কোলে উঠ্‌তে যাই, তাহা হ'লে তোমার কি হবে?"

সর্ব্বাণী। আমিও যাব, তুমি আমি ছাড়া কখন নয়, আর আমি তুমি ছাড়া কখন সম্ভব হ'তে পারে না।

পাঠক! সতীর প্রাণের তেজ কতদূর দেখিলেন কি? প্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ইহাই কি স্থির?"

সর্ব্বাণী। ইহার আবার অস্থিরতা কি? একটা জিনিষ কখনও দুইস্থানে থাকিতে পারে না।

প্রসাদ আর কোন কথা কহিলেন না, সর্ব্বাণীর প্রাণের দৃঢ়তা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পুত্রকন্যাগণ সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা আদৌ মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। ভজহরি কিন্তু এইবার সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন:—"প্রসাদ, প্রাণের ভাই! সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার অনুগত ভৃত্য আর এখন অবুঝ নহে, এ কয়দিনের ভাব দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তুমি আমাদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইবে —কিন্তু ভাই! তোমার এই অনুগত আশ্রিত ভৃত্যের কি উপায় হইবে? আমি যে তিলমাত্র তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।"

রামপ্রসাদ। ভাই! এই চক্ষের দেখাই কি দেখা, তুমি ত মনের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছ, তবে আর ভাবনা কি, আবশ্যক হইলেই ডাকিয়া দেখা করিবে।

ভজহরি। ডাকিলেই আসিবে ত? দাসকে ভুলে থাক্‌বে না ত?

প্রসাদ। ভাই! আমি চিরদাস, ভৃত্যের ভৃত্য, আমার দাস বা ভৃত্য কেহ নাই—সমস্ত মায়ের, তুমি দয়া করিয়া দেখিতে চাহিলেই দেখা হইবে।

ভজহরি। এমন করিয়া কতদিন দেখিতে হইবে, কতদিনে আমার উদ্ধার হইবে, প্রসাদ?

প্রসাদ। ভাই! সে বেশী দিন নয়, মা সত্বরই তোমার প্রতি কৃপা করিবেন।

ভজহরি। প্রাণের ভাই প্রসাদ আমার; তোর আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়াই আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু ভাই! তোর তিরোধানে জগৎ অন্ধকার হইবে।

প্রসাদ। কিছু নয় ভাই! মায়ের এই অনন্ত লীলাসাগরে আমার ন্যায় কত উর্ম্মির উত্থান ও পতন হইয়াছে, তাহার কি স্থিরতা আছে। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় আমার মত আবার কত হইবে, কত যাইবে। এই ত তাঁর লীলামাহাত্ম্য।

ভজহরি আর এ সকল হৃদয়ভেদী কথা শুনিতে চাহিল না, তাই নীরব হইল। রামপ্রসাদ একটু অবসাদগ্রস্ত হইয়া আপন আসনেই শয়ন করিলেন। পরদিন পূজার আয়োজন করিতে হইবে বলিয়া সকলেই অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন। প্রসাদ আজ যেন একটু মোহঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া এখনও আসনে পড়িয়া আছেন, উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ত শয্যাত্যাগ করিতে হইবে; সাধ করিয়া আর ঘুমাইলে চলিবে কেন। তাই প্রসাদ সজাগ হইবার জন্য মনকে বলিতেছেন :—

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি, ভেবেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফির না॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তায় মুখ খোলো না,
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচ না॥
খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘুচে না।
আছ দিবা নিশি মাতাল হয়ে ভ্রমে কালী বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদে রে তুই, ঘুমায়ে আশা মিটে না॥
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকলে আর চেতন পাবি না॥

হায়! এ জগতে শাক্তভক্ত প্রসাদের বুঝি এই শেষ ঘুম, এই বুঝি তাঁহার শেষ নিশিযাপন, আর বুঝি তাঁহাকে ঘুমাইতে হইবে না, আর বুঝি তাঁহাকে

সাধের ঘুম হইতে জাগিতে হইবে না ; এইবার বুঝি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, মা-ময়-জীবন প্রসাদ চিরজাগ্রত হইয়া কেবল মায়ের মধুর নামে প্রাণ মাতাইবেন, নিদ্রা জাগরণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই বুঝি বা আজ প্রসাদদেব চিরজাগ্রত হইবেন। ভক্তের ইচ্ছা ভক্তাধীনাই জানেন—আমরা তাহার কি বুঝিব ?

প্রসাদ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলেন, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। প্রসাদের পূজা দেখিতে আজ তাঁহার ভক্তগণ সকলে সমবেত হইয়াছেন। কিন্তু প্রসাদ আজ সকলকেই বলিলেন—"দেখ ! আজ মায়ের আদেশ, সকলে আপন আপন আবাসে লক্ষ জপের আয়োজন করগে। ভক্ত-বৎসলার ইহা অভিপ্রেত।" প্রসাদের বাক্য অবহেলা করিবার সাধ্য কাহারও নাই, সকলেই চলিয়া গেল। প্রসাদ বলিলেন—"কেবল পূজা দেখায় কাজ হয় না, কাজ করিয়া নিজে মূর্ত্তিমতী মাকে দেখিতে চেষ্টা কর—তাহা হইলেই দেখার সাধ মিটিবে।" ভক্তগণ সাধকের আশ্বাস-বাণী হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। প্রসাদের মনের উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারিল না।

আজ অমাবস্যা, তান্ত্রিক সাধকের এ দিনে মাতৃনাম মাতৃগান ভিন্ন অন্য কোন কাজ নাই ; তাই প্রসাদ গাহিতেছেন ;—

আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটি কভু নাহি ভুলি।
আমার দু'আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী।
বিষয়-বুদ্ধি হ'লো হত, আমায় পাগল বোলে বলে সকলি।
আমায় যা বলে তা বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥

রামপ্রসাদ আজ কেবল গান গাহিতেছেন—যে ভাব মনে আসিতেছে, অমনি গানে তাহা প্রকাশ করিতেছেন—

তারা তরী লেগেছে ঘাটে, যদি পারে যাবি মন আয় ছুটে।
তারা নামে পাল খাটিয়ে, ত্বরা তরী চল বেয়ে॥
যদি পারে যাবি, দুঃখ মিটাবি, মনের গেরো দাওরে কেটে।
বাজারে বাজারে কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'লো, কি ক'রবে আর ব'সে হাটে।

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মন বাঁধরে এঁটে সেঁটে,
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া-বেড়ি কেটে।

পাঠক! ভবের মায়ামোহ কাটাইয়া প্রসাদ কেমন ধীরে ধীরে মাতৃ-সন্নিধানে চলিয়াছেন—একবার দেখুন। সংসারের মধ্যে থাকিয়া, এতদিন নির্লিপ্ত ভাবে সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া প্রসাদ এখন কেমন করিয়া সে বন্ধন একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছেন—একবার দেখুন! সংসারের দারুণ বন্ধন শিথিল করিতে হইলে এইরূপে ধীরে ধীরে করিলে আর জড়ীভূত হইবার ভাবনা থাকে না। মায়াকে জয় করিয়া মায়ার বেড়ী না কাটিতে পারিলে, মায়া সহজে ত্যাগ হইবার নয়। মহামায়ার মায়া জয়ে উৎকট সাধনা চাই, নতুবা মুখের কথায় কাজ হয় না।

এইরূপভাবে সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। রাত্রি সমাগতা, ভূত-চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার, সাধকের সাধনক্ষেত্র দীপদানে আলোকিত হইলে মহানিশায় রামপ্রসাদ পূজায় বসিলেন। অপর সকলেই আজ প্রসাদের প্রাতঃকালের আদেশ অনুসারে জপ করিতেছে; স্ব স্ব গৃহে সকল ভক্তই নামে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। রামপ্রসাদ কয়েকবার মাত্র মায়ের বদনের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সেই যে নির্ব্বাক, নিঃস্পন্দ হইয়াছেন, আর চৈতন্য হইতেছে না। প্রায় দুইঘণ্টা পরে শুনিতে পাওয়া গেল, প্রসাদ গান গাহিলেন—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি,
আমি কি যমের ভয় রেখেছি।
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি,
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যেজন, তার ঘরেতে ঘর ক'রেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসারা তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা ক'র বসে আছি॥

আবার সমাধিস্থ হইলেন। আর কোন সঙ্গীত শুনা গেল না, ক্রমশঃ প্রদীপ সকল নির্ব্বাণ হইয়া গেল; রজনীও শেষ যামে আসিয়া উপস্থিত, শিবাকুল লোলরসনা বহির্গত করিয়া সাধন-পিঠের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল; হিংস্র পশুগণ আজ হিংসা ভুলিয়া যেন মানুষের কাছে কাছে বেড়াইতেছে; কাহাকেও কিছু বলিতেছে না। যখন উষার আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ হইল, তখন প্রত্যেক শিবা প্রসাদের গাত্র লেহন করিয়া যে যার স্থানে চলিয়া গেল। প্রসাদ

চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"মা! আজ কোলে উঠিয়া প্রাণ জুড়াইল, মন আশান্বিত হইল। মা! সময় হয়েছে, আমি যাচ্ছি; আর ত কোল ছাড়্‌বো না, আর ত অসার মায়ায় ভুল্‌বো না। যাই মা! যাই, ডাক শুন্‌তে পেয়েছি, যাই।" প্রসাদ যখন মায়ের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন ভোর হইয়াছে, পূর্ব্বাকাশ তরুণ অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তিরোধান

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হইয়া আছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিবার পর হইতেই তিনি মনে করিয়াছেন, কলির প্রকোপ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত, আর এখানে থাকা উচিত নয়। সেইদিন হইতে প্রস্তুত হইয়া আজ দীপান্বিতা চতুর্দ্দশী তিথিতে তিনি মাতৃপূজা করিয়া ইহধাম হইতে তিরোধানের ব্যবস্থা করিলেন। প্রসাদের মৃত্যু-বিষয় এক ভজহরি ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারে নাই।

মাতৃপূজার পর অমানিশার অবসান হইল। ভক্তপ্রবর প্রসাদ "জয় কালী! জয় কালী!" রবে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া সমাধির অবস্থা হইতে বাহজ্ঞান লাভ করিলেন। ছোট ছোট পুত্রকন্যাগণ প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া সিদ্ধাসনের মণ্ডপ হইতে গৃহে আসিল। তথায় রহিলেন কেবল সর্ব্বাণী, রামদুলাল ও ভজহরি। তাঁহারা প্রতিমা বিসর্জ্জনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সাধক-প্রবর প্রসাদের চিত্ত আজ সুপ্রসন্ন, সকল কথাতেই যেন সুধা ক্ষরণ হইতেছে। আজিকার দিনে রামপ্রসাদের শ্রীমুখের মধুর বচনাবলী যিনি শুনিয়াছেন—তিনিই ধন্ত হইয়াছেন। অমৃতপানে যে পরিমাণে মনের পরিতৃপ্তি লাভ হয়, প্রসাদদেবের আজিকার এ বচনসুধা তাহা অপেক্ষাও চিত্ত বিনোদনে, তাহা অপেক্ষাও হৃদয়ের পরিতৃপ্তি প্রদানে সমর্থ।

প্রসাদ যেন আজ দেবভাবাপন্ন। যেন স্বর্গের দেবমূর্ত্তি নরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আজ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ। প্রসাদদেবের অন্তকার এ রূপের বর্ণনা করা অসাধ্য। সে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিলে বাস্তবিক মনপ্রাণ মোহিত হইয়া যায়, সততই তাঁহার চরণতলে পড়িয়া জীবন ধন্ত করিতে ইচ্ছা হয়। প্রসাদ

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পুনরায় আসনোপবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বাণী স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করত নিকটে আসিয়া করযোড়ে উপবেশন করিলে, রামপ্রসাদ যুক্তকরে স্তব পাঠ আরম্ভ করিলেন :—

ব্রহ্মময়ী সনাতনী সাকার-রূপিণী।
নৃত্যকালী নিরাকারা নীরদবরণী॥
মহেশ্বরী মহামায়া মহেশমোহিনী।
যোগেশ্বরী যোগমায়া জগতজননী॥
বিমলা বিরাজেশ্বরী বিপদনাশিনী।
কাতরে কর মা ত্রাণ ত্রিলোকতারিণী॥
বরদা বগলা বামা বর-প্রদায়িনী।
অন্নপূর্ণা শুভঙ্করী ত্রিগুণধারিণী॥
চণ্ডিকা চামুণ্ডা শ্যামা দানবঘাতিনী।
দশভূজা দাক্ষায়ণী নগেন্দ্রনন্দিনী॥
সুখদা সারদা সতী কৈবল্যদায়িনী।
পার্ব্বতী পরমেশানী পতিতপাবনী॥
করালবদনা কালী কৈলাসবাসিনী।
পশুপতি-হৃদে পদ পঙ্কজনয়নী॥
ভৈরবী ভবানী ভীমা ভীষণভাষিণী।
অসিকরা দিগম্বরা মৃগাঙ্কভালিনী॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া মহিষমর্দ্দিনী।
পাপ-তাপহরা তারা কৃতান্তবারিণী॥
বৈষ্ণবী বেদাদি বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডপালিনী।
অগতির গতি দুর্গা গণেশজননী॥
সুরেশ্বরী সুরধুনী সুরেশবন্দিনী।
দুস্তরে নিস্তার তারা ভবনিস্তারিণী॥
দয়াময়ী দক্ষসুতা দুরিতনাশিনী।
মম মন-বাঞ্ছা পূর্ণ কর গো জননী॥
নাহি জানি ধ্যান-জ্ঞান, ভজন-পূজন।
নিজগুণে কৃপা করি দেহি শ্রীচরণ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে ওমা কাত্যায়নী।
অন্তকালে নিও কোলে অনন্তরূপিণী॥

সর্ব্বাণী প্রতি বৎসর পূজার সময় যেরূপ স্তবপাঠ করিতেন, আরাধ্যদেবতা পতির পদতলে বসিয়া মহামায়ার স্তবপাঠে তাঁহার যেরূপ প্রীতি সম্পাদন করিতেন, আজও যুক্তকরে তারস্বরে সেইরূপ করিতে লাগিলেন :—

পতিপদে মতি, রাখিয়া সম্প্রতি,
সর্ব্বাণী ডাকে তোমারে।
বরদা অভয়া, কর মোরে দয়া,
দেহি পদছায়া মোরে ॥
মঙ্গলকারিণী, বিপদবারিণী,
শিখরবাসিনী শিবে।
ত্রৈলোক্যতারিণী, ত্রিগুণধারিণী,
ত্রাণ কর ত্বরা ভবে ॥
উমা ত্রিনয়নী, গজাস্যজননী,
গতি নাহি তোমা বিনে।
জগতজননী, অচিন্ত্যরূপিণী,
কি চিন্তা করিবে দীনে ॥
যে চরণাম্বুজে, অম্বুজেতে পূজে,
কৃত ভুজভুজদ্বয়।
সে পদ কি নরে, সেবিবারে পারে,
ও পায় শিব-উপায় ॥
আদ্যা সনাতনী, বিবুধবন্দিনী,
ত্রিতাপনাশিনী তারা।
ভূধরনন্দিনী, ভূতেশভাবিনী,
আপদ-বিপদ-হরা ॥
পাদপদ্মোপরে, পদ্মে শোভা করে,
রক্তজবা কোকনদে।
নখে শশধর, উড়িছে চকোর,
পতঙ্গাদি ষট্‌পদে ॥
ঘন ঘন কেশী, করে হেম অসি,
অট্ট অট্ট হাসি মুখে।
কর্ণে স্বর্ণশর, অতি মনোহর,
সুরাসুর সাধে সুখে ॥

আমি জ্ঞানহীনা, সাধন-বিহীনা,
স্বীয় গুণে দয়া কর।
প'ড়ে ভবঘোরে, ডাকি মা তোমারে,
তনয়ে ত্বরায় তার॥
অজ্ঞানান্ধকারে, সংসার-সাগরে,
পতিত পতিত-নারী।
পশুপতি বাণী, পতিত পাবনী,
দে মা পদতরী তরি॥
রেখো গো মা সতি, স্বামিপদে মতি,
চাহি না অন্য সম্বল।
তিনি সারাৎসার, দেবতা আমার,
ভবের সম্বল-বল॥
সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়, যেন পতি পায়,
এ নারী জীবন ক্ষয়—
পারি করিবারে, এই ভিক্ষা মোরে,
দে মা হইয়ে সদয়॥

উভয়ের স্তব পাঠ শেষ হইল। সাধক নিজ হৃদয়-কমল হইতে যে ভুবন-মোহিনী মাতৃমূর্ত্তি প্রকট করিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি সহকারে বাহিরে পূজা করিয়াছিলেন, যে ভবারাধ্য পদ রক্ত-কোকনদে সাজাইয়া মনের আবেগে পূজা করত প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইয়াছিলেন, পূজা অন্তে আবার সেই মূর্ত্তি হৃদয়-সমুদ্রের অগাধ নীরে ডুবাইয়া মানসপদ্মে পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন। ইহাই হইল প্রতিমা-বিসর্জ্জন। নতুবা মাতৃময়-প্রাণ সাধক কখনও কি প্রাণ থাকিতে সেই প্রতিমা জলে ভাসাইতে পারে? আর জগতে এমন জলাশয় কোথায় যে তাহাতে বিরাট প্রকৃতি, বিশ্বমাতা, বিশ্বেশ্বরীর বিসর্জ্জন হইতে পারে? সাধকের ভক্তি-প্লাবন প্লাবিত হৃদয়জলাশয় ভিন্ন জগতে তেমন জলাশয় আর নাই।

এইবার প্রসাদ হাসিমুখে উঠিলেন—ঘট মস্তকে করিলেন; ভজহরিকে প্রতিমা মস্তকে করিতে বলিলেন এবং সর্ব্বাণীকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সতি! প্রাণের দেবি! আজ আমাদের শেষ দিন; এস, আজ হাসিতে হাসিতে আমরা জগতের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি।" সর্ব্বাণী প্রথমতঃ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু স্বামীর কথা ত অবেহলা করিবার নহে; তিনি কলের পুতুলের ন্যায়

তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

প্রসাদের সিদ্ধাসনের পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তা গঙ্গাতীরাভিমুখে গিয়াছে—সেই রাস্তা ধরিয়া সকলে চলিয়াছেন, রামদুলাল অবস্থা বুঝিয়া ছলছলনেত্রে পিতা-মাতার অনুগমন করিতেছেন, তাহার হৃদয়ের ভাব যে এখন কিরূপ হইয়াছে তাহার বর্ণনা করা ভাষার অসাধ্য! প্রসাদ ভাবোন্মত্ত হইয়া যাইতেছেন, আর গাহিতেছেন :—

মা আমার খেলান হ'লো।
খেলা হ'লো গো আনন্দময়ী॥
ভবে এলাম কর্ত্তে খেলা করিলাম ধূলা খেলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,
কাল যে নিকটে এলো,
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেলো।
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্ত কি করি বলো,
ওমা শক্তিরূপা, ভক্তি দিয়া মুক্তিজলে টেনে ফেলো।

আজ হালিসহর অন্ধকার করিয়া প্রসাদদেব চিরজীবনের জন্য চলিয়াছেন; প্রাণে ভয়ের লেশমাত্র নাই; কালকামিনী কালীর কৃতীপুত্র শ্রীরামপ্রসাদ কালকে যেন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন :—

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্‌গে যা তোর যমরাজারে, আমার মত নেছে কটা।
আমি যমের যম হতে পারি, ভাব্‌লে ব্রহ্মময়ীর ছটা।
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সাম্‌লে বলিস্‌ বেটা।
কালীনামের জোরে, বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখ্‌বে কেটা॥

কি তীব্র তেজোদৃপ্ত বচন-বাণ, সাধনশক্তির কি অসীম শক্তি, শক্তি সাধনায় শক্তিলাভ করিলে সাধক যে ত্রিভুবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তা প্রসাদের উপরোক্ত সঙ্গীতেই প্রমাণ হইতেছে। হৃদয়ে তিলমাত্র দুঃখ নাই, মৃত্যুর জন্য যে একটা অবসাদ, একটা মহাচিন্তা, প্রসাদের হৃদয়ের ত্রিসীমানায় তাহা আসিতে পারে নাই। বরং আজীবনের যত সুখ, যত স্বাচ্ছন্দ্য, যত তৃপ্তি, যত স্ফূর্ত্তি আজ প্রসাদকে প্রসাদন করিবার জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত, আনন্দময় প্রসাদ আনন্দভরে গাহিতেছেন,—

ভবে আর জন্ম হবে না,
হবে না জননী জঠরে।
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদশাস্ত্রে নাইকো সীমা,
তারার মহিমা আমি আপনি মাত্র, জেনেছেন শিব-শঙ্করে।
আমার মায়ের নাম ক'রে, কত পাপী গেলো ত'রে।
কৈলাস গিরি দিব্য পুরী, দেখাও একবার মা আমারে॥

কোন প্রবাসী লোক বহুদিনের পর প্রবাস ছাড়িয়া গৃহাভিমুখী হইলে যেরূপ আনন্দ বোধ করে, যেরূপ ত্বরিত পদে বাড়ীর পানে ছুটিয়া যায় এবং আনন্দভরে গাহিতে থাকে,—

"হরি বল হরি, চল যাই বাড়ী, বেলা গেল সন্ধ্যে হ'লো।
ফুরালো খেলা ভাঙলো মেলা, আর কেন বিলম্ব বলো।
বিদেশে প্রবাসে, ভব-পান্থ-বাসে,
কিছু আর লাগে না ভালো।
বাড়ী পানে মন ছুটেছে এখন, মা মা বলে ঘরে চলো।
মায়ের আনন, করি দরশন, তাপিত প্রাণ হবে শীতল।
আছেন জননী দিবস রজনী আশা-পথ চেয়ে কেবল।
মায়ের প্রাণ টানে সন্তানের পানে, হেরিলে নয়নে ঝরে জল।
আহা মা আমার, প্রেমেরই আধার,
আপন প্রেমে আপনি বিহ্বল॥"

প্রসাদের ভাব এখন ঠিক এইরূপ। বাড়ী যাইবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, একটা মহা উত্তেজনা, যেন হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া তাঁহার প্রাণকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে—মায়ের কোলে উঠিয়া তাঁহার বাৎসল্যচুম্বন লাভ করিতে তিনি যেন সদাই সমুৎসুক হইয়া আছেন—আর গাহিতেছেন,—

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে।
(কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা)।
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণিপুরে॥
শিবশক্তি সব্যে * বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে।

* সব্যে—দক্ষিণে।

ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
ঐ ধ্যানে ক'রে ধন্ত নরে ॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহত বিশুদ্ধাখ্যবরে।
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, র, ল, ড, ক, ফ, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে ॥
হ ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে।
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বসে পদ্মের উপরে ॥
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে।
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে * মত্ত মধুব্রত স্বরে ॥
ধরা জল বহ্নি বাত, লয় হয় অচিরাৎ,
যং বং রং লং হং হোং স্বরে।
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধাক্ষরে ॥
তুমি নাদ, তমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে।
উপাসনা ভেদে ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কালে পদ ভরে ॥
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কয় তারে।
মুক্তি কন্তা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে ॥
আজ্ঞা-চক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
দাসীরূপে মিল হংসবরে।
চারি ছয় দশবার, ষোড়শ দ্বিদল আর,

* গুঞ্জে—গুঞ্জরণ করে।

দশ-শত-দল শিরোপরে ॥
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ-সাগরে। *

পাঠক! সাধকের যোগের বিষয় অবগত হইলেন কি? আত্মা-পরমাত্মার যোগাযোগ সংঘটন করাই যোগ-সাধনের উদ্দেশ্য, যাহাতে জীব শিবরূপে পরিগণিত হইতে পারে, মুক্তি-পথের পথিক হইয়া জীব মানব জন্ম ধন্য করিতে পারে—তাই যোগ-সাধনা। প্রসাদের যোগ-সাধনে কিরূপ যোগাযোগ সংঘটিত হইয়াছে, পাঠক, এবার বুঝিতে পারিলেন কি? এইরূপ ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া কলিতে আর কয়জন পথিক সাধনার শীর্ষ স্থানে সমাসীন হইয়াছেন? ধন্য মায়ের বরপুত্র শ্রীরামপ্রসাদ! তোমার পদার্পণে ধরিত্রী পবিত্র হইয়াছে; তোমার ন্যায় সাধকের পদরজ সকলেরই প্রার্থনীয়।

প্রসাদদেব ক্রমশঃ মা ভাগীরথীর তট-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, যুক্তকরে মুক্তিদায়িনী মাকে প্রণাম করিয়া আকণ্ঠ জলে দেহ নিমজ্জিত করিলেন। বাম-ভাগে সতী সর্ব্বাণী, শিবের সতীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, তিনিও আকণ্ঠ-জলে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহার সুখপ্রসন্ন বদনে হাসির সুষমা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। স্বামীর আনন্দ, স্ত্রীর আনন্দ, আনন্দময়ীকে পাবার আনন্দে আজ গঙ্গার ঘাটে আনন্দের তুফান বহিতেছে। কলিতে যাহা কখনও হয় নাই, যাহা হইবে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না, আজ হালিসহরের ঘাটে তাহাই হইতেছে। ধন্য হালিসহর গ্রাম, আজ এই আদর্শ ভক্তকে গর্ভে ধারণ করিয়া তুমিও আনন্দ-ময়রূপে বিরাজ কর।

ভক্ত প্রসাদ মৃত্যুর প্রাক্কালে ক্রমান্বয়ে চারিটী সঙ্গীত উপর্য্যুপরি গান করিলেন;—

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন বদন ভরে মাকে ডাকি রে,
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী আসেন কিনা আসেন দেখি রে।
ল'য়ে যাবি সঙ্গে ক'রে, তার একটা ভাবনা কিরে,
তবে তারা নামের কবচ মালা বৃথা আমি গলায় রাখি রে।
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।

---

* রাগিণী বিভাস, তাল—একতালা।

যাঁর ত্রিলোচন না পেলে অন্ত, আমি অন্ত পাব কি রে॥ *

তারপর আবার গাহিলেন ,—

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকেই মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য ক'রে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হলে আপনাপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

তিনি যে ব্রহ্মময়ীর পাদপদ্মে মিশিতে পারিবেন, এই সঙ্গীতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

তারপর গাহিলেন :—

ম'রলাম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে,
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো লুটে।
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহালেঠে,
তারা কারু কথা কেউ শুনে না, দিনত আমার গেল কেটে।
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমনি মত ধ'র্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরি দেনা কেটে,
প্রাণ যাবার বেলা এই ক'রো মা ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে।

ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া মৃত্যু হইলে তাহার আর জন্ম হয় না,—ইহাই শ্রেষ্ঠ মৃত্যু, ভাবে মৃত্যু। সাধারণ মৃত্যু সময়ে দেহের নবদ্বারের মধ্যে যে কোনও একটা দ্বার খোলা থাকে, প্রাণবায়ু তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায় কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্র মৃত্যু হইলে সকল দ্বারই রুদ্ধ থাকে, জীব-আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মার সহিত লয়-প্রাপ্ত হয়, এইরূপ মৃত্যুতে আর জন্ম হয় না, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণ। এইবার

* ললিত খাম্বাজ—একতালা।

প্রসাদ ঘটটী গাঙ্গিনী সলিলে নিক্ষেপ করিয়া একবার সর্ব্বাণীর প্রতি কটাক্ষ করিলেন, তারপর তারা বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রেমাশ্রু জলে বুক ভাসাইয়া গাহিলেন।—

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেম্নি সুখ কি পাছে।
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি,
মাগো ওমা, ফাঁকির উপর ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা, দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড,
মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে।

ভক্তবীর প্রসাদের মৃত্যুকালীন এই চারটী সঙ্গীতে বেশ প্রকাশ হইতেছে—যেন তাঁহার কিছু নাই, তাঁহার পরের সম্বল সাধন-ভজন কিছু নাই, অতি দীন, অতি হীন, তৃণ হইতেও লঘুভাবে মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়া, ভবব্যথাহারিণী জননীর হৃদয়ে বিষম যন্ত্রণা প্রদান করিয়া ভক্ত তাঁহার শান্তিময় কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উভয়ে একবার উর্দ্ধে হস্তোত্তলন করিলেন। বিদ্যুৎ বিকাশের মত একটা ভয়ানক লোহিত জ্যোতির বিকাশ হইল, তারপর নড়ন-চড়ন রহিত হইয়া গেল। উভয়ের সেই হাসিমাখা মুখ, সেই জ্যোতির্ম্ময় দেহ, একটুও মলিন হইল না, একটুও বিকৃত হইল না, ঠিক যেন জীবিত দেহ কিন্তু প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, প্রসাদ ও সর্ব্বাণী আর নাই, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। *

পিতামাতা আর কোন কথা কহিতেছেন না—নড়িতেছেন না চড়িতেছেন না দেখিয়া রামদুলাল নিকটে গেলেন, গাত্রাদি স্পর্শ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সব শেষ হইয়াছে শুনিয়া ভজহরি ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া "মাগো, ভাইরে," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রতিবাসী সকলে আচম্বিতে সাধক চূড়ামণি প্রসাদের সেরূপ সজ্ঞানে অন্তর্ধান দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাত্মার অদর্শনে সকলেই দারুণ শোকশেল হৃদয় পাতিয়া লইলেন। যে শুনিল—সেই হায় হায় করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—যাহা গেল, কলিতে ঠিক তেমনটী আর পাওয়া যাইবে না।

---

* অনেকে বলেন—সর্ব্বাণী প্রসাদের বহুপূর্ব্বে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহার সস্ত্রীক মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ কথা

রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর অনেকে হয়ত এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন যে রামপ্রসাদের ন্যায় সিদ্ধাসাধকের মৃত্যু সময়ে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সাংসারিক এত কথা মনে পড়িল কেন? তিনি ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তবে নশ্বর জগতের এভাব তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে আমরা বলি—মৃত্যুকালে জীবের আজীবনের সমস্ত ভাবনা মনোমধ্যে উদয় হয়, পাপী হইলে কৃত পাপের যাবতীয় অনুশোচনা আসিয়া তখন তাহার হৃদয় দগ্ধ করে, "হায়! আমি কি করিয়াছি; যাহাদের জন্য এ সকল পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আমার এ বিপদ সময় কই তাহারা ত কোন সাহায্য করিতেছে না, হায়! কেন এমন প্রলোভনে মজিয়া পরকাল নষ্ট করিয়াছিলাম" প্রভৃতি নানাবিধ অনুতাপ তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে, আর পুণ্যাত্মার হৃদয় তাঁহার জীবনের সমস্ত পুণ্য-কাহিনী মনোমধ্যে উদিত হইয়া হৃদয় আনন্দময় করিয়া তুলে, তখন তিনি মনে করেন—"আহা, যদি আরও পুণ্যার্জ্জন করিতে পরিতাম, তাহা হইলে এ সময় আরও কত আনন্দ হইত!"

রামপ্রসাদের জীবনে পাপ ছিল না, কারণ দ্বাদশবর্ষ বয়স হইতেই তাঁহার প্রাণে সাধন-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল—বিবেক অস্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কৃত হৃদয়-ক্ষেত্রে তাই পাপরূপ আগাছা সকল জন্মাইতে পারে নাই, মৃত্যু সময় তাই তিনি পরমানন্দে আপনার পূর্ব্বাবস্থার সকল বিষয় স্মরণ করত উৎসাহিত হইয়া প্রথমগানেই বলিয়াছেন:—"শমন! আমি তারা নামের কবচমালা ধারণ করিয়া আছি; তুই ভৃত্যের ন্যায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবি, তার জন্য আর ভাবনা কি? আমি মায়ের খাস তালুকের প্রজা, আমি কখন বাকীর দায়ে ঠেকি নাই,—অর্থাৎ আমি জীবনে যাবতীয় 'পুণ্য কার্য্য ক'রেছি, কিছু বাকী-বকেয়া রাখি নাই।" আবার দ্বিতীয় গানে তিনি বলিতেছেন—"আচ্ছা ভাই! মরিলে কি হয় বল দেখি, কেহ বলে ভূত-প্রেত হবি, কেহ বলে স্বর্গে যাবি, কেহ বলে মায়ের সালোক্য-সাযুজ্য লাভ করিবি। কিন্তু বেদান্ত ত তাহা বলেন না—তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন—তোর ঘটের (দেহের) নাশ হইলেই মৃত্যু হইল। তখন শূন্যে শূন্যে মিশিয়া যাইবে। যে পঞ্চভূত লইয়া দেহ গঠিত হইয়াছিল, তাহা আবার পৃথক হইয়া যাইবে।" প্রসাদের কিন্তু তখন ব্রহ্মভাবের

উদয় হওয়ায় তিনি বলিলেন—"তা কেন, আমি যা ছিলাম তাই হব। ছিলাম মায়ের ছেলে ; মৃত্যু হ'লে মায়ে-পোয়ে মিশিয়ে এক হব।" প্রসাদ এত ধার্ম্মিক হইয়াও, পরকাল-পথের জন্য এত সাধন-সম্বল রাখিয়াও তাঁহার যেন সে সঞ্চয়ে মনঃপূত হইতেছে না, তাই তৃতীয় গানে বলিয়াছেন—আমি কেবল ভূতের বেগার খেটেই মরিয়াছি, সরকারী মুটের মত কেবল পরের জন্য খেটেছি, আমার নিজের জন্য কই কি রাখিয়াছি! এখন দেখিতেছি—দুরন্ত ছয়টা রিপুই সমস্ত লুটে পুটে খেয়েছে। তাহারাই যত নষ্টের গোড়া, কারণ আমি অন্ধজনের মত যত মাকে এঁটে সেঁটে ধর্ত্তে যাই তাহাদের কৃতকর্ম্মদোষে বুঝি পারি না।" মাকে এত অন্তরঙ্গ করিয়াও, ভক্তিডোরে এমন দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াও প্রসাদের তৃপ্তি হয় নাই, কারণ এ তৃষ্ণার শান্তি মুক্তি ভিন্ন হয় না, এইজন্য প্রসাদ বলিলেন—মা ব্রহ্মময়ি! আমার কর্ম্মডুরি কেটে দাও, পাপপুণ্যের কর্ম্মফল আমার ঘুচিয়ে দাও" এইবার বহুদিনের বিস্মৃত শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ বাণী মনে পড়িলে বলিলেন —আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যেন মৃত্যু হয়" অর্থাৎ আমি যেন তোমাতে লীন হই। এইরূপ দেহত্যাগে মোক্ষ লাভ অনিবার্য্য। কিন্তু প্রসাদ পূর্ব্বে অনেক গানে বলেছেন—একেবারে জলে জল মিশে যাওয়া ভাল নয় ; তাই আবার বল্‌ছেন "মা! তোমার আরও কিছু মনে আছে? এবার যেমন রাখলে পরেও তেমন রাখ্‌বে কি? ভোলানাথের সব কথায় যদি বিশ্বাস হতো তাহা হইলে আর তোমাকে এত সাধাসাধি কর্ত্তুম্‌ না, তিনিও যে ভোলা মহেশ্বর—তিনিও যে তোমার ভাবে বিভোর! আমার বড় আশা ছিল যে আবার আসবো, আবার তোমার সাধ্যসাধনা কর্ব্বো, এই আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠিয়াছিলাম—অর্থাৎ আনন্দের চরম উপলব্ধি করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ত তা হতে দিলে না।" মায়ের এমন ইচ্ছা নয় যে, এই ঘোর কলিতে প্রসাদ হেন ভক্ত আবার লীলায় মত্ত হয়, সংসারে আসিয়া আবার খেলা ধূলায় কাল কাটায়, তাই তদীয় গুরুর আশীর্ব্বাদ-রূপ মৃত্যু সংঘটন করিলেন। ইহার ফলে এখন আর আসা হইবে না, মা যখন ইচ্ছা করিবেন—তখন আবার পাঠাইয়া দিবেন, তজ্জন্য পুনরায় বলিলেন—"তবে আর কেন, মায়ের কথায় দৃঢ় হও, আমার শেষ হইয়া আসিয়াছে"—এই বলিয়া তিনি শক্তিসহ অর্থাৎ সর্ব্বাণীর সহিত ভবানীর ভাবসাগরে ডুবিয়া পড়িলেন। গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

অর্থাৎ মৃত্যু সময়ে যে যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া কলেবর

পরিত্যাগ করে, সে সেই ভাবানুসারেই পরজন্মে গতি প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্‌বাক্যে যাহার বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাস দৃঢ় করিলেই মৃত্যু সময়ে ইষ্টচিন্তায় তার স্থিতি লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ সাধক রামপ্রসাদ জীবদ্দশাতে তাঁহার অধিকাংশ গানের মধ্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের কথা ভাবিয়া আকুল হইতেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—কে কত বড, কার মনোভাব কিরূপ, তা মৃত্যু সময়ের অবস্থা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। মৃত্যু সময়ের ভাব লইয়াই যে জীবের পুনর্জন্ম হয় বা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয়—তাহাও ঠিক। শাস্ত্রে আছে—ভরত নামে একজন রাজা ছিলেন—তিনি একটি হরিণ পুষিয়া তাহার মায়ায় অভিভূত হইয়া দেহত্যাগ করায়, পরজন্মে তাঁহাকে হরিণ জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু জাতিস্মর রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন —"ভগবন্! এবার যদি কখন মনুষ্য দেহ ধারণ করি—তাহা হইলে আর কাহারও মায়ায় অভিভূত হইব না বা কাহারও সহিত কথা কহিব না। জীবনান্তে তিনিই জড়ভরত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব রামপ্রসাদ আজীবন যে ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন, আজ অবধি সেই ভক্তিভাব সমভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাকে মাতৃক্রোড়ে চিরবিশ্রাম প্রদান করিল।

রামপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া হালিসহরের ঘাট লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল, তাঁহার তিরোধানে মর্ত্ত্যের যে একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন অপসারিত হইল, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল। হায়! যাহা গেল, যে রত্ন আজ লোক লোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হইল, আমাদের পাপচক্ষু বোধ হয় আর কখনও এ রত্ন চক্ষুগোচর করিতে পারিবে না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল—রামদুলাল একেবারে পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগরূপ উভয়বিধ মহাশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। অবস্থা দেখিয়া ভজহরি কথঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইয়া স্বর্গগত প্রাণের বন্ধুর পুত্রকন্যাগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল। আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়—এইবার মৃত দেহের সৎকারের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গিয়াছে; মা তাঁহাদিগকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহার জন্য আবার শোক কি? এত আর সাধারণ মানবের মৃত্যু নয়; এ যে নবজীবন লাভ! ভজহরিকে যখন তিনি আশা দিয়া গিয়াছেন—তুমি ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইবে—তখন আর ভাবনা কি, বৃথাশোক কেন? ভজহরি আশ্বস্ত হইয়া রামদুলাল, রামমোহন এবং কন্যাদ্বয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ মৃতদেহ যতক্ষণ চক্ষের সম্মুখে থাকিবে—ততক্ষণ

শোকসংবরণ করা অতীব কঠিন; ভজহরি পবিত্রচিত্ত কয়েকজন সাধু ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কারণ এ পবিত্র দেহ ত যাহার দ্বারা সৎকৃত হইতে পারে না।

এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে চারিজন ভৈরবী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মজ্যোতিঃপূর্ণ রূপ-প্রভা ও দৈহিক গঠন-পারিপাট্য দেখিলে বাস্তবিক স্বর্গের দেবী বলিয়াই অনুমান হয়। তাঁহারা প্রসাদের পুত্রকন্যাগণকে নানা প্রকার সান্ত্বনা ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন এবং তান্ত্রিক বিধানানুসারে মাতৃগুণ গান করিতে করিতে এক চিতায় স্বামী-স্ত্রীর পরম পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করিয়া অকস্মাৎ আবার অদৃশ্য হইয়া পরিলেন। প্রসাদ ও প্রসাদ-পত্নীর ন্যায় ভক্তচূড়ামণির দেহ অপর কাহারও দ্বারা সৎকৃত হওয়া বোধ হয় মহামায়ার অভিপ্রেত নহে, তাই বুঝি নিজ পরিচারিকাগণ দ্বারা তাঁহাদের সৎকার সাধন করাইলেন। সকলে এই অদ্ভুতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ভগবতী কালিকার এবং তদীয় ভক্তদ্বয়ের জয় নিনাদে ভাগীরথীকূল আলোড়িত করিল। মৃত্যু সময়ে রামপ্রসাদের বয়স কত হইয়াছিল—তাহার সঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারে না। তাঁহার গানে "লাখ উকীল করেছি খাড়া" অর্থাৎ আমার ধর্ম্মজীবনের সাক্ষ্য দিবার জন্য কিম্বা হুজুরের নিকট তাহার আর্য্যি পেশ করিবার জন্য সঙ্গীতরূপ লক্ষ উকীল খাড়া ক'রেছি।" এই কথার তাৎপর্য্যে প্রত্যহ পাঁচটী করিয়া সঙ্গীত রচনার হিসাবে কেহ কেহ তাহার বয়স ৫৪ বৎসর ৯ মাস ২০ দিন ধরেন, কেহ বা অশীতি বৎসরেরও অধিক বলিয়া থাকেন; আমরা তাঁহার পৌত্রের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি শতাধিক বর্ষ জীবিত ছিলেন এবং ইহাই সম্ভব, কারণ কলির জীবের পরমায়ু হ্রাস হয় বলিয়া আমরা উক্ত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি না, কিন্তু এখনও অনেক পুণ্যাত্মাকে একশতেরও অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। যখন কোন কোন সাধারণ লোক এরূপ দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিতে পারে, তখন কলির শ্রেষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদ, যিনি জীবনের ঊষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত মাতৃনামে, মাতৃপ্রেমে কাল কাটাইয়াছেন, তিনি যে কলির পূর্ণ পরমায়ু লাভ করিবেন—তাহার আর বিচিত্রতা কি? অতএব তাহার আত্মীয়ের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমরা তাঁহার বয়স ১১২ বৎসর স্থির করিলাম।

এইবার আমরা তাঁহার শেষ জীবনের যোগ-সাধনার কয়েকটি বিষয় বিবৃত করিয়া পুস্তকের পরিসমাপ্তি করিব। কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করিতে না পারিলে, সাধনায় শক্তিমন্ত হওয়া যায় না। কালের শক্তি কালী, এই

আদ্যাশক্তি কালীর সাধনা করিতে হইলে, তাঁহাকে পাইয়া মানবজন্ম সফল করিতে হইলে, নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনীশক্তির চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়। তুমি যে কোন সম্প্রদায়ের সাধকই হও, অগ্রে তোমাকে শক্তিসাধনা করিতে হইবে। কেহ বা প্রত্যক্ষ ভাবে, কেহ বা পরোক্ষভাবে এই সাধনায় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। যোগিগণ বলেন—মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ এবং মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূন্য নাড়ী আছে। এই সুষুম্না মূলাধার অর্থাৎ গুহ্যদেশ হইতে মস্তিষ্ক অবধি বিস্তৃত। কুণ্ডলীকৃত হইয়া মূলাধারে সুষুম্না নিম্নে অবস্থিতা, প্রাণায়াম * যোগ সাহায্যে যখন ঐ কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত হইয়া ধীরে ধীরে প্রতিপদ্মের উপর শিবশক্তি বিরাজিত স্থানে মিলিত স্থানে মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিতে থাকেন, তখন সাধক নানাবিধ সাধন-বিভূতি সম্পন্ন হইয়া প্রাণে অপার আনন্দলাভ করেন। পরে যখন কুণ্ডলিনী মস্তকে উপনীত হয়, তখনই সাধক যোগ-সিদ্ধ জীবন্মুক্ত হইয়া যান। যোগিগণ প্রাণায়াম সাধন দ্বারা ইহা করিতে পারেন, আর তান্ত্রিকগণ পঞ্চমকার সাধন দ্বারা ইহার জাগরণ সহজসাধ্য করিয়াছেন। রামপ্রসাদ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সজাগ কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা ষট্‌চক্রভেদ (১) করিয়া গাহিয়াছিলেন —"তারা আছে গো অন্তরে কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা" হইয়া সাধারণ লোকের দুর্ব্বোধ্য। তিনি সর্ব্বদা ষট্‌চক্রভেদ বর্ণনার ছলে গান গাহিতেন—

আমার মনের বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধে সহস্রারে হ, ল, ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী।
মূলে পৃথ্বী ব, স অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী।
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তে ষড়দলোপরবাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী।
ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নিবীজধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দ্বিদলে, শিব ভৈরবী লাকিনী।
অনাহতে ষট্‌কোণে, দ্বিষড়দলবাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদল পদ্মিনী।

---

* প্রাণায়াম যোগের বিষয় আমরা পূর্ব্বে কতক কতক আভাস দিয়াছি, ইহার অধিক কিছু জানিতে হইলে গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

(১) দেহস্থিত ষট পদ্ম তাহাতে শিবশক্তি অবস্থিত।

নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করী সাকিনী।
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্রযোনি।
চন্দ্র বীজে সুধাক্ষরে হ, ক্ষ বর্ণে হাকিনী।

ইহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া সাধ্যানুসারে আমরা তাহা বিশদ করিয়া দিলাম :—

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুষুম্না নাড়ী মূলাধার অর্থাৎ গুহ্যদেশ হইতে মস্তিষ্ক অবধি বিস্তৃত। আমাদের দেহে সাতটী পদ্ম আছে, গুহ্যের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলের দুই অঙ্গুলি নিম্নে চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত হইয়া (১) "মূলাধার" নামে পীতবর্ণ চতুর্দ্দল পদ্ম, ইহাতে লিঙ্গাকৃতি শিব ও কুণ্ডলিনী শক্তির বাস। (২) "স্বাধিষ্ঠান" নামক শ্বেতবর্ণ ষড়দল পদ্ম লিঙ্গমূলে অবস্থিত, তাহাতে বরুণদেব ও বারুণীশক্তি অবস্থিতা। (৩) নাভিমূলে "মণিপুর" নামে রক্তবর্ণ দশদল পদ্ম, তন্মধ্যে অগ্নিদেব লাকিনী শক্তি বিরাজিতা। (৪) হৃদয়ে "অনাহত" নামক ধূম্রবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম—তাহাতে বায়ুদেব ও কাকিনীশক্তি অবস্থিতা। (৫) কণ্ঠদেশে "বিশুদ্ধ" নামে নীলবর্ণ ষোড়শ দল বিশিষ্ট পদ্মে শিব ও সাকিনী শক্তি অবস্থিতা। (৬) ভ্রূমধ্যে "আজ্ঞাচক্র" পীতবর্ণ দ্বিদলযুক্ত, শিব তথায় লিঙ্গরূপে হাকিনী শক্তিসহ বিরাজিত। এই পদ্মের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মার স্থান, উহাই সহস্রার পদ্ম—ইহা স্ত্রীগণ্ডলের মত গোলাকার তাহার মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র—তাহার মধ্যে পরম শিব অবস্থিত। উক্ত সুষুম্নার মধ্যে ষট্-গ্রন্থিই ষট্পদ্ম নামে কথিত, আর "সহস্রার" স্বতন্ত্র পদ্ম। শরীরের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীই প্রধান, ইড়া ও পিঙ্গলা তাহার সহচারিণী। চন্দ্রাংশে ইড়া, সূর্য্যাংশে পিঙ্গলা—এই দুই নাড়ী শুক্র শোণিত উদ্ভবা—ইহারা ব্রহ্মস্বরূপিণী সুষুম্নাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। চন্দ্র, সূর্য্য যেমন ব্রহ্মাণ্ডকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আছেন, দক্ষিণে ইড়া ও বামে পিঙ্গলা তেমনি শরীরকে দ্বিভাগ করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যোদয়ে যেমন জগৎ উত্তপ্ত এবং চন্দ্রের উদয়ে শীতলতা প্রাপ্ত হয়, পিঙ্গলা প্রভাবে শোণিত প্রবাহে উষ্ণতা, ইড়া প্রভাবে বায়ুপ্রবাহে শরীর স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিঙ্গলায় পূরক করিয়া সুষুম্নানাড়ী দ্বারা বায়ু স্তম্ভিতঃ করিলে—তাহাকে কুম্ভক বলে। ইড়ায় রেচক করিতে হয়। ইড়া ও পিঙ্গলায় রেচক-পূরক করিয়া প্রাণবায়ু চন্দ্রারোহণ করতঃ আদিত্য-দ্বার অর্থাৎ পিঙ্গলাভেদ করিয়া বৈশ্বানরাখ্য সুষুম্না-দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে, কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইয়া ক্রমশঃ ষট্চক্র অতিক্রম করিয়া সহস্রারে ব্রহ্ম-সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারেন—

ইহা ষট্‌চক্র ভেদ। * ইহা প্রধান যোগ। রামপ্রসাদ এই যোগসিদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামপ্রসাদ ভক্তির খেলা খেলিতে, প্রভু ও দাস ভাবে অথবা মাতা ও পুত্র ভাবে ভবের লীলা খেলায় মত্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু দুরন্ত কলি প্রবল বলিয়া মা তাঁহাকে সে ইচ্ছা হইতে বিরত করিয়া রাখিয়াছেন—তাই তাঁহার ভাবে মৃত্যু অর্থাৎ মুক্তি হইয়াছে। প্রসাদদেব মুক্তাবস্থায় মায়ের নিকটে আছেন, এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। একদিন হালিসহরে তাঁহার আত্মার জাগরণ (Spirit Invoke) করা হয়। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবীর যেরূপ শোচনীয় দশা হইতেছে, ধর্ম্মের ক্ষয় হইয়া পৃথিবী যেরূপ অধঃপাতে যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই আমাকে আবার ধরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। জগদম্বা এখন তাঁহাকে ধরায় আবার জন্ম লইবার অনুরোধ করিতেছেন। ধর্ম্ম হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তাহার উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষগণ ধরাতলে অবতীর্ণ হন, এইজন্য মা বলিতেছেন—"প্রসাদ, এইবার ঠিক সময় উপস্থিত বৎস! তুমি পুনরায় ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপভারে পরিপূর্ণ ভারতের উদ্ধার সাধন কর।" প্রসাদ মাকে বলিতেছেন—"মা! তোমার মিষ্টি কথায় ভুলে ধরায় যাইলেই ত অস্থির হইতে হইবে, পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে, জীবব্রহ্ম একবার পঞ্চভূতে আবদ্ধ হইলে, দেহ-গৃহে প্রবেশ করিলে আর রক্ষা আছে? তাঁহাকে নাকফোঁড়া বলদের মত কত ছুটাছুটি করিয়া সেই পাঁচ ভূতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে, তাহার কি আর স্থিরতা আছে? একবার ভাল করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করত মায়া-মোহে মজিয়া যাইলে আর সহজে পার পাওয়া যায় না। তবে এই যে জগতে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মকে পুনরায় প্রবল করা, ধর্ম্মের দেশে পুনরায় ধর্ম্মের প্রবল-বন্যা প্রবাহিত করাই আবার মায়ের ইচ্ছা হইয়াছে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা সাপক্ষে কার্য্য করিতে শুধু আমি কেন, আরও বহুতর মহাপুরুকে ধরায় যাইতে হইবে। ধর্ম্মের এরূপ অধঃপতন ভারতে আর কখন হয় নাই—তাই ধর্ম্মস্থাপন উদ্দেশ্যে ভারত আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, আবার ভারত জ্ঞানধর্ম্মে ভক্তি-প্রাধান্যে ভরিয়া উঠিবে, সে সুদিন আবার আসিবে, ভারতের তবোবনে আবার কোকিলকণ্ঠ মহাপুরুষগণের প্রাণারাম সামগান গীত হইবে, আবার ভারতবাসীর হৃদয়কন্দর ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত হইয়া পাপান্ধকার পরিশূন্য হইবে, সেই সময় প্রসাদদেব, রামকৃষ্ণদেব

* ইষ্টমন্ত্র জপের সহিত ইহা করাই বিধি, প্রথম ইড়ায় পুরক, সুষুম্নায় কুম্ভক এবং পিঙ্গলায় রেচক করিবে, পরে বিপরীত ভাবে অর্থাৎ পিঙ্গলায় পুরক, সুষুম্নায় কুম্ভক ও ইড়ায় রেচক করিবে।

প্রভৃতি মায়ের প্রিয়পুত্রগণ অবতীর্ণ হইয়া আবার দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করিবেন, পৃথিবীর পাপভার লাঘব করিবেন—ইহা সুনিশ্চিত। ভারতে যেরূপ ধর্ম্ম-দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সে সুখের দিন আসিতে আর বিলম্ব নাই। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, জীবোদ্ধারের জন্য, পাপাশয় পতিত-জনের রক্ষার জন্য রক্ষাকর্ত্রী মা আমার কতবার যে রক্ষাকালীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সুসন্তানগণকে পাঠাইয়া দুষ্কৃত পাপিগণকে যে কত প্রকারে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার কি স্থিরতা আছে? পতনেই ত উত্থানের সূত্রপাত, পাপের পরেই ত পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, দুরন্ত বিরহের পরই ত মিলনের সুখ-স্রোত একটানা বহিয়া থাকে, এই সনাতন রীতি ত জগতে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, তবে আজ তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? এস, এস মা বিশ্বজননী, বিশ্বমোহিনী, পতিতপাবনি! পবিত্র ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া এই ভক্তের দেশে, এই ধর্ম্মের দেশে, এই চিরশান্তিময় আর্য্যভূমে এই অমর বাঞ্ছিত ভারতবর্ষে আবার এস, আবার আমরা ধর্ম্মকর্ম্মে আত্মহারা হইয়া প্রাণ ভরিয়া তোমার মুক্তিমূলাধার পাদপদ্মে ভক্তি কুসুমাঞ্জলি দিয়া মানবজন্ম সফল করি। এস, এস, ভক্তবীর রামপ্রসাদ! এস, তোমার তান-লয়-মিশ্রিত তন্ত্রমন্ত্রের সুমন্ত্রে ভারতরাণীর হৃদয়তন্ত্রী আবার কালীনামের মোহমন্ত্রে সুগভীর রবে বাজিয়া উঠুক, আবার আমাদের হৃদয়-বিতানে মাতৃপ্রেমের গুপ্ত ছবি জাগিয়া উঠুক; মোহ-ঘুমে অচেতন কুণ্ডলিনী শক্তি আবার মূলাধারে জাগ্রত হইয়া স্তরে স্তরে ষট্‌চক্র ভেদ করত সহস্রারে ব্রহ্মের পদতলে নীত হইয়া পুনরায় আমাদিগকে ব্রহ্মময় করিয়া তুলুক, আমরা আমাদের নিজস্ব বুঝিয়া লইয়া আবার ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মভাবে আত্মহারা হইয়া মা মা রবে বায়ুস্তর পূর্ণ করত মায়ের প্রেমরূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া ধন্য হই, জগতে মরজন্মের সাধ মিটাইয়া অমরত্ব লাভ করি। জ্ঞানময় ভারত, আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মময় ভারত আজ অন্ধ, মোহমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছে, আপনার ভুলিয়া পরপদে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছে, দিশাহারা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পাপের অতলতলে ডুবিতেছে; মহাপুরুষ তোমরা, ভক্ত তোমরা, সাধন-ভজনে পরিপুষ্ট তোমরা, শ্যামামায়ের চাপরাসধারী বীর পুরুষ তোমরা—এস; এ সময় তোমরা রক্ষা না করিলে হাত ধরিয়া না তুলিলে, পাপান্ধকারে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ না দেখাইলে, বুঝি এ দেশ চিরতরে ডুবিয়া যায়, বুঝি ইহার অস্তিত্ব লোপ হইয়া চিহ্ন মাত্র আর থাকে না। ধর্ম্মই জীবকে ধরিয়া রাখে, টানিয়া রাখে, কুপথ হইতে সুপথে লইয়া আসে; ভারত ধর্ম্মের মহিমা, ধর্ম্মের উপদেশ, ধর্ম্মের সম্মোহন ভাব ভুলিতে বসিয়াছে বলিয়াই আজ তাহাদের দুর্গতির

একশেষ হইয়াছে; এসময় তোমরা না আসিলে, তোমরা দয়া না করিলে ভারতের ভাগ্যে সুখসূর্য্যোদয়ের আর সম্ভাবনা নাই। ঘোর কলি উপস্থিত, কলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজ চারিদিকে বিঘোষিত, হীনবুদ্ধি জীব আজ তাহার মহাপ্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম একেবারে ছাড়িতে চেষ্টা করিতেছে; যোগতপস্যার সময় নাই, জীবন ক্ষণস্থায়ী, স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব—দেশে দ্রব্যাদির অভাব, সংহিতাদি ধর্ম্মের আচরণ সম্ভবপর নহে—কারণ মন সতত সন্দেহযুক্ত, কলির এই দারুণ ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে এস মা-ময় জীবন, সাধক-রতন রামপ্রসাদ! এস, এই দুর্দ্দিনে ভোগমোক্ষের নিদানভূত তান্ত্রিক সাধনার গুপ্ত-সন্ধান আবার এই মৃতকল্প ভারতবাসীর অসাড় প্রাণে সংবদ্ধ করিতে এস, ভক্তবীর প্রসাদ। তাহাদের নির্জ্জীব প্রাণ আবার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হউক, আবার মাতৃনামের প্রাণমাতান সঙ্গীত তাহাদের মৃতদেহে সঞ্জীবিত হউক, ধর্ম্মের বীরভাব আবার তাগাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করুক। কলিতে তন্ত্রের সাধনাই শিবোক্ত সাধনা, ভগবান্ সদাশিব আচারভ্রষ্ট, দুর্ব্বল কলির জীবের পক্ষে এই সাধনাই বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, এই আগমোক্ত সাধনা ভিন্ন কলির জীবের উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। ইহার সাধন পদ্ধতি অতি সহজ এবং অল্পায়াসসাধ্য। হে কলির অল্পজীবিন্ জীব! তুমি যদি কিছু না পার, যদি কিছু করিবাব ক্ষমতা তোমার না থাকে, তুমি গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত প্রত্যহ জপ আরম্ভ কর, প্রসাদের উত্তর-সাধক ভজহরির ন্যায় ক্রমশঃ জপের মাত্রা পরিবর্দ্ধিত কর, ভক্তিপ্রাবল্যে মা মা করিয়া কাঁদিয়া আকুল হও, দেখিবে, তোমার হৃদয় মালিন্য-শূন্য হইবে, সাধনপথ প্রশস্ত হইবে, তোমার প্রাণের আকুল আহ্বানে সন্তানবৎসলা মায়ের আসন টলিবে—অচিরেই তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া মা তোমায় কোলে লইবেন—তোমার ত্রিতাপতপ্ত প্রাণ সুশীতল করিবেন। ভাই, অগ্রসর হও, মা মা বলিয়া কার্য্যে লাগিয়া পড়, দেখ দেখি দয়াময়ী মা তোমাদের দয়া করেন কি না, মা যে তোমাদেরই, তোমরা যে তাঁহার অঞ্চলের নিধি, তাঁহার প্রাণের শান্তি, নয়নের মণি, মা কি তোমাদিগকে ছাড়িয়া, কোলের ছেলে ফেলিয়া থাকিতে পারেন! মায়ের ধন সন্তানের যে নিজস্ব সম্পত্তি, মায়ের রাতুল চরণ যে কেবল তোমাদেরই নিকট বিক্রীত, তোমরা হেলায় হারাইতেছ বলিয়াইত সে চরণ-ছায়া হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছ, নতুবা তোমরা যদি আবেগভরে স্থির বিশ্বাসের সহিত তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিতে পার—তাহা হইলে প্রসাদের ন্যায় তোমরাও এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে

তাঁহার দয়া লাভ করিতে সমর্থ হইবে। মাতৃপদে আশ্রয় লইবার ইচ্ছা থাকিলে —ইচ্ছাময়ী কখনও সন্তানের ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। তিনি রামপ্রসাদের ন্যায় মুক্ত পুরুষকে দেহধারী করিয়া তোমার সাধনপথের সহায়রূপে পাঠাইয়া দিবেন। প্রাণে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জাগিলে সিদ্ধিলাভের উপায় সহজসাধ্য হইয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট

এই অধ্যায়ে কয়েকটী প্রক্ষিপ্ত উপদেশ বিবৃত করিয়া আমরা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিব। রামপ্রসাদ প্রতি কথাতেই বলিতেন—মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধন করা সহজসাধ্য, কোন ত্রুটি বা অপরাধ হইলে, সাধনায় কোন ভ্রমপ্রমাদ উপস্থিত হইলে, মা সে সমস্ত দোষ ক্ষমা করেন এবং আবশ্যক হইলে নিজেই সে ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন—এরূপ সহজসাধ্য সাধনা আর নাই, ছেলে মাকে সন্তুষ্ট করিবে—তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিয়া আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইবে—ইহাতে আর কঠিনতা কোথায়? মাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে জগতে পুত্রের আর কোন বিষয় অপ্রাপ্য থাকে না। ছেলে যে মায়েরই, সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে মাকেই জানে, মাকেই চিনে, মায়ের কোলেই লালিত পালিত হয়—তাহার পর মায়ের কৃপায় ক্রমে ক্রমে সে পিতার কৃপাও লাভ করিয়া থাকে—মাই পিতাকে চিনাইয়া দেন, এইজন্য মাতৃসেবক হইলে পিতৃ-সেবক হইবার কোন বাধা থাকে না। তুমি মাকে সন্তুষ্ট কর, পিতার সন্তুষ্টি লাভের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। মা যদি তোমার প্রতি সদয় হন—তোমার সেবায় তিনি যদি তোমার প্রতি প্রীতিলাভ করেন—তাহা হইলে "ইহা দাও, উহা দাও" বলিয়া আর চাহিতে হইবে না; বাৎসল্যের আধার দয়াময়ী নিজেই তোমার মনের মত ধন চতুর্ব্বর্গ রতন বিতরণ করিয়া তোমার আশা মিটাইবেন, মা সাধ্যবস্তু, মাতৃচরণ সন্তানের আরাধনার ধন—তুমি নিঃস্বার্থভাবে সাধনা করিয়া যাও, দিবার কর্ত্রী তিনি, কি দিলে ভাল হয় না হয়—সন্তানের যাবতীয় অভাব অভিযোগ মা যত বুঝেন, ত্রিজগতে তত আর কেহই বুঝে না, অতএব তোমাকে কোন বিষয় চাহিতে হইবে না, যাহা দরকার—তাঁহার কৃপায় আপনাপনিই পূরণ হইয়া যাইবে। অনেকে বলেন—রামপ্রসাদ কেবল কালীরই বরপুত্র ছিলেন, কালিকাকেই তিনি ভজন করিতেন, অন্য দেবতা তিনি বুঝিতেন

না। প্রসাদের প্রতি যাহাদের এইরূপ ধারণা—তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত—তিনি সকল দেবতাকেই যে মায়ের মধ্যে দেখিতেন, তাহা তাঁহার গানেই প্রকাশ। তারপর যিনি প্রকৃত শাক্ত—তিনি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ না হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, আর যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব তিনি শাক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। শাক্ত, বৈষ্ণব যে এক মায়ের সন্তান—তাহা প্রকৃত ভক্তেই বুঝিতে পারে—অভক্ত ভেদ-বুদ্ধি লইয়া ইহপরকাল নষ্ট করে।

প্রত্যেক দ্বিজ জাতিই শক্ত, সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ না করিলে যে সিদ্ধ হইতে পারে না, ঐ বেদমাতা গায়ত্রীই যে আমার মায়ের স্বরূপ-মূর্ত্তি—তিনি যে আমরা মা, আর এ জগতে মায়ের ছেলে নয় কে? আগে মায়ের গর্ভে জন্মিয়া, মাকে ভাল করিয়া জানিয়া তবে ত পিতাকে জানিতে হয়? পিতা কেমন, জানিতে হইলে আগে মায়েরই শরণাপন্ন হইতে হইবে, সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য রহিল কই? যাহারা পার্থক্য বোধ করে—তাহারা কিছু বুঝে নাই—কেবল গোঁড়ামী করিয়া দুর্লভ মানুষ জন্মটাকে নষ্ট করে। যদি মানুষ হইতে, চাও ত ভেদজ্ঞান রহিত হও। প্রসাদ অবসর পাইলে প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত বন্ধুবান্ধবদের সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তনে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইতেন, সংসারে কোন বৈগুণ্য সংঘটিত হইলে অগ্রে "হরিলুট" মানসিক করিতেন—এরূপ কর্ম্ম যে তাঁহার হরিভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, তাহা কে অস্বীকার করিবে? প্রসাদের নিকট কেহ কোন উপদেশ লইতে আসিলে তিনি প্রথমেই সকলকে সত্যবাদী ও সংযত-চিত্ত হইতে উপদেশ দিতেন। কেহ যদি বলিত সত্যবাদী কিরূপে হওয়া যায়? তিনি বলিতেন—মৃত্যুকে অহরহঃ স্মরণ কর ও জগতের কাজ কর, অসত্যের হাত হইতে সহজেই মুক্ত হইবে, কারণ মৃত্যু সত্য আর সমস্ত মিথ্যা, জীবনে মৃত্যুর তুল্য সত্য আর কিছুই নাই—ইহা সদাসর্ব্বদা স্মৃতিপটে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে, সহজেই সত্যনিষ্ঠ হইতে পারা যায়। প্রসাদের জীবনেও আমরা দেখিতে পাই—তিনি যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—তাহার অধিকাংশই মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া—যম রাজাকে কটাক্ষ করিয়া অধিকাংশ সঙ্গীতই রচিত হইয়াছে। সত্য আশ্রয় না করিলে মায়ের করুণা লাভ করিতে পারা যায় না। তুমি যতই কেন দোষী হও না—পাপে যতই কেন তাপী হও না, মায়ের নিকট কাঁদিয়া পড়িয়া সত্য কথায় সমস্ত দোষ স্বীকার করিলে—মা মার্জ্জনা করেন, কোলে তুলিয়া অভয় প্রদান করেন—ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এইজন্য শাক্তভক্ত কখনও কপটাচারী হয় না, তাহারা যখন যাহা করে প্রকাশ্যেই করে, ভাবের ঘরে চুরি করিয়া মিথ্যা ভান করা তাহাদের

স্বভাববিরুদ্ধ। মায়ের ছেলে খোলা প্রাণে, যাহা মনে উদয় হয়—করিয়া যায়, ভরসা আছে—তাহার পশ্চাতে তাহার মা আছেন, সংশোধন করিয়া যেরূপভাবে চালিত করিতে হয়, তিনি করিয়া লইবেন। সমস্ত ভার মাকে দিয়া সে সাধনার পথে অগ্রসর হয়, তাই তান্ত্রিক সাধকের সিদ্ধিলাভ এত সহজসাধ্য। খারাপ ছেলেটার উপরই মায়ের নজর বেশী থাকে, তিনি প্রায়ই বাবার চমক ভাঙ্গিয়া দিয়া বলেন—হ্যাঁ গা, সুবোধ যে আমার অবোধ হইয়া যাইতেছে, তুমি একবার দেখিলে না!" সাধনক্ষেত্রেও মায়ের দয়া এইরূপ। অতএব পাঠক! মা নামে চিত্ত দৃঢ় করিয়া, প্রাণ ভরিয়া মধুময় মা নাম উচ্চারণ করিয়া এস, আমরা প্রসাদের ন্যায় সাধনায় প্রবৃত্ত হই, ভক্তের আশীর্ব্বাদ মায়ের আশীর্ব্বাদ, ভক্তের উপদেশই মায়ের উপদেশ; জগতে অধর্ম্মের রাজত্ব বিস্তার হইলে চিরদিন মা ভক্ত সন্তানকে পাঠাইয়া আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, অতএব এ দুর্লভ জন্ম আর বৃথা নষ্ট করিও না, মায়ের ডাক পড়িয়াছে, ঐ শুন মা চারিহস্ত ছিনাইয়া ডাকিতেছে—"আয় বাপ! আয় কোলে করি।" আর কাল বিলম্ব না করিয়া এস, আমরা মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি এবং বলি ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীরামপ্রসাদের পরম পবিত্রকাহিনী শেষ হইল, আমার যতদূর সাধ্য এই পুস্তকে তাঁহার যাবতীয় অলৌকিক ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছি। এই জীবনী সংগ্রহ বিষয়ে আমার নিজস্ব ক্ষমতা কিছুই নাই—প্রথম ক্ষমতা মায়ের, দ্বিতীয় ক্ষমতা তাঁহার ভক্তগণের। এই পুস্তক প্রণয়নে আমি নানাবিধ পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্য লইয়াছি, তন্মধ্যে—বীরভূমি ত্রিশূল, নারায়ণ, ব্রাহ্মণ-সমাজ, আর্য্যদর্শন এবং প্রসাদপ্রসঙ্গ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তজ্জন্য উক্ত মাসিক পত্র সকলের ভক্তলেখকগণের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

প্রসাদের জীবনী সংগ্রহে তদীয় পৌত্র ৺দুর্গাদাস সেন এবং তৎপুত্র শ্রীমান্ অমরনাথ সেন মহাশয়ের নিকটও আমি শ্রীযুত যোগানন্দ ভারতী সরস্বতী মহারাজ দ্বারা অনেক বিষয় জানিয়া লইয়াছি। তৎপরে হুগলির স্বনাম-ধন্য উকীল বন্ধুবর শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটও অনেক সাহায্য পাইয়াছি,—তাঁহাদের এ অমূল্য সাহায্য আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

প্রসাদের জীবনের কোন ইতিহাস নাই—পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে সকল সাধক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ পবিত্র করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সন তারিখের সঠিক সংবাদ প্রদান করা বড়ই কঠিন—কারণ সে সময় জীবনী

লিখিবার কোন প্রথা ছিল না অথবা তাঁহারা এত গোপনীয়ভাবে কালযাপন করিতেন যে, সহজে তাহা সংগ্রহ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার, এমন কি দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য পুস্তকস্থিত ঘটনাবলীর সময় নিরূপণের কিছু কিছু ব্যতিক্রম হইলেও হইতে পারে—তজ্জন্য পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

আমার বিবেচনায় ভারতে সাধক জীবনী সংগ্রহ করিয়া সকলের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার আবশ্যক হইবে না বলিয়া বুঝি—তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট জীবনী কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। কারণ ভারত সাধকেরই দেশ, তখন ভারতের প্রতি ঘরে তপঃপরায়ণ ভগবন্নিষ্ঠ সাধক জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ পবিত্র করিতেন—সে দেশ যে হঠাৎ এমন অধর্ম্মে ভরিয়া উঠিবে, সাধকহীন হইয়া শ্মশানে পরিণত হইবে—তাহা কাহারও মনে উদয় হয় নাই বলিয়া এ সকল কার্য্যে তখনকার লোক তত অগ্রসর হইতেন না। এখন অনেক সাধারণ লোকের জীবনীও প্রকাশ হইতেছে—এবং তাহা যখন জনসমাজে আগ্রহ সহকারে পঠিত হইতেছে, তখন কলির সাধকাগ্রগণ্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ রামপ্রসাদের জীবনী কি পঠিত হইবে না? তাই তাঁহার কোন বিস্তৃত জীবনী নাই দেখিয়া বিশেষ পরিশ্রমে ইহা জনসাধারণের গোচর করিলাম। ইহাতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার যশসৌরভের কিছু লাঘব হইল কি না বলিতে পারি না, তবে জগতে মানুষের কর্তৃত্ব কিছুতেই নাই; যখন সকল বিষয়েই বিশ্বকর্ত্রীর কর্তৃত্ব বর্ত্তমান, তখন আমি কে, সমস্ত বিষয় তাঁহারই অনুমতি অনুসারে গ্রথিত হইয়া তাঁহারই পদে সমর্পিত হইল। মা, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ব্রহ্মার্পণমস্তু।

প্রসাদ-পদাবলী

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মা আমায় ঘুরাবে কত ?
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত ॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে' গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কু-মাতা নয় কখন-তো।
রাম প্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥ ১ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
ওরে অনলে দাহন যথা হয় রে তুলারাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
ওরে যে করে কালীর ধ্যান তার গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ২ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

এবার আমি বুঝিব হরে।
মায়ের ধর্‌ব চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌ব এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন্ বিচারে?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে ব'ল্‌ব তারে।
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দিক আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গা'র উপরে।
রামপ্রসাদ বলে, ভয় করিনে মার অভয় চরণের জোরে॥ ৩।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো ব'লে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে দূর করিব মনের ব্যথা॥
তুমি গো পাষাণের সুতা, আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে, হৃদি-স্থলে গুরু-তত্ত্ব রাখ গাঁথা॥ ৪॥

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা

ভাব না কালী ভাবনা কিবা
ওরে মোহ-ময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করিলা শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড় দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা-মূলা, খেলা ধূলা কি ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তার নাট, তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর।
রামপ্রসাদ বলে, ভাঙ্গলো ঘোর, আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥ ৫॥

রাগিণী ললিত বিলাস—তাল একতালা

কেবল আসার আসা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম্ খাওয়ালে, চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা! মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো॥
মা খেল্‌বি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥ ৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
আমি কাজ হারালেম কালের বসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন ক'রেছিলাম মা দেশ বিদেশে।
তখন ভাই-বন্ধু-দারা-সুত, সবাই ছিল আমার বসে॥
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই-বন্ধু-দারা-সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে॥
যম আসি শিয়রে বসি, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে॥
হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে॥
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥ ৭॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ

ভবের আসা খেল্‌ব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো॥
পাবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কাচ্চা বার পেয়ে মাগো পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হ'লো॥
ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হ'লো॥ ৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

এবার বাজী ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলাবে বল ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটা বিপাকে মলো ॥
দুটা অশ্ব, দুটা গজ, ঘরে ব'সে কা'ল কাটালো।
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হলো ॥
দুখান তরী নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে, এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রলো ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে পীলের কিস্তে মাত হইল ॥ ৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই ॥
আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নাবাও, ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই ॥ ১০ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝ্‌লি না রে মন রে ঠেটা ॥
কোথা রবে বর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আসবে শমন, বাঁধ্‌বে কসে মন, কোথা রবে খুড়ো জ্যেঠা ॥
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চেটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে আছে রে যে জাব্‌দা আঁটা ॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে, ছাড রে সংসারের লেঠা ॥ ১১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মা গো তারা, ও শঙ্করি !

কোন্ অবিচারে আমার 'পরে ক'র্‌লে দুঃখের ডিক্রী জারি ॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্ মা কিসে সামাই করি ।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি ।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী ॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি ।
আমায় ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ॥
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিস্‌মিসে তাঁর আশয় ভারি ।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী, যেরূপে মা আমি হারি ॥
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি ।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয়চরণ, তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি ॥ ১২ ॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়খেম্‌টা ।

ওমা ! হর গো তারা, মনের দুঃখ ।
আর তো দুঃখ সহে না ॥

যে দুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে ।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মেই বলে ওনা ওনা ॥
জন্মমৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো, যে জন্মে নাই সে জানে না ।
তুই কি জান্‌বি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না, মরিলে না ॥
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে ।
তবু রব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না ॥ ১৩ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আমি এত দোষী কিসে ।

ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন কাঁদি ব'সে
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাক্‌ব না আর এমন দেশে ।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম, চাপ্‌রাশী এসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি ব'সে ।
কিন্তু এমন কল করেছে কালী, বেঁধে রাখে মায়া পাশে ॥

কালীর পদে মনের খেদে দীন রামপ্রসাদে ভাসে।
আমার সেই যে কালী, মনের কালী,
হলেম কালী তরে বিষয় বশে ॥১৪॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা

মন কালী কাল বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপ না, ওরে ও মন, কেন ভুল ॥
কিঞ্চিৎ ক'রো না ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল ॥
যা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মন কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূল, ভব পারাবারে চল ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কেন মন ভুল।
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হল ॥ ১৫ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না।
রসনা! যা হবার তাই হবে ॥
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে), না আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হ'লো না ব'লে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিও রে, নিও রে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতন থেক (মন রে আমার), কালী ব'লে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥ ১৬ ॥*

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা

কাল মেঘ উদয় হ'লো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে ॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে ॥

* কেহ কেহ বলেন যে এই সঙ্গীত রুদ্র ঠাকুর দ্বারা বিরচিত, এবং ইহার ধুয়া "হরির নাম লইতে অলস হইও না" এইরূপ—এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা গেল না।

নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্র বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে ॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পার।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে ॥ ১৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মনরে তোর বুদ্ধি একি।
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তালাস করে বেড়াস ফাকি ॥
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে, মন রে,
ওঝার ছেলে গরু হইলে গোসাপে তায় কাটে না কি ॥
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে ক'রো না হেলা।
মন রে, যখন ব'ল্‌বে জাত সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী ॥ ১৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

কালী-পদ-মরকত-আলানে মন-কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্ম পাশ ফেল কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥
সতত ত্রিতাপের (১) তাপে হৃদি-ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে ॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে ব'সে চারি ফল, বুঝনা রে দুঃখ চেটে ॥
রামপ্রসাদ কয়, কিসে কি হয়, মিছে মোলাম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে ॥ ১৯ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কেরে, হলি কার নফর ॥
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি, কর্ম্ম জমা ধর (ওরে মন)।

ত্রিতাপ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক।

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটী সার।
ওরে মিছে কেন দারা সুতের বেগার খেটে মর (ওরে মন)॥ ২০

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই লহনা (১)॥
ব্যজনে পবন বাস (২) চালনেতে সুপ্রকাশ।
মনরে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥
কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল।
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন।
মন রে ওরে, শ্রীনাথদত্ত কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোল না।
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, (১) বুড়া দাদা দিদি ঘাতী।
মন রে ওরে জনন মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে।
মনরে ওরে, সিন্দূর বিধবার ভালে, মরি কি বা বিবেচনা॥ ২১॥

রাগিণী গাঢ়া ভৈরবী—তাল ঠুংরী

অপার সংসার, নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।

(১) লহন—বাকী, অনাদায়। শাস্ত্র বলেন—যে ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া এইরূপ প্রতিশ্রুত আছেন যে সাধনা করিলে তিনি মুক্তি দিতে বাধ্য।

(২) ব্যজন—পাখা। যেরূপ পাখাতে বায়ু বাস করে কিন্তু সঞ্চালনাভাবে তাহা প্রকাশ পায় না, সেইরূপ প্রত্যেক আত্মাতে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন, কেবল সাধনাভাবে তাহা উপলব্ধি হয় না।

(৩) মনের দুইটি স্ত্রী—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির গর্ভের সন্তান অবিদ্যা বা অজ্ঞান, নিবৃত্তির গর্ভের সন্তান বিদ্যা বা জ্ঞান, জ্ঞানের সন্তান—প্রবোধ। প্রবোধ জন্মিলেই জীবের প্রবৃত্তির নাশ হয়। "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটক দ্রষ্টব্য।

পূরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম, তারা তব নাম সংসারের সার।
কাল গেল কালী হল না সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভব-বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥ ২২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মনরে আমার ভুলা মামা।
ও তুই জানিস্ নারে খরচ-জমা॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি।
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা।
বাদে হইল অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবীল বাকী।
তহবীল বাকী বড ফাঁকী, হবে না তো লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি, কালীতারা-উমাশ্যামা॥ ২৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥ ২৪॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা

মায়া রে পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই।
মন রে ওরে, মিছেমিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক॥
আমি কেবা, আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুঃখ-সুখ॥
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে।
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুকু॥

প্রাজ্ঞ, অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি (১) তুলিয়া দেখ রে মুখ ॥ ২৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাক্‌বে আমার মন কেন কুপথে চলে ॥
কেঁদে গো মা দশভুজা, আমার ভয়ে তনু হইল বোঝা।
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা-বিল্ব-গঙ্গাজলে ॥
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী।
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাক্‌ব কালী কালী ব'লে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে।
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে ॥ ২৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ॥
মন অগ্রে শশী (২) বশীভূত কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোটার ভিতর চোর কোটরি, (৩)
ভোর হলে সে লুকাবে রে ॥
ষড় দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে (৪) ॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে, যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে মাতৃ ভাবে, আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে ॥ ২৭ ॥

---

(১) মায়ামোহরূপ—মশারি।
(২) শশী—কাম প্রবৃত্তি। উহা সর্ব্বাগ্রে দমন করিবে।
(৩) চোর কোটরি—গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্তস্থান।
(৪) পুরে—আত্মাতে।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

এই সংসার ধোঁকার টাটি ॥
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥
ওরে, ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি ॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী। *
যেমন শরীর জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ি, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি ॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে, ইচ্ছা-সুখে পান ক'রে, বিষের জ্বালায় ছটফটি ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী ॥ ২৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় ক'রেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী ॥
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা-পারে, যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥ ২৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

এবার কালী কুলাইব।
কালি কোসে কালি বুঝে লব ॥
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন ক'রে তায় রাখিব
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য ক'রে, হৃদিপদ্মে নাচাইব ॥
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।

* প্রসাদ বদ্ধ-জীবের বিষয় এই গানে উপদেশ দিতেছেন।

আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥
কালী ভেবে কালী হোয়ে, কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব ॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি, তবু কালী কালী না ছাড়িব ॥ ৩০ ॥

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা

একবার ডাকরে কালীতারা বোলে, জোর ক'রে রসনে।
ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে ॥
ভজনের ছিল আশা, সুখ মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বি-ভাব ভেবে মনে ॥ ৩১ ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল আড়া

ত্যজ মন কুজন-ভুজঙ্গ-সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ।
মকরন্দ রসে মজ ওরে মনোভৃঙ্গ ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন।
বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রা ভঙ্গ ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে।
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে।
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা।
অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ৩২ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোর
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,

ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে ক'রতে পারে জোর ॥
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর।
ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রে মন রজনী কর ভোর ॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর ॥ ৩৩ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা
মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনে নাহি খেলি ॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চম্পাকলি ধূলা ধূলি,
আমি কালী নামের মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি ॥
ছয় জনের মন্ত্রণা, তাইতে পাগল ভুলে গেলি,
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলি কাঁথা ঝুলি ॥ ৩৪ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা
কালীর নাম বড় মিঠা
সদা গান কর পান কর এটা ॥
ওরে ধিক্‌রে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স্ পিঠা ॥
নিরাকার সাকার ককার, সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগমোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কিটা ॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাত তালীটা ॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুলি মন কর বিল্বদল, শ্রব কর যত্ন যেটা ॥
প্রসাদ বলে হৃদি ভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ-তনু দক্ষিণাকালীর দেবত্তরের দাগা চিঠা ॥ ৩৫ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা
ওরে মন চরকি চরক কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে ॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।

মনরে ওরে, কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিছ তাহারে ॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে (১) বাজিছে ঢাক।
মনরে ওরে, বৃন্দাবলী শ্যামটা ঢালী, বাজায় বারে বারে।
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মনরে ওরে, এমন যাতনা ক'রেছে তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে।
দীর্ঘ আশা চরকগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে, মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে।
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার।
মনরে ওরে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি, ডাক কেলে মারে ॥ ৩৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা ॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌ল না আর সিদ্ধি ঘোঁটা ॥
যেজন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায় ছালি আর মাথায় জটা ॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করিলে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা ॥
চাক্‌ল্য জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এবে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝ্‌বে কেটা ॥ ৩৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মার নাম গায়িব ॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণ তলে কত শত গয়া গঙ্গা দেখতে পাব ॥
শ্রীরাম প্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে বিমাতাকে মা বলিব ॥ ৩৮ ॥

---

(১) গাজন—চৈত্রোৎসব, চড়ক পূজা।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলাম যথা তথা ॥
দিবা হ'লো অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ।
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হ'য়ে, স্থান দাও গো জগন্মাতা ॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গ দাতা।
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে রাখ্‌বে রাখ এই কথা ॥ ৩৯ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা

মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনু-তরণী ভব-সাগরে ডুবাইলাম ॥
এ ভব-তরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
তাতে ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম ॥
বিষয়-তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ওচরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মাগো, আমি কি কাজ করিলাম।
আমার তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥ ৪০ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

পতিতপাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নামটী সারা ॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা।
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল ॥
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা।
ঠেকে ছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমার নাই।
ঙয়ায় সয় তয় রয় (১) সেইরূপ বর্ণ পারা ॥
দশের রথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা।
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥
পাগল বেটার কথায় মজে, এতকাল ম'লাম ভজে।
দিয়াছি গোলামি খৎ এখন কি আর আছে চারা ॥

---

(১) ঙয়ায়, সয়, তয়, রয়, ঙ, স্র।

আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ।
কালার কালার দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা॥
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে।
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা॥ ৪১॥

রাগিণী ঝংলা—তাল একতলা

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোক্‌সানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমী।
তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী॥
আমি মোলে এ মহলে আর নাই হামি (১)॥
মাগো এখন ভাল না রাখ তো, থাকুক রামরামি।
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে লয়েন এই ভূমি।
তবে কথা রবে, কোথা রব কোথা রবে তুমি॥ ৪২॥

প্রসাদ সুর—তাল একতালা

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড তাতে তোমার হয় না ব্যথা॥
দ্বিজরামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখ্‌লে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা॥ ৪৩॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আদ্ধা

কালী তারার নাম জপ মুখেরে, যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশান বাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরা না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে;

(১) হামি—উত্তরাধিকারী।

তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি ;
দ্বিজ রামপ্রসাদের মতি, চরণতলে রেখ রে ॥ ৪৪ ॥

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা

জগত-জননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগৎ ছাড়া গো তারা।
দিবা অবসানে রজনী কালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী, তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা।
দ্বিজ রামপ্রসাদে, ভাবিয়ে সারা মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া,
কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ॥ ৪৫ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল একতালা

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥
কালী নাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে মন ;
ও তুই আমাকে বঞ্চনা ক'রে ঐহিক সুখে হইলি সুখী ॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম মন ;
ও তোর জুড়াবে তাপিত প্রাণ, একবার শ্যামা বলরে দেখি ॥ ৪৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আমার সনদ দেখে যা রে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বল্‌গে যা তোর যম রাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর 'অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দী বরে ॥
সনদ আমার উরস্ পাটে যেম্নি সনদ তেমনি টাটে।
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, ক'রেছেন দীর্ঘস্বরে ॥ ৪৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি॥ ৪৮॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়ের দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে॥
আরজ বেশী যার শিরে, সে দরবারের ভাষ্য কিরে।
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে আস্থা কি কথার রে॥
লাখ উকিল ক'রেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া।
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, কাণ নাই বুঝি মার রে॥
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী।
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী করিল আমারে রে॥ ৪৯॥

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়॥
দুর্গা নাম তরণী ক'রে, বেয়ে গেলে হয়।
পথে যদি চৌকিদারে তোরে কিছু কয়॥
তখন ডেকে ব'লো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়।
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে ক'রিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে ক'রেছি বিক্রয়॥ ৫০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মা গো আমার কপাল দুষী।
দুষী বটে গো আনন্দময়ী॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারাণসী।

নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি ॥
না করিলাম ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পাপ ক'রেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥
জনমি ভারত-ভূমে মা! কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার একূল ওকূল দুকূল গেল, অকূল পাথারে ভাসি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাব্‌তে নারি দিবা নিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গা নামে দিব ফাঁসি ॥ ৫১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে ॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে।
যদি পারে যাবি, দুঃখ মিটাবি, মনের গিরা দে রে কেটে ॥
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি ক'র্‌বে আর ভবের হাটে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে ॥ ৫২ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

এবার আমি ক'রব কৃষি।
ওগো, এ ভব-সংসারে আসি ॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে বসে দেখ রাজমহিষী।
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি ॥
মা গো, যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
হৃদয়-মধ্যেতে আছে পাপরূপী তৃণরাশি ॥
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত করগো মা মুক্তকেশী।
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি ॥
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে শস্য পাব রাশি রাশি।
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী ॥
আমার মনের বাসনা, তোমার ও রাঙ্গা চরণে মিশি ॥ ৫৩ ॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা

জয় কালী, জয় কালী বলে জেগে থাক্ রে মন।
তুমি ঘুম যেয়ো না রে ভোলা মন, ঘুমেতে হারাবে ধন॥
নব দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে, হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিদ্, চোরে দিবে সিঁদ, হ'রে লবে সব রতন॥ ৫৪॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা

মা তোমারে বারে বারে জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখ-নীরে, স্রোতের সেহালার মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মা বুঝি নিদয়া হলে।
দাঁড়াও একবার হৃদ্ (১) মন্দিরে, দেখে যাই জনমের মত॥ ৫৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে আর হরষে।
আগে ভাঙ্গব গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে।
রব রসাভাষে, হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে॥
মন কর কি, লওরে সুধা, দুজনাতে মিলি মিশে।
খাবে একই নিঃশ্বাসে, যেন সূর্য্য তেজে সকল শোষে॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠি, শুদ্ধ তারাবেশে।
মাগী জানে না যে মন কপাটে, খিল দেয়েছি বড় ক'সে॥ ৫৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয় পদ সার ক'রেছি, ভয়ে হেল্‌ব দুলব নাগো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌ব নাগো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌ব না গো॥
ধন লোভে মত্ত হ'য়ে, দ্বারে দ্বারে ঘুর্‌ব না গো।

---

(১) হৃদ্ মন্দিরে—হৃদাকাশে।

মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো ॥
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিছে ভুল্‌ব নাগো ॥ ৫৭

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

ছি ছি মন তুই বিষয়-লোভা।
কিছু জান না, মান না, শুন না কথা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে, জ্ঞান খড়্গে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা ॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মন লবা।
ওরে, মায়া সূত্র, তারে দূরে হাকায়ে দেবা ॥
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটো সেই মাকে দিবা ॥
রামপ্রসাদ দাসে কয়, শেষে ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥ ৫৮ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ

কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে;
কালী ভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে।
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু;
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্প-গাছে।
ঘরে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী;
শিব শিবা, রাত্রি দিবা রক্ষা হেতু আছে।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ;
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে।*
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়;
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক্‌ পাছে ॥ ৫৯ ॥

রাগিণী টুরি জায়েনপুরী—তাল একতালা

সময় তো থাক্‌বে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কথা রবে, মা গো জগতে কলঙ্ক রবে।

* এখানে 'থাকে' অর্থে, পদ্যমিলের অনুরোধে 'আছে' ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে। ঘরে মুক্তি মূর্ত্তিমতী' ও "মার ইচ্ছা যোগ-ভোগ ভক্ত জনে আছে—এই দুই বাক্য দ্বারা প্রসাদ প্রকারান্তরে ইহাই বলিতেছেন যে ধর্ম্ম সাধনার জন্য তীর্থ পর্য্যটন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন।

ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়াইবে।
সাগরে যার বিছানা মা! শিশিরে তার কি করিবে॥
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গা নাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে॥ ৬০॥

রাগিণী টুরি জায়েনপুরী—তাল একতালা

আমায় ছুঁও না রে শমন, আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা ক'রেছে॥
শোন্‌রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়াছে
(ওরে শমন রে)
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী ক'রেছে॥
মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে
(ওরে শমন রে)।
ইহা ক'রে শ্রবণ, রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে॥ ৬১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজি কূপে পড়ে আপন খাবে॥
ভবজরা পাপ রোগ নীলাচলে নানা ভোগ।
ওরে জরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে॥
কালী নাম মহৌষধী, ভক্তিভাবে পান বিধি।
ওরে গান কর পান কর, আত্মারামের আত্ম্য হবে॥
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মার মিশাইবে॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতরু ছায়া।
ওরে কাটা বৃক্ষের তলে গেলে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে॥ ৬২॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
এ রসনায় ধিক্ ধিক্ ধিক্ কালী নাম নাহি বলে॥

কালীরূপ যে না হেরে পাপ চক্ষু বলি তারে।
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণ তলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ।
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে।
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দনজবা আর বিল্বদলে ॥
সে চরণে কাজ কি বা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা।
ওরে কালী মূর্ত্তি যথা, তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে।
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার।
রামপ্রসাদ বলে বাবই গাছে আম্র কি কখন ফলে ॥ ৬৩ ॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল একতালা

আয় দেখি মন তুমি আমি দুজনে বিরলেতে বসিরে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরুচরণে।
পদে লুকাইব, সুধা খাব, যমের বাপের কি ধার ধারিরে ॥
মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
দিয়েছেন যে ধন অভয় চরণ কেমনে খরচ করিরে ॥
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলাসা করিরে।
মধুপুরী যাব, মধু খাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদী সুর—তার একতালা

ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে বিষয় বিষে হলি রাজি।
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজি ॥
অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেক্‌বে যখন, শিখবে তখন, ক'র্ব্বে কালে পাপোষ বাজি ॥
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।

পড়ে চেয়ের কোটায়, মন টুটায় যে ভজে সে মত্ত গাঁজি (১)॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আসবে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজি॥ ৬৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে।
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে॥
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা।
তুমি ছিলে কোথা, এলে কোথা, যাবে কোথা কারে॥
সংসার কেবল কাচ কুহকে নাচায় নাচ॥
মায়াবিনী কোলে আছ প'ড়ে কারাগারে॥
অলঙ্কার দ্বেষ রাগ, অনুকূলে অনুরাগ।
দেহ রাজ্য দিলে ভাগ, বল কি বিচারে॥
যা ক'রেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা।
মণিদ্বীপে ভাব শিবা, সদা শিবাগারে॥
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম।
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে॥ ৬৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

তারা আর কি ক্ষতি হবে। হাদে গো জননী শিবে।
তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে॥
থাকে থাক যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কাজ কিরে আমার ভবে॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ, ভয় কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ী তুফানে ডরাবে॥
আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে॥

(১) বৃদ্ধ কালে ঈশ্বর ভজনা করিবে, অনেকের এই মত দেখা যায়। কিন্তু রামপ্রসাদ বলিতেছেন:—

"চেয়ের কোটায়" অর্থাৎ কৈশোর যৌবন প্রৌঢ় এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবনের চতুর্থ বা শেষ অংশে, "টুটায়—অভাবে প'ড়ে যে ভজনা করিতে চায় সে মত্ত গাঁজাখোর।

গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাব ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে ॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে, তুমি তো মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে ॥ ৬৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন জান নাকি ঘটবে লেঠা
যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ ক'রে পথে তোমার দিবে কাঁটা ॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে মনে মনে হওরে আঁটা ॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক ক'রবে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে দুয়ার রয়েছে নটা ॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, খিজি খিজি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা ॥
প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ি বুঝাইব সেটা ॥ ৬৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে।
ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটের ডুবায় পাছে।
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে শিব বাঁধা রাখিয়াছে ॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী ক'রেছে ॥ ৬৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মায়ের এমনি বিচার বটে।
যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে ॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।

কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে ॥
সওয়াল জবাব ক'রব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য, ঐক্য, বেদাগমে রটে ॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যাজি জাহ্নবীর তটে ॥ ৭০ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্তে রয়েছে তোমার পতিত তনয় ডুব্‌ল ভবে ॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো কিসে-পার-হব মা ভবে।
তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে, মা নইলে খালাস কর তবে ॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ, শুনিয়া না শুন, পিতৃ ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে স্মরণ নিবার কাজ কি তবে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা, তোর ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষ-ধাম, অন্নপূর্ণা নাম,
জগজ্জনে আর নাহি লবে ॥ ৭১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন তুমি দেখরে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে ॥
ভবে মত্ত হয়ে রে মন, ভাবলিনে ভবানী ভবে।
সদা ভাব সেই ভবানী পদ, যদি ভব পারে যাবে ॥ ৭২ ॥

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল পোস্ত।

জানিগো জানিগো তারা তোমার যেরূপ করুণা ॥
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা।
কেহ যায় মা পাল্‌কী চ'ড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ শালের দেয় দুশালা গায়ে, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥ ৭৩ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে ব'লবে, পাগল হ'লো॥
লোকে মন্দ বলে ব'ল্‌বে, তায় কিরে তোর ব'য়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল॥ ৭৪॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়খেমটা

কালীর নামে গণ্ডী (১) দিয়া আছি দাঁড়াইয়া।
শুনরে শমন তোরে কই, আমিতো আটাসে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে॥
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে, খাবে হুল্‌কো দিয়ে।
কটু ব'ল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদ সেন কয় শ্যামা গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব চক্ষে ধূলা দিয়ে॥ ৭৫॥

রাগিণী ইমন—তাল একতালা

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী, তদ্রূপসী বিগলিতকেশী॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসী (২) বরুণার (৩) মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসীধারা অসী॥
কাশী মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসীর উপরে সেই মহেশ মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভালত না বাসি।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছ আমার কালী নামের ফাঁসী॥ ৭৬॥

(১) গণ্ডী—মণ্ডল। সীমা ব্যঞ্জক গোলাকার রেখা।
(২) অসী—কাশীর দক্ষিণস্থ নদী বিশেষ।
(৩) বরুণা—কাশীর উত্তরস্থ নদী বিশেষ।
এই অসী ও বরুণার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বারাণসী বলে।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়ে ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাজের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাক ব'সে, ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আস্‌বে, ওজায়ে যাবে, ভাঁটিয়া যাবে ভাঁটার বেলা॥ ৭৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি॥
ষট্‌চক্রে চক্র করি, কবলে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দল-পতি, সহস্রদলে করে স্থিতি॥
নেঙটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল্‌ দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকের মারে নাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি॥ ৭৮॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা

জাল ফেলে জলে রয়েছে ব'সে।
তবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবন ময়।
ও সে যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জলে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে।
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন ক'রবে এসে॥ ৭৯॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
ঐযে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি।
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরি॥

কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে, পেতে, নিতে, খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি।
যশ অপযশ, সুরস কুরস, সকল রস তোমারি
ওগো রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেরি আঁখঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টিপোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥ ৮০॥

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা
আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়াহীন ভজনবিহীন দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি, আমি কি ওপদ পাব
(মা তারা)॥
সুপুত্র কুপুত্র যে হই, সে হই চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে এ কথা কাহারে কব॥
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া, নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী নামটী রেখেছেন ভব
(মা তারা)॥ ৮১॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা
সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে॥
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব, যাঁহার চরণে লোটায়ে।
প্রসাদ বলে, রণে চলে রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥ ৮২॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল-একতালা

যদি ডুব্‌ল না ডুবাও না, ওরে মন নেয়ে।
তুই হালি ছেড়ো না, ভরসা বাঁধ, পার্‌বি যেতে বেয়ে॥
মন চক্ষু দাঁড়ী, বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
জাল ফাঁদ পেতেছ শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে॥
মন! শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালীনামের যাওরে সারি গেয়ে॥ ৮৩॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা

গেল না গেল না দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী (১) হ'লো কাল॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তাহে দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুন জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃ-কুলে না করিলাম বাস,
পরে দুধের জ্বালা, শরীর হইল কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল॥ ৮৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে স'পে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজ-মহিষা।
তারা কতদিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসী॥
প্রসাদ বলে, কি ফল হবে, হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে, পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥ ৮৫॥

---

(১) মাসী—অবিদ্যা।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আমি নই পলাতক আসামী।
ওমা, কি ভয় আমায় দেখাও তুমি॥
বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা. কবচ রাখি সাল তামামি॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে, আসল কসে সারে জমি।
প্রসাদ বলে খাজনা বাকী, নাইকো রাখি কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু মাঝে, ডুবেও পদে হব হামি *॥ ৮৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল্ খেলায়ে গেলে॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে সঁপে দিলি।
গুরুদত্ত মহাসুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি কেবল মাত্রে কতকগুলো গালাগালি॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, করে দিলি মেজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালী॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান না কি হৃদে গেঁথে রেখেছি দক্ষিণা কালী॥ ৮৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব, ভাবিকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ, দ্বেষ লোভ ত্যজে, সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি॥
তারানাথ সারাৎসার, আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা নামের কাছ ক'রেছি॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি।
ধরে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা ক'রে ব'সে আছি॥ ৮৮॥

---

* হামি—দাবীদার।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এমনি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা॥
রামপ্রসাদের কাজ নয় মা, এঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন, অস্থির সে মন, দুজনেতে কর্ল্লে সারা॥ ৮৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত যা ক'রেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের * যত বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল ফলেছে॥
জমার কমি খরচ বেশী, তরবো কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
কেবল কালীনাম ভরসা আছে॥ ৯০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন, সুখে নাচ।
রঙ্গের বেলা রাংয়ে কড়ি, সোণার দরে তা কিনেছ॥
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক, মাটীর দরে তাই বেচেছ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছ।
যখন সে রূপে বিরূপ হইবে, সে রূপের কিরূপ ভেবেছ॥ ৯১॥

---

* রামপ্রসাদ সাকার উপাসক ছিলেন এবং পূর্ব্ব ও পরজন্ম মানিতেন। কিন্তু তাঁহারই পরবর্ত্তী অন্যান্য গান দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে তিনি পরজন্ম হইবে না জানিতে পারিয়াছিলেন।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

ভাল ব্যাপার মন ক'র্ত্তে এলে।
ভাসায়ে মানব-তরী কারণ জলে ॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভব-নদীর জলে।
ওরে, কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেহ কেহ বা হারালে মূলে ॥
ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ী ছয় দিকে টেনে, গুড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে, পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,
কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥ ৯২ ॥

প্রসাদী সুর—তাল আধ্বা

ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব।
ও তুই শকার বকার বল্‌তে পারিস্,
ব'ল্‌তে নারিস দুর্গা শিব ॥
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা।
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাবে ॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব।
ওরে চুরিদারি করিলে পরে,
উচিত মত সাজাই পাব ॥ ৯৩ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওরে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাদের মস্তকে রয় ॥
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়।
ওকে গরুড়বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥
প্রসাদ ভনে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা পেয়েছ, কি পুণ্য উদয় ॥ ৯৪ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা.

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামে গণ্ডী দিয়ে ॥
কালোপরে, কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে!
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ, কি করে তার মরণ ভয়ে ॥ ৯৫ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন গরীবের কি দোষ আছে ॥
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেম্নি নাচে ॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব ব'লেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র, সে সুতার কাটনা কেটেছে।
ওমা, মায়া সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥ ৯৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আর তোমায় না ডাকৃব কালী।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে, লেংটা হয়ে রণ করিলি ॥
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি, তাওতো দিয়ে হ'রে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি ॥
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি ॥ ৯৭ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে ॥
মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে।
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে যেম্নি দেখে তেম্নি করে ॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে করে তার ঠিক ঠিকানা।
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা, যদি অনুগ্রহ করে ॥ ৯৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

কেরে বামা কার কামিনী।
ব'সে কমলে ঐ একাকিনী॥
বামা হাস্‌চে বদনে, নয়ন কোণে, নির্গত হয় সৌদামিনী॥
এ জনমে এমন কন্তে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, ষোড়শ নবযৌবনী॥ ৯৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মরি গো এই মন দুঃখে।
ওমা মা বিনে দুঃখ ব'ল্‌ব কাকে।
একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি ব'ল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুখে,
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখলে যাকে পরম সুখে।
ওমা, আমি কত অপরাধী, লুন মেলে না আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা, মায়ের মত কাজ ক'রেছ, ঘোষিবে জগতের লোক॥১০০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥১০১॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ

বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল;
(গ্রহণে কালীর নাম)।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির ক'রে বল॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়।
কালী নামাগ্নি রসনায় জলে, সেই জল ঢল ঢল॥
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি।
শিব শিরে গঙ্গা বারি, প্রবাহ নির্ম্মল॥

আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু ;
গঙ্গা যমুনা ধারায় নিতান্ত এই ফল ॥
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী তটে, আপন নিকটে, দিও স্থল ॥ ১০২ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা

জননি ! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী ॥
তপন-তনয়-ভয়-চয় বারিণী ॥
প্রণব রূপিণী সারা কৃপানাথ দারা তারা
ভব পারাবার তরণী ॥
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্ম মূলা, হীন মূলা,
মূলাধার অমল-কমল বাসিনী ॥
আগম নিগমাতীতাখিল মাতাখিল পিতা,
পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী ।
হংস রূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী ॥
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী ।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল, কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার বিষফল জানি ॥ ১০৩ ॥

রাগিণী মূলতান—একতালা

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে ।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে ॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে ।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখ জালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে ॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, বরুণার শোভা,

হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত পুরী গমনে ॥ ১০৪ ॥

রাগিণী সিন্ধুকাফী—তাল একতালা

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে ॥
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে প'ড়ে মরে।
পরের জামিন হইল পরে, সে না দিলে আপন ভরে ॥
যখন দিনে নিরাই করে শিকারী সব রয় না ঘরে ॥
জাঠা বর্শা লয়ে ক'রে নাও না পেলে চলে তরে ॥
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥ ১০৫ ॥

রাগিণী মুলতানী ধানেশ্রী—তাল একতালা

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ ॥
কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথ চয়।
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই ॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই।
মা গো, আমি তোর পাকা ক্ষেতে দিয়েছিলাম মই ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী ॥ ১০৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা ॥
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী, নেচে উঠে ছটা বাদী ॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো, পুর হতে দূর ক'রে দি ॥

বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টারে যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি, পার হয়ে যাই ভব নদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা, তোমার সতিন্ সুতে, জোর ক'রে, কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে, ভরসা মনে, বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি এবারে ফাঁদে পা দি॥ ১০৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

পতিতপাবনী পরা পরামৃত ফলদায়িনী।
স্বদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া।
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তার কারিণী॥
কৃত পাপ হীন পুণ্য বিষয় ভজনা শূন্য।
তারারূপে তারয় মাং, নিখিল জননী।
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণী তব।
প্রসাদে প্রসন্না ভব, শিবের গৃহিণী॥ ১০৮॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা

অপর জন্মহরা জননী।
অপারে ভব-সংসারে এক তরণী॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব।
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া।
দীন দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥
আনন্দ কাননে ধাম, ধরেন তারিণী নাম।
যদি জপে দেহ অন্তে, শিব ব'লে মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন॥
নিজ গুণে তিনলোক, তারয় তারিণী॥১০৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

ডাকরে মন কালী ব'লে।

আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুল না মন সময় কালে॥

এসব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ।

ওরে ও পদ পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে॥

বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে।

ওরে পারবে না ছাড়াইয়ে যাইতে, কাল ফাঁসি লাগবে গলে

দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, কালের বসে কাজ হারালে॥

ওরে এখন যদি না ভজিলে, আম্‌সী খাবে আম ফুরালে॥ ১১০॥

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল একতালা

তোমার সাথী কেরে, ওমন।

তুমি কার আশায় বসেছ রে মন।

তন্তুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে।

যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে॥

প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চল রে।

নৈলে আঁধারের কুটিরের গোঁত, যোগে লেগেছে রে॥ ১১১

গীত—সমর বিষয়ক

কামিনী যামিনী বরণে রণে, এল কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি,
উল্লসিতা দানব নিধনে ॥
পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি ;
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কিরে ভয় ;
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥ ১১২ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

ও কেরে মন-মোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণি মরকত কান্তি ছটা।
একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য দলনা, ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী।
শশী খণ্ড শিরসী, মহেশ উরসী হরের রূপসী একাকিনী ॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে, বেসরে মণি।
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধা রস কুপ, বদনখানি।
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশ পাশ, কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা অসুর দরদা নিকটে প্রমদা প্রমাদ গণি।
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ীরে, ব্রহ্মময়ীরে, বল জননী ॥১১৩॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল ঠুংরি

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে, নব নীল জলধর কায় হায় হায়,
কেরে হর-হৃদি-হ্রদ পদ্মে দিগ্ বাসে ॥
কেরে, নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী,

হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় ক'রে, বাঁধি প্রেম ডোরে,
রাখি হৃদি-সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে।
কেরে নিন্দিত রাম কদলী তরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির ক্ষরে, যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষ বলে, ভুজঙ্গম দলে,
নাভি পদ্মমূলে, ত্রিবলির ছলে, দংশিল এসে।
কেরে উন্নত কুচ কলি, মুখ-শতদলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়,
যেন বিকশিত সিতাম্ভোজ বনরোহায় (১),
কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা,
যেন আসব আবেশ, শিশু সুধা ভাসে।
কেরে, কুন্তল জাল আবৃত মুখমণ্ডল,
লম্বিত চুম্বি ধরায়, তাহে ভুরুধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, শিতি মুহু দোলে, কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত তুন্ধবা তুন্ধবী, নাচিছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায় অমনি ;
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শব ছলে আশুতোষে ॥ ১১৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক

মা! কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ বিগলিত-কেশ,
বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে।
সদ্য হত-দিতি-তনয় মস্তক-হার লম্বিত সুজঘনে।
কত রাজিত কটীতটে নর কর নিকর, কুণপ শিশু শ্রবণে
অধর সুললিত, বিম্ব বিন্দিত, কুন্দ বিকশিত সুদর্শনে।
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাস সঘনে ॥

(১) বনরোহ—মৃণাল। বন—জল।

সজল জলধর, কান্তির সুন্দর, রুধির কিবা শোভে ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মন মানস নৃত্যতি রূপ কি ধরে নয়নে ॥ ১১৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক

এলো চিকুর নিকর, নর কর কটিতটে, হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী।
শব শিশু ইষু, শ্রুতি তলে শোভে, বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি।
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি ॥
সমস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা, সুরেশানুকূলা ষোড়শী
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবপ্রিয়া! ভবার্ণব ভয় বাসি।
জনুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা চরণে গয়া গঙ্গা কাশী ॥ ১১৬ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট

এলো চিকুর ভার, এবামা! মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপ গতি,
রতিপতি মতি মোহ পায়।
অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়,
এজন্মের মত বিদায়।
কাল বলে এত কাল, এড়ালেম যে জঞ্জাল,
সেই কালচরণে লুটায়।
টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিব পূজার এই ফল, অশিব ঘটায় ॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায় ॥
ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব, কার ভরসায় রব, হায়
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এ জন্ম-কর্ম্ম সায় ॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এশঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।

মরণে কি আছে ভয় জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয়, কয় দৈত্য রায়।
ওহে দৈত্য রায়, ভজ এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায় ॥ ১১৭ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট

নব নীল নীরদ তনু রুচি কে, ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ।
কোটীচন্দ্র ঝলমল, শ্রীমুখমণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ।
অবতংস সে শ্রবণে, কিশোরবিধি অরি* গলিত কুন্তল পাশ।
গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত, সতত জঘনে নিবাস।
বামার বাম করপর খড়্গ নরশির সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা ক'রেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষ চয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভাবে এ কথা অভাষ ॥ ১১৮ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল জেলদ তেতালা

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা, ভুবন মোহিতা,
একি অনুচিতা, কুলের কামিনী।
কুঞ্জরবর গতি আসবে আসবে আবেশ, ললিত বসনা গলিত কেশ,
সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে রে দনুজ দলনী।
কেরে নব নীল কমল কলিকা বলি, অঙ্গুলি দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ করত পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোহ করতহি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥
কেরে জঘন সুচারু, কদলী তরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে।
তদূর্দ্ধে কোটীবেড়া, নরকর ছড়া কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে ॥

* কিশোরবিধি অরি—কুনপ শিশু। অসুর

করতল স্থল, নিরমল অতিশয়, বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়।
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী।
কেরে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, করীকুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল উদনে রদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে দম্ফে কম্পে সঘনে ধরণী॥ ১১৯॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমা তেতালা

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি ঘেষে॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাজিছে, নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর রণে মগনা, হোয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে॥
ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধরবে বলিয়া, ঘন হাসে।
কাহার নারীরে, চিনিতে নারিরে,
মোহিত করেছে, ছিন্ন বেশে॥
কারে আর ভজরে, ওপদে মজরে,
রূপে আলো করিছে, দিগ দশে।
কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
প্রসাদ ভণেরে, চল কৈলাসে॥ ১২০॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমা তেতালা

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি, বিগলিত কেশ।
বসন বিহীনা করে সমরে॥
মদন মথন উরসী রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয় কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জন মনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে॥
শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন নগরে।
কলয়তি * প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপা লেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে॥ ১২১॥

---

* কলয়তি—বলিতেছি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমা তেতালা

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কাম রিপু্ মোহিনী ও কে বিরাজে বামা॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয় দল তনু শ্যামা॥
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী,
সমর নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা॥ ১২২॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমা তেতালা

ঢল ঢল জলদ বরণী এ কার রমণী রে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ॥
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল
সতত ঝলকে কিরণ॥
একি! তুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী!
সম্বরণ কর রণ॥
মগনা রণ মদে সচলা ধরা পদে,
চরণে অচল চালন;
ফণীরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে,
চিত্ত মে মত্ত বারণ।
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,
কদাচ না মানে বারণ॥ ১২৩॥

রাগিণী বিভাস—তাল ধিমা তেতালা

মরি! ও রমণী কি রণ করে!
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদ ভরে,
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে॥

আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে (১) পতঙ্গ (২) প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে।
নিরুপম রূপ ছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম কটা, (৩)
প্রবল দনুজ ঘটা, গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ-বধূ, (৪) যতনে যোগায় মধু, (৫)
দোলায় বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আশায় আশা ঘুচায়েছে, আশা বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে ॥ ১২৪ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল ধিমা তেতালা

অকলঙ্ক শশী-মুখী সুধাপানে সদা সুখী,
তনু (৬) তনু (৭) নিরখি, অতনু (৮) চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাবে ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ বামা রণে কে ॥
শিশু শশধর ধরা, সুহাস মধুর ধারা,
প্রাণ ধরা ভার, ধরা আলো ক'রেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝকে ॥
রমা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা, কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নথ তুলা দন্ত মূলা,
এল চুলা, গায়ে ধূলা, ভয় করে হে ॥

---

(১) পতঙ্গ—অগ্নি। (২) পতঙ্গ—ফড়িঙ।
(৩) কটা—কটাহ। ব্রহ্মাণ্ড।
(৪) বিবুধবধূ—দেবী। ডাকিনী যোগিনী। (৫) মধু—সুরা, মদিরা।
(৬) তনু—ক্ষীণ, কৃশ। (৭) তনু—দেহ, কায়া।
(৮) অতনু—তনু নাই যার। কাম, কন্দর্প।

কবি রাম প্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বলে হে॥
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে॥ ১২৫॥

রাগিণী বিভাস—তাল ধিমা তেতালা
শ্যামা বামা কে বিরাজে।
বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়া-গতা শবে॥
গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায় হাসে,
অতনু সতনু জনু (১) অনুভবে।
রবিসুতা (২) মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥
অরুণ শশাঙ্ক নিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে, অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে॥ ১২৬॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা
সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী।
শোভিত-শোণিত ধারা মেঘে সৌদামিনী।
একি দেখি অসম্ভব, আসন ক'রেছ শব,
মূর্ত্তিমতী-মনোভব, ভবভামিনী॥
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশী রাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস রজনী॥ ১২৭॥

খাম্বাজ—দাদরা
আ মরি কি লাজের কথা
মিন্সের উপর মাগী।
পদে পাড়য়ে ভোলা অদ্ভূত এক যোগী।

(১) জনু—জন্ম। (২) রবিসুতা—যমুনা।

এ কেমন নির্লজ্জ মেয়ে, পতির বুকে চরণ দিয়ে
রয়েছ উলঙ্গী হয়ে রণ অনুরাগী!
নয়নে দেখনা চেয়ে, শিব আছেন শব হয়ে,
এ কি সর্ব্বনাশী মেয়ে লজ্জা সরম ত্যাগী ॥ ১২৮ ॥

ভৈরবী—যৎ

নেংটা মেয়ের এত আদর জটে বেটাইত বাড়ালে।
নইলে কেন ডাকতে হবে দিবানিশি মা মা বলে ॥
শ্রীরাম জগতের গুরু জটে বেটা তার গুরু।
আপনি বেটা বুঝলে না কে রইলো শ্যামার চরণতলে ॥ ১২৯ ॥

ভৈরবী—একতালা

কালী নামের গণ্ডি দিয়ে আমি আছিরে দাঁড়ায়ে
কটু বল্‌বি সাজা পাবি শমন, মাকে দিব কয়ে ॥
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা বড় ক্ষ্যাপা মেয়ে
শোন্‌রে শমন তোরে কই আমিত আটাশে নই।
এ যে ছেলের হাতের মোয়া নয় খাবি ভেল্‌কি দিয়ে ॥ ১৩০ ॥

বেহাগ

জাল ফেলে জেলে র'য়েছে বসে।
আমার কি হবে মা তারা শেষে।
অগাধ সলিলে মীনের আশ্রয়
জাল ফেলেছে ভুবন ময়
যখন যারে মনে করে
তখনই তারে ধরে এসে ॥
পালাবার পথ নাইকো জালে
পালাবি কি মন ঘিরিছে যে·কালে
প্রসাদ বলে ডাক মাকে
শমন দমন করবে এসে ॥ ১৩১ ॥

ভৈরবী

ন্যাংটা মেয়ে কালী।
দোষ করিলে রোষ করে না তারেই ত মা বলি।
আপন মায়ে যেমন করে যতন জানত সকলি॥
পাগলের মন যখন যেমন তখনই যায় ভুলি।
ডাকিনী যোগিনী, কত ভূতের হুলাহুলি।
যত দেবের প্রধান বিষ্ণু ঈশান তাঁরাও কৃতাঞ্জলি॥
প্রসাদ বলে নির্জ্জলে যদি যাবি চলি।
সকল ছেড়ে হৃদ্ মাঝারে ভাবরে মুণ্ডমালী॥ ১৩২॥

খাম্বাজ—মিশ্র

বাজ্‌বে গো মহেশের বুকে, নেমে দাঁড়া ক্ষ্যাপা মাগী।
মরেন নাই শিব আছেন বেঁচে যোগে আছেন মহাযোগী।
বিষে অঙ্গ জর জর সহে না মা পদ ভর,
নাব, নইলে ভাঙ্গবে পাঁজর, কি কঠিন গো শিব-সোহাগী।
বিষপানে যার হয়নি মরণ সে মরবে আজ কিসের কারণ
প্রসাদ বলে কপট মরণ ঐ মরণ পাবার লাগি॥ ১৩৩॥

ভৈরবী

মা তোদের এ ক্ষেপার হাট বাজার।
গুণের কথা কব কার,
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে, কেউ মাথায় চড়িস তার।
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষ্যাপার মূলাধার।
আবার চাক্‌লা ছোঁড়া চ্যালা দুটো সঙ্গে অনিবার,
ওমা পদ বিনে গো আরোহণে ফিরিল কদাচার,
আবার মণি মুক্তা ফেলে দিয়ে পরিল নরশিরহার,
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার বা ধারিস্ ধার,
এবার রামপ্রসাদকে ভবনদী ক'র্ত্তে হবে পার॥ ১৩৪॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

সাধে কি করুণাময়ী করি মা তোর উপাসনা।
কাল ভয় না থাকিলে, কেউ তোমারে সাধিত না॥

কোথা গো মা আদ্যাশক্তি, তব নামে জীব-মুক্তি।
কার হেন আছে শক্তি বিনা তুমি ত্রিনয়না ॥ ১৩৫ ॥

ভৈরবী—যৎ

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়া-হীনা না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে ॥
দয়াময়ী নাম জগতে,
দয়ার লেশ মা নাই তোমাতে,
গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি,
প্রসাদ এম্নি লাথি খেগো তবু দুর্গা বলে ডাকে ॥ ১৩৬ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

মাগো আমার এই ভাবনা।
(আমি) কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম,
কোথায় যাব নাইকো জানা।
দেহের মধ্যে ছ'জন রিপু, তারা দেয় মা কুমন্ত্রণা,
আমার মনকে বলি ভজ কালী, তারা কেউ কথা শুনে না ॥ ১৩৭ ॥

গীত

হৃদি শ্মশান মন্দিরে কে গো বামা এলোকেশী।
অষ্ট শত মুণ্ড গলে, বাম করে ধরা অসি ॥
কেন দেখি এমন ধারা, লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা।
সর্ব্বাঙ্গে রুধিরে ঘেরা মুখে অট্ট অট্ট হাসি ॥১৩৮॥

গীত

কত রঙ্গ জান রণে শ্যামা।
(পাগলা মায়ী কেরে আমার কালী মায়ী কে)
এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
উন্মাদিনী, এলোকেশী মা অসি ধরেছে ॥

পরের ছেলের মুণ্ড কেটে, পরেছ মা গলায় গেঁথে,
পদতলে স্থাংটা জটে পড়ে রয়েছে ॥ ১৩৯ ॥

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা (মা)।
সুধাপানে ঢল ঢল তবু ঢ'লে পড়ো না।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা।
উভয়ে পাগল পরা, (দেখে) লজ্জা ভয় আর থাকে না ॥ ১৪০ ॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা

এলোকেশে, কে শবে, এলোরে বামা ॥
নখর নিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তনু, মুখ হিমধামা।
নব নব সঙ্গিনী, নব-রস রঙ্গিণী, হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হতরিপু সমা ॥
ভৈরব ভূত, প্রমথগণ (১) ঘন রবে, রণ জয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, ববম্ বম্ বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা।
ভব-ভয়-ভঞ্জন হেতু কবিরঞ্জন, মুঞ্চতি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা ॥১৪১ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া

শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে ?
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে ॥
বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথরথী গজ-বাজী বয়ানে পুরে।
নিজ দল প্রবল, সকল হতবল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥

(১) প্রমথ—শিবের পারিষদ।

প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃত্যু-রূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে, এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর,
ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে।
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু,
ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছে সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপা লেশ, জননী কালিকে ॥ ১৪২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট

চিকণ কাল রূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ (১) কমল দল, বিমল চরণ তল,
হিমকর নিকর রাজিত নখরে।
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে;
ভালে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল;
লঘু-গতি পতিত যুবতী অধরে ॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসন-হীনা
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত শর খর,
কত কত শত শত রে ॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে।
ওপদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু, মামক (২) মানস আশ ধরে ॥ ১৪৩ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া

সমর করে ওকে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী ॥

---

(১) অরুণ—ঈষদ্রক্তবর্ণ, লাল।
(২) মামক—মদীয়। আমার।

ললাট-নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু, বামেতর তরণি (১)।
মরকত মুকুর (২) বিমল মুখমণ্ডল, নূতন জলধর বরণী।
শব শিব শিরে মন্দাকিনী রাজত, ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী।
উরূপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ, সুচারু নখর নিকর
সুধা ধামিনী।
কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ী করুণাং কুরু হর-মোহিনী।
গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে, মম জীবনধন, জননী॥ ১৪৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট
কে হর হৃদি বিহরে।
তনু রুচির, জলদ ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীল কমল দল, শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রমজল, (৩) শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু (৪) মুকুতাফল
রচিত কিবা শোভা, মরি মরি রে॥
গলিত চিকুর ঘটা, নবজলধর ছটা,
ঝাঁপল (৫) দশ দিশি তিমেরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজঙ্গবর কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি,
সুধা ত্যজিয়া বিষ পান করিরে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানবদেহ ধরি রে॥ ১৪৫॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট
শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখসুন্দর, তনুরুচি বিজিত, তরুণ তমাল॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে, করে করে ধরে তাল।

(১) তরণি—সূর্য্য। সমর বিষয়ক সঙ্গীতে কালীর ত্রিনয়ন সঙ্গে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির উপমা পুনঃপুনঃ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে কোন চক্ষুকে কার সঙ্গে তুলনা করিতেছেন—তাহা স্পষ্ট আছে। ললাটনয়ন—অগ্নি। বাম নয়ন—চন্দ্র। দক্ষিণ নয়ন—সূর্য্য।

(২) মরকত—হরিদ্বর্ণ মণি বিশেষ। মুকুর—দর্পণ।

(৩) শ্রমজল—ঘর্ম্ম। (৪) মঞ্জু—মনোহর।

(৫) ঝাঁপল—ঢাকিল।

ক্রুদ্ধ মানস, উর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল ॥
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ, মবরব যন্ত্র মণ্ডন ভাল।
তা তা থেই থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি, ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল ॥
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি! রক্ষ মম পরকাল।
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ, বারয় * কাল করাল ॥ ১৪৬ ॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥
তনু নব ধারা-ধর, রুধির-ধারা নিকর।
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে।
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তম রাশি রাশি নাচিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা কমল পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী-হৃদে ভাবিছে ॥ ১৪৭ ॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুন বয়েস।
দনুজ দলনা, ললনা সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রথম সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচতে রঙ্গে,
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিণী, নগনা সমান বেশ ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয়ে ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটীদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবন পালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব পারাবার ভরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥ ১৪৮ ॥

* বারয়—নিবারণ কর।

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসী।

বিহরে বামা স্মর হরে।

সুরী কি অসুরী, কি নাগী (১) কি পন্নগী, (২) কি মানুষী

নাসে মুকুতা ফল বিলোর (৩) পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,

সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।

একি করে! করে করী ধরে রণে পশি,

তনুক্ষীণা সুনবীনা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী॥

নীল কমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,

লজ্জিতাকুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।

কত ছলা কত কলা, (৪) এ প্রবলা চিত্তবাসী,

রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহত গামিনী রূপসী॥

* * * দিতী সুতচয়, সমর প্রচণ্ড, সঙ্গিলে প্রবেশি;

এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি,

মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে, একি সর্ব্বনাশী।

কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ,

হৃদয় কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।

ইহকালে পরকালে, জরী কালে, তুচ্ছবাসী,

কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি॥ ১৪৯॥

রাগিণী ছায়ানাট—তাল খয়রা

সমরে কেরে কাল কামিনী?

কাদম্বিনী, বিড়ম্বিনী অপরা কুসুমাপরাজিতা বরণী,

কে রণে রমণী।

সুধাংশু-সুধা কি শ্রমজ বিন্দু শ্রীমুখ না একি শরদ ইন্দু,

কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধু-তনয়, এ তিন নয়নী॥

আমরি আমরি মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী।

(১) নাগী—হস্তিনী। (২) পন্নগী—সর্পী।

(৩) বিলোর—লম্বিত। (৪) ছলা কলা—ছলনা, কপটতা।

ফণী ফাণাভরণ (১) জিনি, গণি দন্ত কুন্দ শ্রেণী ॥
কেশাগ্র ধরণী পরে বিরাজ, অপরূপ শব শ্রবণে সাজ।
না করে লাজ, কেমন কাজ, মম সমাজে তরণী ॥
আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল
একি বিশাল ভাল ভাল কাল-দণ্ড ধারিণী।
ক্ষীণ কটীপর, নৃকর নিকর আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত বৃন্তে, (২) কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে।
চরণোপান্তে, মনত্বরন্তে, রাখ কৃতান্ত দলনী ॥
আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল,
হাসে খল খল টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি ॥
প্রলয়-কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূত বৃথা বিবাদ।
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদ নাশিনী ॥ ১৫০ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা

কে মোহিনী ভালে ভাল-শশী,
পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালাকৃশা,
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি ॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি ॥

---

(১) ফাণাভরণ—ফণী।
(২) বৃন্ত—চিহ্ন।

ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার,
চৈতন্ত রূপিণী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী॥ ১৫১॥

রাগিণী ললিত—তাল রূপক

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা (১)
বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা, সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতি তলে ব্রহ্মা বিধু,
মঞ্জুভা মধুর মুখী, মধুর লালসা॥
সোম মৌলী (২) প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম্ম নাশা॥
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরি হর ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা॥ ১৫২॥

(১) বরটা—রাজহংসী।
(২) সোম-মৌলী—চন্দ্রশেখর। শিব।

আগমনী-সঙ্গীত

রাগিণী—মালশ্রী

আজি শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে।   গদ গদ ভাব ভরে,
ঝর ঝর আঁখি ঝরে, পাছে করি গিরিবরে,
অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে, জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে, হেসে, এসে, এসে ধরে করে।
কহে, বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা খুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পারবে॥ ১৫৩॥

রাগিণী—মালশ্রী

ওগো রাণী! নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসো না সঙ্গে আমার গো॥

জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো।
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তল ভার। নিকটে দেখে যারে,
সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার। বলে মা এলে, মা এলে,
মা কি মা ভুলে ছিলে, মা ব'লে একি কথা মার গো।
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার। দাস কবিরঞ্জনে,
সকরুণে ভণে, এমন শুভ দিন আর কার গো॥ ১৫৪॥

রাগিণী—ললিত

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এদেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদায়॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার॥
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধারস॥ ১৫৫॥

গৌরচন্দ্রী

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥

অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলী,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে। * * *॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়,
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥ ১৫৬॥

গীত—শব সাধনা

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায়
বেরুলো জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বম্ বম্ বাজাইয়া গাল॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল॥
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ-লম্বিত জটা জাল॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে জলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,

সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল।
যেজন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল ॥
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মনে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ ক'রে ঢাল ॥ ১৫৭ ॥

শিব সঙ্গীত

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া ॥
সিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া ॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দুলিছে হাড়ের মালা,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া ॥
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতি ভূষণ মোহণ বেশ,
তরুণ অরুণ অধর দেশ, শব আভরণ গলায় শেষ (১)
দেবের দেব যোগিয়া।

---

(১) শেষ—অনন্ত। বাসুকী।

বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি, ধর ত তাল দ্রিম্‌কি
দ্রিম্‌কি, হরিগুণে হর নাচিয়া ॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহর উঠিছে কল কল কল, জটা-জুট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া ॥ ১৫৮ ॥

অন্য বিষয়ক—সঙ্গীত

ওহে নূতন নেয়ে।
ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥
দুকূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করেছে দেয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী
মিছা তবে হইবে হে বেদ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা, উচিত কি হয়॥ ১৫৯॥

ও নৌকা বাওহে ত্বরা করি, নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজ বধূর সঙ্গে॥
আতব লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী,
চালনা কর মনের রঙ্গে।
আপন করহে পণ, চাওহে যৌবন ধন,
হাস-ভাব প্রেম তরঙ্গে॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে।
এখন হয়েছে নেয়ে, কোন্‌ বা বিষয় পেয়ে
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে॥

ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে।
সময় উচিত কও, কোন রূপে পার হও,
দোষ হলে পাছে মন ভাঙ্গে ॥ ১৬০ ॥

রাগিণী মূলতানী—একতালা

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এতনু তরণী
ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল,
কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞা কর যমকে বাঁধি
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে ॥ ১৬১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে,
হাট ক'রে ব'সেছি ঘাটে ;
ওমা শ্রীসূর্য্য বসেছে পাটে, নায়ে লবে গো ॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জেনে ফেলে যায় ;
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো ॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,
আসন দে মা ফিরে চেয়ে ;
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥ ১৬২ ॥

সম্পূর্ণ।